যাচাই

আশাপূর্ণা দেবী

মমতা প্রকাশনী
১১, পারমার রোড
ডাকঘর : ভদ্রকালী
জেলা : হুগলী

প্রকাশিকা ঃ
শ্রীমতী মমতা দাঁ
মমতা প্রকাশনী
৯৯, পারমার রোড
ডাকঘর ঃ ভদ্রকালী
জেলা ঃ হুগলী

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন, ১৩৬৪

প্রচ্ছদ চিত্রণ ঃ শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রক ঃ
শ্রী সুরেন্দ্রনাথ দাস
বাণীরূপা প্রেস
৯ এ, মানামোহন বসু স্ট্রীট
কলিকাতা—৬

ডাঃ সুব্রত সেন

স্নেহভাজনেষু

এই লেখিকার অন্যান্য বই

কখনও কাছে, কখনও দূরে

নিমিত্তমাত্র

মজারু মামা

ষড়যন্ত্রের নায়ক

নষ্টকোষ্ঠী

মনের মুখ

মধ্যে সমুদ্র

যাচাই

'ট্যাক্সি !'

'ট্যাক্সি !'

একই সঙ্গে দুটি স্বর ধ্বনিত হলো।

একটি ভরাট পুরুষ গলা, আর একটি সুরেলা অথচ তীক্ষ্ন মেয়েলি গলা।

একই সঙ্গে দুখানা হাতও উঠলো।

একটি সুটেড-বুটেড ভদ্রলোকের গরমকোট পরিহিত, অপরটি 'টেপ' সেমিজের ছাঁটের ব্লাউজের হাতা থেকে বেরিয়ে আসা নগ্ন নিরাভরণ মাজা মাজা গঠন আর মাখন রঙা

যদিও মাসটা ডিসেম্বর, এবং তারিখটা প্রায় শেষাশেষি। কিন্তু সেটা কিছু নয়। মেয়েদের তো শীত করে না, এবং ঠাণ্ডাও লাগে না। এটা তাদের প্রতি ঈশ্বরের বর। এদেশ-ওদেশ-বিদেশ সর্বত্র দেখুন গে। পুরুষরা আপাদমস্তক আচ্ছাদিত আর মেয়েরা? যেটুকু আবৃত না করলে নয় সেইটুকুই। এটাকে ফ্যাশন বলে নিন্দে করা যায় না। নেহাত গ্রামগঞ্জের দীনদরিদ্র চাষীবাসী ঘরেও তো দেখা যায় মেয়েদের শীত করে না, ঠাণ্ডা লাগে না। ওদেরও পুরুষরা তবু যেমন-তেমন একটা সুতি চাদরও গায়ে জড়িয়েছে, কিন্তু মেয়েদের অঙ্গে সেই আদি ও অকৃত্রিম শাড়ির আঁচল হতে পারে, সেও শতছিন্ন।

ওদের অভাব।

কিন্তু এনাদের?…স্বভাব। বস্তা বস্তা শীতবস্ত্র পোকায় কাটছে। সে যাক।

মেয়েদের সঙ্গে বিধাতাপুরুষের কী গভীর গোপন সম্পর্ক আছে এবং আলাদা করে তাদের কী 'শক্তি' জোগান দিয়ে রেখেছেন, তা দেবতাদেরও অজানা।

আপাতত এই ট্যাক্সি ডাকনেওয়ালা দুটি নারী-পুরুষের কথাবার্তার মধ্যে সেটা ধরা পড়ে কিনা সন্দেহ।

দুটো ডাক একই সঙ্গে ধ্বনিত হল।

দুটো হাত একই সঙ্গে উঠল। কী ভাগ্যিস ট্যাক্সি ড্রাইভার উভয়কেই উপেক্ষা করে সাঁ করে বেরিয়ে গেল না। খ্যাচ করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কপালক্রমে ওই সুটেড-বুটেডের সামনেই দাঁড়াল। তিনিও সুযোগের অপব্যবহার করলেন না, চটপট উঠে পড়লেন। কারণ মহিলাটি তখন বেশ কয়েক গজ দূরে।

তবে দূরত্ব বেশিক্ষণ রইল না। তিনি কাঁধের ব্যাগটি কাঁধের উপর টাইট করে নিয়ে হাওয়ায় ভাসা শুকনো পাতার মতো প্রায় উড়েই চলে এলেন।

এবং তীক্ষ্ন কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'এটা কী হলো? ডাকলাম আমি, আর আপনি উঠে বসলেন!'

ভদ্রলোক একবার অভিযোগকারিণীর দিকে তাকিয়ে দেখে শান্ত মার্জিত গলায় বললেন, 'তাই বুঝি? স্যরি। আচ্ছা আমি নেমে যাচ্ছি!' সঙ্গে সঙ্গে নেমেও পড়তে উদ্যত হন।

কিন্তু মহিলা এই 'স্যরি'-তে ভিজলেন না। বেশ চড়া গলায় বললেন, দাক্ষিণ্য দেখানোর দরকার নেই। কে আগে ডেকেছে সেটা ঠিক করা হোক। যা কিছু করা হবে লিগালি করারই পক্ষপাতী আমি।'

ভদ্রলোকের গাম্ভীর্যের আবরণে ঢাকা মুখে আর চোখের কোণে যেন একটু সকৌতুক হাসি ফুটে উঠল। তবে নেমেই পড়লেন। তবে নেমেই পড়লেন এবং বললেন, 'মনে হচ্ছে বোধহয় আপনিই আগে!' বলেই সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে খামচা টাকাপত্তর বার করে দু'পা এগিয়ে এসে ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে বলেন, ও মশাই! কত দিতে হবে বলুন?'

মশাইটি ঘাড়টা ঘুরিয়ে বলে, যা রেট তাই দেবেন।'

হ্যাঁ, রেট একটা আছে বৈকি। গাড়ির গদিটা পর্যন্ত না ছুঁয়েও শুধু একবার থামালেই তার জন্য খেসারত দেবার একটা আইন আছে তো।

ড্রাইভার মহিলার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে বলল, 'তাহলে আপনিই উঠে আসুন। চটপট।

ইতিমধ্যে মিটার ডাউন করার বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা হয়ে যায়।

কিন্তু মহিলা উঠলেন না, নাছোড়বান্দা সুরে বললেন, 'তাহলে উঠে আসুন মানে? এ কী দয়া-দাক্ষিণ্যের ব্যাপার? আগে কে ডেকেছে? সেটা সঠিক বলুন।'

ড্রাইভারের মুখে কী একটু ব্যঙ্গ হাসির আভাস ফুটে উঠল? 'তবে সেটা প্রকাশ না করে অবহেলায় বলল, 'খেয়াল নেই!'

'খেয়াল নেই ! এটা খেয়াল রাখা আপনার ডিউটি না ? যে আগে ডাকবে তারই অগ্রাধিকার মানেন তো ?'

'কী মুশকিল উনি তো নেমেই পড়েছেন। উঠুন না আপনি'

মহিলার তথাপি রণং দেহি ভাব। বলে ওঠেন, 'নেমেই পড়েছেন, যেন দয়া দাক্ষিণ্য দেখাতে। আপনি কেন বলতে পারছেন না, কে আগে ডেকেছে !'

ড্রাইভারের কণ্ঠস্বর এবার রুক্ষ, 'দেখুন বেশি কথায় দরকার কী ? উঠবেন তো উঠুন নয়তো—আমায় ছেড়ে দিন। আকাশের অবস্থা দেখেছেন ?'…

সত্যিই বটে, আকাশের অবস্থা বেশ ভয়াবহ। একেই তো শীতের বিকেলের অকাল সন্ধ্যা, তার ওপর আকাশটা যেন একখানা ভারি শ্লেট পাথরের স্ল্যাবের মতো মাথার ওপর নেমে আসছে।…

তথাপি মহিলা উঠে পড়লেন না। দরজা খোলার ভঙ্গি করে ধরে থেকেই অপ্রসন্নভাবে বলেন, 'আমি কোন অন্যায্য সুযোগ গ্রহণের পক্ষপাতী নই ইনিই যদি আগে ডেকে থাকেন—'

ইনি কিন্তু সে বিষয়ে কোন কথা না বলে মানে সৌজন্য করেও তো 'না না সে কিছু না' গোছের কিছু বলা উচিত ছিল না কী ?…সে দিক দিয়ে না গিয়ে ইত্যবসরে ড্রাইভারের কোলের ওপর একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট ফেলে দিয়েছেন।

'এই তো মুশকিলে ফেললেন ! ভাঙানি নেই ?'

কই দেখছিনা তো !'

মহিলা এখনো ন যযৌ ন তস্থৌ।

ড্রাইভারটি একটি স্মার্ট তরুণ খুব সম্ভব গ্র্যাজুয়েটই।‥ মনে মনে ভাবে, মাথার গণ্ডগোল আছে ? না কী তাড়না ? কী ভেবে বলে উঠল, বৃষ্টি নামল বলে। অসুবিধায় পড়ে যাবেন। কে কোন দিকে যাবেন ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'লেক মার্কেট।'

মহিলাটিও সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেললেন, 'ভবানিপুর।'

'তাই ? তাহলে তো কোন প্রবলেম নেই। শেয়ারে চলে যান না। উঠে পড়ুন। সুবিধেই হলো।'

এক বগ্গা মহিলাটি তীক্ষ্ম কণ্ঠে বলেন, 'কার হলো ?'

'ধরুন আপনাদেরই।'

আমি যদি মনে করি এটা আমার পক্ষে অসুবিধে !'

'মাপ করবেন। আপনার মতো প্যাসেঞ্জার আমি জম্মে দেখিনি—অ্যাই যাঃ, হলো তো ? বৃষ্টিটা নামল। আমি গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছি।'

হু হু করে একটা হিমেল হাওয়া বইল। বেশ কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল। গর্জে উঠল গাড়িটা।

আর প্রায় যন্ত্রযানটির মতো দু'জন একই সঙ্গে গাড়ির মধ্যে উঠে বসল।

এখন আর কারো মুখে কোন কথা নেই। যে যার হাতের জিনিস পাশে নামিয়ে বসল।…একজনের হচ্ছে ভ্যানিটি ব্যাগ, অপরজনের হচ্ছে একখানা বাণিজ্যিক সংস্থার ইংরেজি ম্যাগাজিন।…

পেছনের সিটে মহিলা। চালকের পাশে ভদ্রলোক।

ঘটনাটি ঘটেছিল যাদবপুরের মোড়ের কাছ থেকে। মনে হচ্ছিল কোনো একটি গন্তব্যস্থলে যেতে যেতেই জোর বৃষ্টি এসে যাবে।

এল না।

শুধু হিমেল হাওয়ায় যেন ইলশেগুঁড়ির মতো ঝুরো বৃষ্টি উড়তে থাকল।

গাড়ির চালক পুরুষ। স্বভাবতই স্বজাতির প্রতি সহানুভূতিশীল। মহিলাটির অন্যায় গোঁয়াতুঁমির ব্যাপারে ভদ্রলোকের নীরব থাকাটা বেশ সম্ভ্রম উদ্রেককারী। অতএব অকারণেই খুব সৌজন্যের গলায় বলে, কোথায় থামতে হবে বলে দেবেন স্যার।'

একটুক্ষণ যেতেই বলে দিলেন তিনি।

লেক মার্কেটের রাস্তার ধারের সারি সারি কিছু নিচু নিচু দোকানের মাঝখান দিয়ে ঢুকে যাওয়া একটা গলিপথের সামনে চলে আসে ট্যাক্সি।

চালকেব হাতে সেই পঞ্চাশ টাকার নোটটি। মিটারে কত উঠেছে দেখে নিয়ে ওই পঞ্চাশ টাকা থেকে বাদ দিয়ে বাকিটা ভদ্রলোককে দিয়ে দেয়।… আবার মিটারের কারুকার্য করে নিয়ে মহিলাটির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলতে যায়,

'এবার আপনি বলে দেবেন—'

কিন্তু মহিলা ইতিমধ্যে কাঁধের ঝোলা সামলে নেমে পড়তে পড়তে বলেন, 'আমি এখানেই নামব'।

'সেকি! বললেন না ভবানিপুর?'

'তখন বলেছিলাম, এখন বলছি না, বলুন কত দিতে হবে?'

'শেয়ারটা আপনারাই ঠিক করে নিন। আমার আর সময় নেই।' গাড়িতে স্টার্ট দেয় ড্রাইভারটি। আর কি দুর্মতি, বলে ওঠে কিনা, 'একা যেতে সাহস হল না বুঝি?'

অনেকক্ষণ থেকে পোষা বিরক্তি এইভাবে প্রকাশ করে বসল বোধহয়।

ব্যস, সাপের ল্যাজে পা। ছুরির মতো ধারালো স্বরটা ঠিকরে উঠল, 'সাহস মানে?'

'মানে হচ্ছে আপনারা অনেক সময়ই ট্যাক্সি ড্রাইভারদের গুন্ডাভাবেন কিনা। রাতের অন্ধকারে একা যেতে—'

'কী? কী বললেন? আমি যার সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠেছি—তিনি কি আমার গার্জেন হয়ে এসেছিলেন? আমি একাই ট্যাক্সি থামাইনি? অ্যাঁ'

কিন্তু একথার উত্তর আর শোনা হলো না। ততক্ষণে হাওয়া গাড়ি হাওয়া।

মহিলা ক্রুদ্ধ গর্জনে বলেন, 'এইসব লোকেরা আজকাল এত অসভ্য হয়েছে '

'কী আশ্চর্য'। অযথা মাথা গরম করে লাভ কী ?···এখন কোন দিকে যাবেন ? আর গাড়ি পাবেন ?' বলেই নিজে সেই দুটো দোকানের মাঝখানে ফালি জায়গাটুকু দিয়ে ঢুকতে থাকেন ভদ্রলোক।

মহিলাটি অবলীলায় তাঁর পেছন পেছন হাঁটতে থাকেন।··· এবং বাঁক নিয়ে আরও একটা সংকীর্ণ পথে ঢুকতে দেখেই তীব্রস্বরে বলে উঠলেন, 'এর থেকে উত্তম জায়গা বুঝি আর জুটল না ?'

'জুটল আর কই ?'

'সাধে বলি অপদার্থ'। এখানে কোনো ভদ্রলোকে বাস করতে পারে ? এমন অপূর্ব জায়গার সন্ধান পেলে কোথায় ?'

'সে খবর জেনে আপনার লাভ ম্যাডাম ?'

'থামো ! ন্যাকামি করতে হবে না। দেখি এই আঁস্তাকুড়ের কোনখানে—'

···এগোতে থাকেন ভদ্রলোকের পিছু পিছু।

আঁস্তাকুড় বললে খুব ভুল হয় না।

এটা দোকান পশারের পেছন দিকে এক টুকরো পরিত্যক্ত জায়গা। রাজ্যের ভাঙা প্যাকিং বাক্সের টুকরো কাঠ-পেরেক উঁচিয়ে পড়ে আছে। তার সঙ্গে কিছু দড়ি, কিছু পলিথিন শিট-এর টুকরো ইত্যাদি।

'হঠাৎ কী খেয়ালে এখানে নামা হলো ?'

'বললাম তো তোমার অপদার্থতার সীমাটা দেখতে।'

'তাতে লাভই বা কী, লোকসানই বা কী ?'

'সে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নই।'

বাধ্য ! ওরে বাবা। বাধ্য শব্দটা ওঠে না কী ?' ওই কাদা জমা জায়গাটা পার হতে হতে মহিলাটি তিক্ত ব্যঙ্গে নাক-মুখ কুঁচকে বললেন, 'এই ইঁদুরের গর্তটি আবিষ্কার হলো কী করে ?'

'ভাগ্যক্রমে !'

'ভাগ্যক্রমে !'

নাকটা আরো কুঁচকে গেল। চাঁচাছোলা টিকলো নাকটির কোঁচকানোর ভঙ্গিটি যেন সহজাত।

ভদ্রলোকের মুখভঙ্গিতে তেমন ভাব ফোটাফুটি নেই। নির্লিপ্ত স্বরে বলেন, 'তা নয় ? তবুও কম কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে ? চাহিদার মধ্যে শুধু নিজস্ব একটি বাথরুম। সেইটুকুর জন্যেই হাড়ে হলুদ।···এই যে এখানে একটু আরোহণ পর্ব আছে।'

দেখা গেল, এখন একটি ইট বাঁধানো প্যাসেজ মতো, সেখানে গোটাকতক ধাপ সমেত একটি লোহার মই। খুব খারাপ নয়, একটু রং করাও।

'রোজ সর্বদা এই পর্বতারোহণ ?'

'মন্দ কী ?'

তা আরোহণের পর দেখা গেল আস্তানাটি খুব মন্দ নয়।

একটি মেজেনাইন ফ্লোরের ঘর।

মাপে বেশ বড়সড়ই। বোধহয় ডবল গ্যারেজের মাথায়।·· তা খোলামেলাও। এখানের প্রবেশ পথটি দেখলে অনুমান করা শক্ত জানলা খুললে এসব থেকে বড় রাস্তা দেখা যায়।

ঘরটা শুধু খোলামেলাই নয়, মোজাইক, টালি বসানোও। তবে এখন তো হু হু করা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। রাস্তায় লাইট আছে বটে, কিন্তু কুয়াশায় আচ্ছন্ন বলে তেমন জোরালো আলো দেখা যাবে না। তবু জানালার একপাটি খুলে দিলেন ভদ্রলোক, কারণ ঘরটা সারাদিন বন্ধ পড়ে আছে।

মহিলা সন্ধানীদৃষ্টিতে চারিদিক অবলোকন করতে করতে বলে ওঠেন. 'এমনি তো অচল নয়। তবে এনট্রেন্সটা অমন হতচ্ছাড়া কেন ?···ভাবছিলাম বোধহয় শেষ অবধি একটা অ্যাসবেস্টস বা করোগেটেড শেড-এর কাঁচাঘর দেখা যাবে। তো ঘর গেরস্থালী তো বেশ সাজানো-গোছানোই হযে গেছে।···একই আধারে 'শয়ন ভোজন রন্ধন, পঠন পাঠন' সবই।'

হ্যাঁ, ঘরের মধ্যেই একটা কেঠো টেবলের ওপর একটা জনতা স্টোভ বসানো রয়েছে। তার কাছাকাছি কিছু বাসনপত্র। তারই কাছাকাছি দেয়াল ঘেঁসে একটা বুক র‍্যাক। তাতে বেশ কিছু বই সাজানো রয়েছে। আর একধারে দেওয়াল ঘেঁষে একটা সরু চৌকির ওপর একটি পুরুষের একক শয্যা। পুরুষের সেটা বোঝা যাচ্ছে বিছানার ধারে একটা ছোট টুলের ওপর সিগারেট কেস, অ্যাশট্রে, এবং অ্যাশট্রের মধ্যে অর্ধদগ্ধ বেশ কতকগুলো সিগারেটের অবশিষ্টাংশ।

অন্যদিকে দেওয়ালে একটা সাবেকি স্ট্যান্ড, আলনা। তার ওপর ডাই করা প্যান্ট, শার্ট, গেঞ্জি. পায়জামা তোয়ালে অবিন্যস্তভাবে রাখা। ঘরের মাঝখানে দুখানা হালকা বেতের চেয়ার আর একটা ছোট্ট বেতের টেবিল।

এই উন্নাসিক সুন্দরী এবং অভিজাত মহিলাটির হয়তো কোন মেসবাসী ভদ্রলোকের সিঙ্গল সিটেড ঘর দেখতে পাওয়ার অভিজ্ঞতা নেই, থাকলে তুলনাটা মনে আসত।

তবে নিতান্ত নিরীক্ষণ করে দেখতে দেখতে বলে ওঠেন, 'এত চটপট ঘর সংসার গুছিয়ে ফেলা দেখে তো নেহাত আনাড়ি বলে মনে হচ্ছে না।'

প্রতিটি কথাই যেন ব্যঙ্গের রসে জারিত। কিন্তু ভদ্রলোকটি বোধকরি ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা। তাই স্মিত মুখে বলেন, 'ক্রেডিটটা অবশ্য আমার নয়। নাড়ি জ্ঞান আছে এমন একজনের সহায়তাতেই সম্ভব হয়েছে।···বাড়িওয়ালা

গিন্নীর অবদান এসব। তিনিই সেচ্ছায় এই ভারটি হাতে তুলে নিলেন বলেই এতটা গুছনো মনে হচ্ছে।'

'ও! বটে না কী? এত সব বিনা পয়সায়?'

'বাঃ! তাই আবার হয় না কী? আর কোনো ভদ্রসন্তান তা নেবেই বা কেন?'

'বুঝেছি। বেশ কিছু কমিশন মহিলা খেয়েছেন মনে হচ্ছে—'

'হতে পারে, বলতে পারি না। মেয়েরাই মেয়েদের ভাল বোঝে। তা এক কাপ চা অফার করলে কী খুব ধৃষ্টতা হবে।'

মহিলা প্রায় ঝঙ্কার দিয়ে বলে ওঠেন, 'এই ওয়েদারে না করলেই বরং অভদ্রতা হবে। তো ওই জনতা স্টোভেই?'

'তাছাড়া উপায় কী?'

বলে এগিয়ে গিয়ে, স্টোভটা জ্বালাতে যান। হাতের কাছেই অবশ্য সব সরঞ্জাম মজুদ। এমন কি, একটা ছোট্ট স্টেনলেস স্টিলের কেটলিতে কাপ দুই চায়ের মতো জল রাখাই আছে। হয়তো একাই দু'কাপ খান।

ঘরের একেবারে একটি কোণে একটা বাজার চলতি 'ওয়াটার ফিল্টার'ও বসানো।

মহিলা সেদিকে একটু তাকিয়ে বাঁকা গলায় বলেন 'অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই। তো খাবার জলের ব্যবস্থাটি কী? এই ঘরটা ভিন্ন আর তো কিছু দেখা যাচ্ছে না। সেই মহা মূল্যবান সেপারেট বাথরুমের কল থেকেই না কী?'

'তাই হয়তো জুটত। তবে বাড়িওয়ালাদের কাজের লোকটা কোথাকার কোন ভাল টিউবওয়েল থেকে জল আনে। আমার জন্যও এনে দেয়। কিন্তু এত কথা জেনে কী বা হবে? ওঃ। চা খাবার আগে জলটার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে?'

'কুটিল মাথা এই রকমই চিন্তা করে। তুমি নিজে খেয়ে চলেছ সেটা আমি—' একটা ঢোক গিলে বলেন মহিলা, 'চাটা আমিই বানাচ্ছি বললেও হয়তো আবার তার অন্য অর্থ করে ফেলা হবে।'

বানাবে? আঃ! বড় আরাম পেলাম শুনে।' এই ঠাণ্ডায় ঝুম হয়ে বসে হাতে এক কাপ চা পাচ্ছি ভেবেই রোমাঞ্চ হল।'

বলেই ভদ্রলোক বিছানার ওপর বসে পড়ে একটা সিগারেট ধরান। এবং কর্মরতা মহিলার অনেকখানিটা উন্মুক্ত মাখন রঙা পিঠটার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে দেখে আস্তে বলেন, কাঁধের ঝোলাটার মধ্যে গানটান কিছু একটা আছে নিশ্চয়। তাইতো থাকে।··· গান কার্ডিগান ছাতা-টাতা!'

মহিলা দু'কাপ চা ঢেলে বেতের টেবিলটার ওপর বসিয়ে রেখে বলে উঠলেন, 'বাড়িওয়ালা গিন্নী যখন এতই হৃদয়বতী এবং স্মার্ট চা-টা করলেই পারেন।'

সিগারেটটায় একটা লম্বা টান দিয়ে ভদ্রলোক একটু হেসে উঠে বলেন, 'হৃদয়বতী অবশ্যই। তবে দ্বিতীয়টি নয়। স্রেফ ঘটি গিন্নী। ভারী সারি ওজনদার। মাসিমা না বলে দিদা বললেও কিছু এসে যায় না।'

'ও, তাই বুঝি ?'

মহিলার মুখটা হঠাৎ যেন আলো আলো ভাব হয়ে যায়।

নিজের কাপটায় একটা চুমুক দিয়ে আরামসূচক একটু 'আঃ' করে বলেন, 'তা রান্নাটা কিসে হয় ? ওই জনতা স্টোভেই ?'

'রান্না! রান্না করেও খাই মনে হচ্ছে তাহলে ? কলকাতা শহরে কী ভাতের অভাব ?'

'হুঁ'...

বলে মহিলা কেবলই ঘরের দৃশ্যটি দেখতে থাকেন। যেন হঠাৎ কোনো রহস্য আবিষ্কার হয়ে যাবে।

কিন্তু ভদ্রলোক এখন একটু চঞ্চল হয়ে ওঠেন। সেই একপাটি কপাট খোলা জানালাটার ধারে গিয়ে উদ্বিগ্নভাবে বলেন, 'মুশকিল হল তো! এ যে দেখছি রীতিমতো বৃষ্টি নেমেছে। দারুণ ঝোড়ো হাওয়াও।'

মহিলা সে কথায় কর্ণপাত করেন না।

ভদ্রলোক আবার সরে এসে একটু বসেই, উঠে পড়ে দেখতে যান।...

'নাঃ! এ বৃষ্টি এখন আর সহজে থামবে বলে মনে হচ্ছে না। ট্যাক্সি অটো কোনো কিছুই পাওয়া যাবে বলে আশা নেই।'

মহিলা তথাপি নীরব।

অথবা নীরবও নয়, খুব মৃদু গলায় একটু গানের সুর ভাঁজছেন যেন।

কিছুক্ষণ বিরতি।

একসময় হঠাৎ একটা প্রশ্ন 'তুমি কি এখন তোমার মায়ের কাছে রয়েছ ?'

'মায়ের কাছে !'

মহিলার একটা ঠিকরে ওঠা ভঙ্গি, অ্যাবসার্ড কথা। জানো না মা নিজেই কোথায় থাকতে পান তার ঠিক নেই। দাদা বৌদি ক্রমেই যা ব্যবহার করছে। ওখানে আছি হঠাৎ একথা মনে হল যে।'

'না। এমনি মনে হল। তখন বললে কিনা ভবানিপুরে যাব।'

সে যা হোক একটা কিছু বলার জন্যে।'

'যা হোক একটা কিছু বলার জন্যে! অদ্ভুত তো! যদি তাই নিয়ে যেত ?'

'যেতাম! না গেলে নিয়ে যেত ?'

আবার কিছুক্ষণ বিরতি।

'অন্নপূর্ণা'র সেই ফ্ল্যাটেই ?'

ঈষৎ বিরক্ত কণ্ঠের উত্তর, 'তাছাড়া ?'

'তা বটে। তা নতুন মিস্টারের সঙ্গে কেমন বনিবনা চলছে ?'

ভদ্রলোকের এই প্রশ্নটিতে ম্লান ঈষৎ কৌতুকের স্বর।

তথাপি মহিলা যেন ছটফটিয়ে ওঠেন। এবং জ্বলন্ত স্বরে বলেন, 'তোমারই প্রাণের বন্ধু। নিজেই জানো ওর হাড়হদ্দ।'

'ড্রিংকটা ছাড়াতে পেরেছ ?'

'ছাড়াতে ? কয়লাকে ধুলে ময়লা কেটে ফরসা হয় ? সেটা তো একটা ওয়ার্থলেস। আবার বেহেড।'

তারপর দুপক্ষই স্তব্ধ বেশ কিছুক্ষণ!

মহিলা হঠাৎ যেন চেতনা ফিরে পান। বলে ওঠেন, 'বৃষ্টি থামল ?'

'থামল কী ? আরো তো বেড়েই চলেছে তার সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া বাড়ছে। শালটা বার কর না। দারুণ ঠাণ্ডা। আজই বোধহয় টিভিতে বলছে এটা এ বছরের শীতলতম দিন।...'একটু হাসলেন।

বললেন, 'একটা ছেলেমানুষি খেয়ালে- মুশকিলে পড়ে গেলে। এতক্ষণে বাড়ি পৌঁছে রুম হিটার ঘরে জেলে আরাম করে গুম হয়ে বসে, আর এক কাপ গরম চা খেতে পেতে। এখন কপালে কী দুর্ভোগ আছে দেখ।'

মহিলা যেন ঝংকারের জন্যই উদগ্রীব হয়ে আছেন। তাই ঝংকারে ঝংকৃত হন, 'দুর্ভোগ কথাটার অর্থ ?'

অর্থ আর কী! এই আবহাওয়ায় কোনো যানবাহন পাওয়া তো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে। রাতও তো বেড়ে চলেছে'।

মহিলা প্রায় দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন এখন আবার চেয়ারে বসে পড়ে কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, 'যদি নাই পাওয়া যায় ? ফিরতেই হবে, এমন কোনো কথা আছে ?'

'আরে বল কী ?'

ভদ্রলোক সহসা সশব্দে হেসে ওঠেন, 'এখানের অবস্থা তো দেখছ ? একফালি প্যাসেজ পর্যন্ত নেই যে সেখানটায় কোনোমতে পড়ে থেকে অবস্থা ম্যানেজ করে ফেলতে পারব।'

'ঘরটা যথেষ্ট বড়।'

'তাতে কী ? একা একটা পরপুরুষের ঘরে রাত কাটানো ?'

'থামো! নির্লজ্জতার একটা সীমা আছে!'

'যাঃ বাবা! এই হতভাগ্য লোকটাই নির্লজ্জতার দায়ে পড়ল ? তুমি তো সবই লিগালি মেনে চলার পক্ষপাতী। তাই বলছিলাম।'

'আমার ভীষণ মাথা ধরেছে। মাথা ছিঁড়ে পড়ছে।'

বলেই মহিলা তাঁর ভ্যানিটি বটুয়ার ফাঁস খুলে তার মধ্যে থেকে হাতড়ে

একটা মাথাধরা নিবারক বটিকা বার করে কাতরভাবে বলেন, 'একটু জল চাই।'

ভদ্রলোক এক গ্লাস জল এনে অসহায়ভাবে বলেন, 'এটা খেলে তো আবার ঘুম পায়।'

'ঘুমই তো সকল যন্ত্রণার নিবারক।'

'তাহলে? এখন কী হবে?'

'কী আবার। সরো, একটুক্ষণ শুতে দাও।'

২

কিন্তু তারপর? তারপর ঝোড়ো হাওয়ার তাণ্ডব কমে গিয়েছিল। তারপর কী ঘটল সেটাই এখন একক শয্যায় শুয়ে বিনিদ্র রাতে ভেবে চলেছেন ভদ্রলোক।

এখন মধ্যরাত।

ঘরে আবছা নীল আলো।

বেতের চেয়ারের পিঠে গরম কোটটা ঝুলছে। আলনার ওপর লম্বা হয়ে ঝুলছে ছাড়া ট্রাউজারটা। ভদ্রলোকের গায়ে আকণ্ঠ একখানা র‍্যাগটানা তাঁর মুদ্রিত চোখের সামনে · যেন দূরদর্শনের পর্দায় ফুটে উঠছে তারপরের ঘটনা।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি এই বিছানায় এই বালিশটায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল পল্লবী।

তার গায়ের ব্যবহারে অভ্যস্ত উগ্র পারফিমের গন্ধটা বন্ধ ঘরের মধ্যে এখনো জমাট হয়ে আটকে রয়েছে।

হ্যাঁ, তারপর?…

অসম্ভব একটা সুখানুভূতি আর অসম্ভব একটা আতঙ্ক দুইয়ে মেশা মানসিকতা নিয়ে সেই ঘুমিয়ে পড়া মুখটার দিকে তাকিয়ে বসেছিল শান্তনু।

কতক্ষণ কে জানে হয়তো যুগ যুগই পারত।

ছন্দ পতন ঘটল কর্কশ একটা আওয়াজে।

হ্যাঁ সুরেলা ভোর বেলাটার আওয়াজ এখন বিশ্রী রকম কর্কশ লাগল খুলতেই…

…বাড়িওয়ালা গৃহিণী মাসিমার গোলগাল একখানা সিঁদুর টিপ পরা মূর্তি সামনে ফুটে উঠল।

'ফিরেছ বাবা ? আমরা সেই থেকে ভাবনা করছি। কই, তোমার ফেরার কোনো সাড়াশব্দ পেলাম না। খাবার জন্য বেরুতেও দেখলাম না। এদিকে সন্ধ্যে থেকে এই দুর্যোগ ! যাইহোক এখন একটু কমেছে। তোমার মেসোমশাই বললেন, একবার খবরটা নিয়ে এস তো ছেলেটার। কোথায় আটকা পড়ে গিয়ে হয়তো ফিরতে পারে নি।'

মাসিমার রান্নামহলের এলাকা থেকে এই মেজেনাইন ফ্লোরের ঘরটা সহজে উঠে আসা যায়। এটাই মূল পথ। তাই মাসিমাই সর্বদা আসা যাওয়া করেন।

'হঠাৎ কী অকস্মাৎ দুর্যোগ বল ? তোমার মেসোমশাই তো কোর্ট থেকে ফিরেই হাঁচতে শুরু করেছেন। এখন ফুটবাথ নিয়ে বসে আছেন—ও কী বিছানায় শুয়ে কে ?'

নাঃ। যথেষ্ট সাবধানেও কাজ হয়নি। দরজায় কপাটটা আধ ভেজানো এবং সেটাকে ধরে নিজের শরীরটাকে দিয়ে যতটা আড়াল করা যায় করেছিল শান্তনু। তবু—

ফল হলো না।

অতএব শান্তনুকে উদাত্ত হতে হল।

'আর বলবেন না। একটা কাজে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে ফিরছি—দেখি আমার মামাতো বোন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে 'ট্যাক্সি ট্যাক্সি' করছে। আর কোনো ট্যাক্সি থামছে না। বাধ্য হয়েই আমার ট্যাক্সিটা থামিয়ে বললাম, 'উঠে আয়। আমিই তোকে একটা লিফট দিই। গড়িয়াহাটেই নামিয়ে দিয়ে চলে আসতাম। তো দুর্মতি হল মেয়ের বলে কী তুমি হঠাৎ পুরনো পাড়া ছেড়ে কোথায় চলে এসেছ জানি না। দেখে যাই তোমার নতুন আস্তানা—তো এসে ঢুকলো তো বৃষ্টি…

আর পরে দেখি কী জ্বর এসেছে।

'জ্বর !' মাসিমা চমকিত। শিহরিত।

'না না এমন কিছু না ! ওই ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপুনি দিয়ে জ্বরের মতো ভাব আর কী ! ওই রকমই ধাত ওর ছোট থেকে। একটুক্ষণ কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। শীত ভাঙলেই ঠিক হয়ে যায়। গেছেও বোধহয় এতক্ষণে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এ সময় এখন একটা ট্যাক্সি পাই কী করে। কী সমস্যায় যে পড়া গেল। ওর বাড়িতেও ভাবনা করছে নিশ্চয়। এদিকে আমিও—

মহিলা তাঁর পাতানো বোনপোটির মুখের দিকে এতক্ষণ অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। একসঙ্গে এত কথা কবে বলেছে ছেলেটা ? আহা, বিপদে পড়েছে বলেই…তা বিপদ নয় ? হলেও মামাতো বোন হঠাৎ একটা যুবতী মেয়েছেলে—বিছানায় এসে লম্বা।

বলে ওঠেন, 'কোথায় বাড়ি বললে ?'

'ওই তো গড়িয়াহাটে '

'ওমা! তাহলে আর ভাবনা কী? কর্তা তো বলছেন, বিষ্টি তো থামল সবে তো রাত সাড়ে ন'টা। তাসের আড্ডায় ঘুরেই আসি একবার···পৃথিবী উল্টে গেলেও তো ওই আড্ডাটির নড়চড় হবে না।

যতনলাল তাই এখনো গাড়ি গ্যারেজ করেনি। তো যাবেন তো সে ওই গড়িয়াহাটেই। তোমার বোনকে পেঁছে দিতে পারবেন।'

'ওঃ মাসিমা! তাহলে তো বর্তে যাই! মেসোমশাইকে আবার ব্যস্ত করা -'

আহা এতে আবার ব্যস্ত করার কী আছে? চালাবে তো যতনলাল। তো তোমার বোন হুঁশ করে বাড়ি চিনিয়ে দিতে পারবে?'

ভদ্রলোক একবার সেই শায়িতার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তা আবার পারবে না কেন? এমন কিছু একশ পাঁচ ডিগ্রি জ্বর নয়। ডাকছি।'

মাসিমার 'বোনপো' শায়িতার কপালে একটু হাত ঠেকিয়ে বলেন, 'একদম ঠান্ডা। কপাল ঘামছে। 'অ্যাই পলু-পলু! ওঠ গাড়ি পাওয়া গেছে! চটপট উঠে পড়।'

'গাড়ি পাওযা গেছে?'

পলু উঠে বসেই হাতের কাছে ছড়ানো শালখানা গুছিয়ে গায়ে জড়ায়। তারপর নেমে পড়ে বলে 'কী করে পেলে? উঃ বাহাদুর ছেলে!'

যেন ঘরের দরজাব সামনে অন্য কারো উপস্থিতি নেই।···

শান্তনু বলে. 'আমার কোনো বাহাদুরি নেই। এই যে সবটাই ও'র অবদান। এই আমার মাসিমা! যাঁর কথা এতক্ষণ বলছিলাম তোকে। ও'দেরই গাড়ি। যাবে গড়িয়াহাটের দিকে তোকে ড্রপ করে দেবে।'

এ সময় মাসিমা একটু এগিয়ে এসে বলে, 'এখন ভাল লাগছে তো মা? দেখ তো বেড়াতে এসে কী বিপত্তি। ·তো বাবা শান্তনু তোমার মেসোমশাই বলেছিলেন. 'জাস্ট ক্লাবটায় একবার ছুঁয়ে আসবেন। বড়জোর আধঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট। আবার তো গাড়ি ফিরবে তো তুমি বাবা একটু সঙ্গে যাও না। যতই হোক তোমার বোনের বাড়ির লোকেরা তো বলতে পারে কেমন ধারা দাদা! অসুস্থ বোনটাকে একটা নিপরের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্দি হলো! আমি ও'র শাশুড়ি হলে তাই বলতুম বাবা. তা সত্যি করেই বলছি।'

পল্লবী কটাক্ষে এই মাসিমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে।

ওঃ। মহিলাটি কি সত্যিই ওরকম সরল. ভদ্র! না কী বিষম পলিটিক্স জানা? নিজের কর্তার সঙ্গে একটি সুন্দরী যুবতীকে গাড়িতে তুলে দিতে রাজি নন, তাই এই 'জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা!'

শান্তনু হাতে চাঁদ পেয়ে যায়। বলে ওঠে, 'ওঃ মাসিমা, তা হলে তো দারুণ হয়ে যায়।···ওর বাড়িতেই খাটটি সেরে আসা যায়। আমার একদিনের ইডলি

ধোসার খরচা বেঁচে যায়। কি রে পলু, তোর ফ্রিজের মধ্যে কী আর কিছু মজুত থাকে না? বাড়তি একজনকে ম্যানেজ করা যায় না? ··চল চল, মাসিমা কী উপকারই যে করলেন! আশ্যা এসে পর্যন্ত যা পাচ্ছি, পেয়ে চলেছি, তাতে আর ধন্যবাদ দেওয়ার সম্পর্ক নয়।' বলে এগিয়ে আসে।

মাসিমা বলেন, 'ঘরটা যে খোলা রইল বাবা!'

'ঠিক আছে। আপনি তো রয়েছেন, বন্ধ করে দেবেন। চাবির ডুপ্লিকেটটা তো আছে আপনার কাছে।' আসলে শান্তনু ইচ্ছে করেই এটা করে।

যদি কৌতূহলী মহিলা পরে ঘরে ঢুকে এসে নিরীক্ষণ করে দেখতে চেষ্টা করেন, কোনো রহস্য মেলে কিনা! এতক্ষণ ঘরের মধ্যে একটা মেয়ে। তা-ও বিছানায়। কেমন ধারা মামাতো বোন কী জানি।···

তাই ঘর উন্মুক্ত করে রেখে যাওয়াটা ভালো।···

শুধু দুটো খালি কাপ ছাড়া সন্দেহজনক আর কিছুই তো পাবেন না।

হ্যাঁ এই আচ্ছন্ন আচ্ছন্ন ঘুম ঘুম চোখেও শান্তনু তখনকার মানসিকতাটি অনুভব করছিল।···

কিন্তু তারও পর?

ক'তো রিলের ছবি?

ক্রমশই তো ঘটনা ঘটে চলেছে।

মেসোমশাই বললেন, এই সপ্তপর্ণীতে? মাই গড। এই তো চার গজ দূরেই যাচ্ছি আমি।'

৩

আশ্চর্য! অভাবনীয়। কী দেখে চলেছে শান্তনু?···

শান্তনু সপ্তপর্ণীর সেই সাড়ে সাত বছর বাস করে আসা ছবির মতো সুন্দর ফ্ল্যাটটার মধ্যে উঠে এসেছে লিফট বেয়ে!···ল্যান্ডিং-এ নেমে অবাক হয়ে দেখছে—সব যেমন ছিল তেমনই রয়েছে!

শান্তনু দেখতে পেয়ে বলে উঠলো, 'আরেব্বাস তোমার মানিপ্ল্যান্টের গাছটা তো দারুণ বেড়ে গেছে এর মধ্যে!'

এর মধ্যে?'

'কত দিনের মধ্যে?'

'শান্তনু যতদিন আর দেখেনি তত দিন, তাই না?'

'কিন্তু সেটা কতদিন ?'

ছ'মাস ? আট মাস ? নাঃ ! দেড় বছর ।

না কী দেড়শো বছর ?

এতদিন সব যথাযথ থাকে ?

'রাস্কেলটা কোথায় ? ফেরেনি না কী ?'

'এখনই ? এত গুডবয় ? বারোটা বাজার আগে ?...ক্লাব থেকে যখন তাড়িয়ে দেবে, তখন ড্রাইভার আর কেশব দুজনে চ্যাংদোলা করে ধরে তুলে দিয়ে যাবে ! ...যেদিন হঠাৎ লিফট বন্ধ থাকে নিচের তলার ল্যান্ডিংয়েই পড়ে থাকে, ওই রিসেপশান-এর সোফাটায় ।'

'এটা অ্যালাউ করে চলেছ ?'

পল্লবী হঠাৎ আক্রমণাত্মক ভাবে বলে ওঠে, 'না হলে ? আবার এক্ষুণি একটা কেস ঠুকতে যাব ?...তোমার আবাল্যের বন্ধু । তুমিই ওকে আদর করে বাড়িতে ডেকে এনেছিলে । তুমি ওকে জানতে না ?'

'জানতাম না তা বলতে পারি না । তবে আশ্বাস পেয়েছিলাম, প্রকৃত স্নেহ আর আন্তরিক দরদ পেলে ও ঠিক হয়ে যাবে ।...সারা জীবন--সেই শৈশব থেকে তার অভাবেই অমন নষ্ট হয়ে গেছে !'

হ্যাঁ সেই আশ্বাসই পেয়েছিল শান্তনু । তার বন্ধু কৌশিক সম্পর্কে কার কাছে আশ্বাস পেয়েছিল ? ওই পলুর কাছেই না ? কারণ কৌশিকের বাবার দায়িত্বজ্ঞানহীনতা । আর যে বিমাতার কাছে পালিত তার অতি স্বার্থপরতা কৌশিককে ঠেলে দিয়েছে বিষাদ সমুদ্রের দিকে ।... এ কাহিনী বলেছিল শান্তনু পল্লবীর কাছে ।

আগে আগে পল্লবী যখন বিরক্ত হয়ে বলেছে 'ওই মোদো মাতালটাকে বাড়িতে নিয়ে আস কেন রোজ রোজ ।'...শান্তনু বলেছে, 'আমি বেচারাকে একটু বাঁচিয়ে তোলার আশায় । ওঃ কী ব্রাইট একটা স্টুডেন্ট ছিল । আসলে আরো ভেঙে পড়ল ওর দিদির ব্যবহারে । দিদিই ছিল ওর একমাত্র আপনজন । সেই দিদি একটা বাজে লোকের সঙ্গে মিশে পালিয়ে গেল তার সঙ্গে ।... বলেছিল, 'না কী জীবন জিনিসটাতো একটাই । কার জন্যে বরবাদ করবো ? তোর জীবন তুই গড়ে নে । পুরুষ মানুষের অনেক সুবিধে ।' সেই থেকে—

জীবন জিনিসটা একটাই ।

সে কথা পরে পল্লবীও ভেবেছিলো ।

তখন পল্লবী বলেছিল, 'আমি অবশ্য ইচ্ছে করলে তোমার ওই নষ্ট হয়ে যাওয়া বন্ধুকে ওই নেশা টেশা থেকে মুক্ত করে ফেলতে পারি ।'

পল্লবীর চোখে মুখে রহস্যের আভাস খেলেছিল । পল্লবীর কথার সুরে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সুর ।

শান্তনু বলেছিল, 'সত্যি ? তাই পারো ? তা হলে সেটা ট্রাই করতে শুরু করো ! কিন্তু···কী করে বল তো ?'

পল্লবী হেসে গড়িয়ে বলেছিল, 'বিষে বিষক্ষয় । এক নেশা থেকে আর এক নেশা ধরানো !'

যেন এ একটা খেলা । যেন একটা মজার নাটকের অভিনয় শুরু করে দুজনে ।

'জেলাস হবে না তো ?'

'নাটকের পাত্র-পাত্রীদের তাই হয় না কী ?'

হ্যাঁ, এইভাবে আগুন নিয়ে খেলতে শুরু করেছিল শান্তনু ।···এইভাবে খাল কেটে কুমির এনেছিল !

কারণ বড় বেশি বিশ্বাসী মন তার । বন্ধুর সম্পর্কে বিশ্বাসী, স্ত্রীর সম্পর্কে বিশ্বাসী !

ভাবেনি অন্যকে নেশা ধরাতে গিয়ে নিজেই নেশাগ্রস্ত হয়ে যাবে পল্লবী ! ভাবেনি কৌশিক তার চিরকালের বিশ্বস্ত হৃদয়খানা নিয়ে—ক্রমশ সীমারেখার সীমাটা অতিক্রম করে বসবে ।···

তারপর ?

ক্রমশ যা হবার হতে থাকলো !

নিঃসন্তান পল্লবীকে রক্ষা করতে কেউ হাত বাড়াতে এল না ।

কিন্তু তেমন হাতই কী বাঁধভাঙা নদীকে আটকাতে পারে ?···সসন্তান রমণীও কী ঘর ছাড়ে না ? অথবা ঘরখানা ভেঙে ফেলে না ?

পল্লবী বলেছিল, তখন যে বললে আজ ইডলি-ধোসার খরচটা বাঁচাবে ? তার মানে কী ? রোজ ইডলি-ধোসা খাও না কী ?'

'সেটাই সুবিধে ! বাসা থেকে নেমে একটু বেরোলেই একটা ভালো দক্ষিণ ভারতীয় রেস্টুরেন্ট আছে ।'

'তাই বলে রোজ ওই—ডিনার ? ছি ছি ! সাধে বলি 'অপদার্থ' ।'

'হ্যাঁ, এই কথাটা বরাবরই বলে এসেছে পল্লবী, 'অপদার্থ' ! অপদার্থ একটা !'

কিন্তু তার কারণটা কি ? অকর্মা বলে শুধু সাদা মাটা চলতি অর্থেই বলেছে কী পল্লবী তার ডক্টরেট করা একটা নাম করা প্রফেসর স্বামীকে ?

··কারণ খুঁজতে গেলে আরো গভীরে যেতে হয় ।···অনেক পিছিয়ে যেতে হয় । আচ্ছা দূরদর্শনে হয়ে চলা এই ছবিটা কী একশো রিলের ?···তাই ফ্ল্যাশ ব্যাকে একটা বিরাট কাহিনীর বিস্তার !···

সেই পিছিয়ে যাওয়া জীবনের একটা দিনের ছবি ঝলসিয়ে উঠলো ।

দৃশ্যের অবতারণা —

শান্তনুর এক বিদেশ ফেরত 'গাইনি' বন্ধুর চেম্বার। খানিক আগে পল্লবীকে নিয়ে এসেছিল শান্তনু। এখন বেশি রাত, তাকে বাড়ি পেঁছে দিয়ে এসে আবার বসেছে। বসেছে --বন্ধুর রোগীরা বিদায় হয়ে যাওয়া নির্জন চেম্বারে।

বন্ধু বলছে, 'শুনে আপসেট হস নে ভাই তোর বৌয়ের কোনো দিনই কোনো চিকিৎসাতেই মা' হবার কোনো আশা নেই!'

'অ্যাঁ!'

শান্তনু প্রায় বসে গিয়ে বলেছিল, 'এত রকম চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি হয়েছে আজকাল—'

ডাক্তার বন্ধু মৃদু হেসে বলেছিল, 'হয়েছে তো। টিউব বেবি এবং আরো আধুনিক —

'থাক থাক সে সব শুনেছি।'

শান্তনু হতাশভাবে বলেছিল, 'এম। ট্রিটমেন্ট হতে পারে না যাতে একদম স্বাভাবিকভাবে– '

'তা হয় না রে ভাই।···সেই আমাদের পিতামহীদের কথাই শেষ কথা··· চেষ্টায় সব করতে পারে, বাঁজায় পুত বিয়োতে নারে!'

শান্তনু হঠাৎ কাতরভাবে বলে ওঠে, 'এ কথাটা তুই কিছুতেই ওকে জানতে দিসনি ভাই!'

বন্ধু একটু আশ্চর্য হয়ে বলেছিল 'কোন কথাটা?'

'ওই যে অক্ষমতাটা ওরই! তাহলে দুঃখে মরে যাবে! ওর ধারণা সেটা আমার দিকের।'

বন্ধুর হাঁ-টা বুজতে দেরি হয়েছিল।

'আর তুমি শালা সেই ধারণাটাকেই কায়েম করতে চাইছ?

'ক্ষতি কী? তাই ভেবেই যদি ও শান্তি পায়।'

'তাজ্জব! তবে শালা তুই ওকে এখানে নিয়ে এলি কেন? রিপোর্ট দেখলেই হতো—'

'ঠিক রিপোর্ট দিবি না। বলবি সামান্য কিছু জটিলতা আছে, কিছুদিন ট্রিটমেন্ট করলেই ঠিক হয়ে যাবে!'

'তো আনলি কেন, সেটা তো বলছিস না।'

'সাধ করে কী আর এনেছিরে ভাই। পাগল করে তুলেছিল। ওইভাবে জবরদস্তি করে আমায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল ওর নিজেরই কোন এক ডাক্তার মামাতো দাদার কাছে। তো সে আমায় 'নির্দোষ' সার্টিফিকেট দিলে একেবারে রেগে আগুন। বলে, 'ঘুষ খেয়েছে!···চিরকালের পয়সা পিশাচ ওটা।'

বন্ধু অপলকে একটু তাকিয়ে থেকে বলেছিল, 'আর তুমি তোমার সেই বৌকে—

ওঃ। হে মহান প্রেমিক! তোমার পাদপদ্মে শত সেলাম।'

শান্তনু কাতরভাবে বলেছিলো. 'কী করব ভাই, ভয়ানক ইমোশন্যাল! কবে না কী কোন একটা বিয়ে বাড়িতে ওকে বরণডালা ফালা ছুঁতে দেয়নি 'বাঁজা মেয়েমানুষ' বলে, তাই বাড়ি ফিরে সুইসাইড করতে চেষ্টা করেছিল!'

বন্ধু একটু কৌতুক হাসিতে চোখ নাচিয়ে বলেছিল, 'চেষ্টা করেছিল। ভাগ্যিস করে ফেলেনি! তাই সুইসাইডটা তুমিই করতে বসেছো! কেন? তোর বৌকে এটা বোঝাতে পারিস না, নাই বা মা হতে পেলে? একটা দত্তক নিলেও তো হয়। এমন তো চিরকালই হয়ে আসছে। রাজারাজড়া থেকে দীনহীন গরীবের ঘরেও।'

'বুঝবে না ভাই! দারুণ এক বগ্‌গা অবুঝ। শুনলে বিশ্বাস করবি? এত আধুনিক অথচ একমনে মাদুলি, কবচ, ঝাড়ফুঁক করে চলেছে। · বাসনমাজা মেয়েটা পর্যন্ত যদি বলে, 'অমুক জায়গায় অমুক থানে এক জাগ্রত দেবী আছেন, একেবারে অব্যর্থ।'···তো তার সঙ্গে ছুটছে সেখানে। তা সে অজ পাড়াগাঁয়ে নেহাৎ আনকালচার্ড লোকের কাছেও!'

বন্ধু নিশ্বাস ফেলেছিল।

'জানি মেয়েদের মধ্যে ওই একটা ব্যাপার আছে। · আবার মা হতে না পাওয়াটা মেনেও নেয় অনেকে!'

'যার যেমন মানসিকতা! এতে শিক্ষাদীক্ষা আধুনিকতা কোনো কিছুই কাজে লাগে না দেখছি!'

হ্যাঁ, তাই দেখেছিল শান্তনু!

কিন্তু হঠাৎ একদিন!

৪

হ্যাঁ, হঠাৎ একদিন যেন কোত্থেকে ভেসে আসা ·ভয়ঙ্কর একটা তীব্রস্বর শুনতে পেলো শান্তনু!

খুব মন দিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখছিল 'শিক্ষা ও সাক্ষরতা' নাম দিয়ে।··· হঠাৎ সব চিন্তা টিন্তা ভেঙে খান খান হয়ে গেল।···

'কী? কী বললেন? আবার আমি আপনার ওই ছোটবোনের ননদের না

কার শ্বশুরবাড়ির গ্রামে ছুটব—'ইচ্ছা বটের' গাছের ডালে ঢিল বাঁধতে ?'

খবরদার বলে দিচ্ছি আর এইসব আদিখ্যেতা করতে আসবেন না আমার কাছে! ঢিল বাঁধতে যেতে হবে। আস্ত একখানা থান ইট বাঁধলেও কিস্যু হবে না বুঝলেন ? আর সেটা আপনি নিজেই ভালো জানেন।...একটা অক্ষম অপদার্থ রাঙামুলো ছেলেকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে দিব্যি বসে বসে মজা দেখা হচ্ছে। ...পরের মেয়েকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো খুব সোজা। তাই না ? তাই কেবলই লোক দেখানো— চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে ? জেনে বুঝে ন্যাকামি।

ঘরের মধ্যে থেকে খোলা দরজা দিয়ে শান্তনু দেখতে পেলো, পল্লবী পট পট করে তার হাতের, গলার কোমরের যতো সব তাগা, তাবিজ, মাদুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে অভিযুক্তার সামনে।

কিন্তু কে সেই অভিযুক্তা ?

ওই রোগা হাড়সার ম্লানমুখ থান-পরা বিধবাটি ?...

কে আর ? আসামী শান্তনু সেনের মা।

কাকে আর অত শাসাতে সাহস পাবে শান্তনুর বৌ ?

কিন্তু অভিযোগটা কী মিথ্যে ?

জেনে বুঝেই কী ন্যাকামি করছেন না তিনি ? লোক দেখানো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন না ?

শান্তনু কী একদিন নিভৃতে তার মাকে বলেনি, ডাক্তার কী বলেছে, তা তো তোমায় বলেছি মা। তবে কেন আবার এত সব— '

মা! সর্বংসহা মা। একটা হতাশ নিশ্বাস ফেলে বলেছিল, 'সবই তো বুঝি বাবা। আসলে এক একটা খবরের ধুলো এলেই বৌমা তবু দুদশদিন একটু চাঙ্গা থাকে, আহ্লাদ আহ্লাদ মুখে বেড়ায়। নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়ম কানুন মানে, মেজাজটা ঠাণ্ডা থাকে কিছুদিন। সেটাই লাভ ভেবেই', একটু থেমে বলেন, 'তুই আমায় বারাসতের ভিটে বাড়িতে রেখে আয় শানু। বাকি জীবনটা সেখানেই পড়ে থাকব !'

কিন্তু কোথায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন ?

সে কি সপ্তপর্ণীর ওই ছবির মতো ফ্ল্যাটের হল-এ দাঁড়িয়ে ?

নাঃ। এ ফ্ল্যাট তো তখনো কেনা হয়নি।...তখন তো মনোহর পুকুরের সেই ভাড়াটে বাড়িটায়! কতদিন পরে যেন কেনা হলো এটা ?

হয়তো শান্তনু, তার অক্ষম অপদার্থ' নামটা কিছুটা ঘোচাতে প্রাণপাত করে এটা কিনে ফেলেছিল সাহস করে।... কতোদিন যেন লেগেছিল দেনা শোধ করতে।...

তবু সে-ও আজ থেকে বছর আট-দশ আগে। তাই সম্ভব হয়েছিল !... এখন ? চারগুণ দাম বেড়ে গেছে।...

সাড়ে সাত বছর এ ফ্ল্যাটে বাস করে গেছে শান্তনু। মাকে একবারও নিয়ে আসা আর হয়ে ওঠেনি। মা-ই নানা টালবাহানা করে পিছিয়েছিল। তারপর হঠাৎ একদিন প্রায় বিনা নোটিশে কেটে পড়লো মা। তার সেই প্রাণের ভিটে বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ফেললো।

এ ফ্ল্যাটটা—পল্লবীর প্রাণের। তিল তিল করে দিনে দিনে তিলোত্তমা করে সাজিয়ে তুলেছিলো। হয়তো এখনো তুলে চলেছে ওটাই ওর শখ। হঠাৎ হঠাৎ একেবারে দুর্লভ ক্যাকটাস এনে জানলার ধারে বসিয়ে দেবে। হঠাৎ হঠাৎ ঘরের জিনিসগুলোকে নিয়ে এধার ওধার করবে। দেয়ালের ছবিদের স্থানান্তর ঘটাবে।

গত দেড় বছরে আর কী নতুন সংযোজন বা বর্জন ঘটিয়েছে কে জানে!

শান্তনুর মনে হল দেড়শো বছর পরে এসেছে। আর এসে অবিকল একই দেখছে। কী আশ্চর্য, কী অদ্ভুত! শুধু মানিপ্ল্যান্ট লতাটা অনেকখানি বেড়ে গেছে।

আচ্ছা নাছোড়বান্দা পল্লবী তো…ডিভোর্সটা না করা পর্যন্ত ছাড়েনি। তবে পল্লবী কেন এখনো এখানে? এমন তো হয় না।

'ডিভোর্সি' মেয়েরাই তো তার তিল তিল করে সাজানো সংসারটাকে ফেলে রেখে চলে যেতে বাধ্য হয় সেই তার জন্মাগারের আশ্রয়ে। পুনর্মূষিকের অবস্থায় কাটায়। তারপর হয়তো আবার 'নতুন জীবন' বাছতে গিয়ে 'ছি ছিক্কার' সহ্য করে হয়তো বা সেই পরিত্যক্ত পিতৃগৃহেই ফিরে এসে হতনামা হয়ে দিন কাটায়। হয়তো তুচ্ছ কিছু চাকরি বাকরি ধরে।… সঙ্গে কিছু দায়িত্ব থাকে হয়তো। জেদ করে স্বামীর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া শিশু সন্তানদের দায়িত্ব।

পল্লবীর অবশ্য সে সমস্যা নেই।

কিন্তু পল্লবী যেখানে সর্বেশ্বরী হয়ে থেকেছিল সেখানেই তাই থাকল কেন? কী করে?

আর শান্তনু নামে লোকটা? সে রইল তার পাতানো মাসিমার দাক্ষিণ্যে নির্ভর করে। অজ্ঞাতবাসের মতো একটা আস্তানায় দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছে।

আশ্চর্য না?

সে-ও ওই লোকটার অপদার্থতার আর নির্বুদ্ধিতার একটি নিদর্শন। ফ্ল্যাটটা কেনা হয়েছিল একা পল্লবীর নামে।

কারণটা একটা তুচ্ছ আইনগত বাধার ফলে।

শান্তনু এ ফ্ল্যাট কেনার আগেই 'টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন' আয়োজিত একটি সমবায় আবাসনের জন্যে নাম লিখিয়ে বসে ছিল। তাতে নির্দেশ ছিল সম্পূর্ণ

ধার না শোধ করে অন্য কোনো প্রপার্টি কেনা চলবে না। অথচ না কিনলেই চলছিল না। সমবায় আবাসন? সে কি আবার বসবাসের যোগ্য ফ্ল্যাট? পল্লবী তার প্ল্যান দেখে বলেছিল 'ও ফ্ল্যাটে তুমি তোমার মাকে নিয়ে থেকো। আমার পোষাবে না। সাধে বলি অপদার্থ! কী বলে আমরা ওই থার্ড গ্রেডের একটা ফ্ল্যাটে থাকতে যাবো তা ভাবলে?'

অতএব সেখানে পরে আর টাকা দেওয়া হল না। সেটা পন্ড হলো। আর এখানে এটা পল্লবীর নামে তো সে সব কুটকচালে।

পুরনো কথায় কী হবে।

বর্তমানে—দৈবাৎ ঘটনাচক্রে একবার এ ফ্ল্যাটে এসে পড়ে শান্তনু বলে উঠেছিলো, তোমার মানিপ্ল্যান্টটা এরই মধ্যে এতোটা বেড়ে গেছে?' সেই বলাটা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় নিজেই শুনতে পেলো যেন।

কখন বলেছিলো?

আজই সন্ধ্যায় তো?

হ্যাঁ, এই মধ্যরাত্রে সেই সন্ধ্যাটার কথাই চিন্তা করে চলেছে শান্তনু।

'ওঃ। মানিপ্ল্যান্টটাই শুধু চোখে পড়লো?'

'আহাম্মকের তাই হয়। মূল্যবিহীন কিছু একটাই হয়তো দৃষ্টি আকর্ষণ করে।' এ কণ্ঠস্বর শান্তনুরই।

এতে যে পল্লবীর মুখটা লাল হয়ে উঠল কেন কে জানে।

পল্লবী হঠাৎ হুইসলের মতো ধ্বনিতে ডাক দিয়ে উঠলো, 'অলকা!' এবং অলকার একটু ছায়া দেখা মাত্রই বলে উঠলো, 'দু কাপ চা!'

'বানানো হয়ে গেছে দিদি।'

'বানানো হয়ে গেছে? আমি ফেরার আগেই? চমৎকার।'

'আগে কেন? বারান্দা থেকে দেখছিলাম। আপনার দেরী দেখে চিন্তা হচ্ছিল তো। তো-কম্পাউন্ডের মধ্যে একটা গাড়ি ঢুকতেই আর তা থেকে আপনাদের নামতে দেখেই চটপট—'

'ওঃ খুব ওস্তাদ! বললে তো আপনাদের! এঁকে চেনো? তাই এর জন্যেও—'

অলকা একটু হেসে বললো, 'ওঁকে না চিনি, আপনাকে তো চিনি। আপনার সঙ্গেই যখন এসেছেন—'

মনে মনে হয়তো বললো, আপনাকে কি চিনি?

শান্তনু ভেবে পায় না কেন এই বৃথা কথাগুলো! আবার ভেবে দেখলো, এটাইতো পল্লবীর স্বভাব।...বৃথা কথা বলে অকারণ রাগ প্রকাশ!

কিন্তু...সবই তো মেনে এসেছে শান্তনু বরাবর হাস্যবদনে। তবু পল্লবীকে খোয়াল কেন?

নো, পল্লবীকে তো নিজের দোষে খোয়ায়নি শান্তনু। পল্লবী তাকে ত্যাগ করলে কী করবে বেচারা?

পল্লবী অনায়াসে শান্তনুর বন্ধু কৌশিকের সামনে (বলতে গেলে একটা বাইরের লোকই তো) ভয়ঙ্করী মূর্তি নিয়ে বলেছিল, 'মুখোশ খুলে দেবো। সকলের সামনে তোমার মুখোশ খুলে দেবো। সবাই জেনে যাক তুমি কতবড় একটা ঠগ জোচ্চোর মিথ্যুক। ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে নিজে 'নির্দোষ' সেজে, আমাকে সংসারে সকলের সামনে হেয় করে রাখা হয়েছে। আমি বাঁজা মেয়েছেলে। কেমন? মিথ্যেবাদী! মিথ্যেবাদী!'

বন্ধু কৌশিক বলে উঠেছে, 'দোহাই তোদের শান্তনু, তোদের ওই দাম্পত্য প্রেমালাপের শ্রোতা হিসেবে আমায় এখানে আটকে রেখে বেঁধে মারিস নে। আমায় ছেড়ে দে। আমি একটা দাতব্য হাসপাতালে পড়ে থাকি গে। যত দিন না পায়ের প্লাস্টার কাটে।'

হ্যাঁ, সেই রকম একটা ব্যাপার ঘটেছিল তখন। রোড অ্যাক্সিডেন্টের শিকার কৌশিককে শান্তনু নিজের বাড়িতে এনে তুলেছিল। বলেছিল, ডাক্তার তো বলেছে, ম্যাক্সিমাম ছটা সপ্তাহ। তো সে কটা দিন হতভাগা বন্ধুর কাছে থেকে যা ক্ষ্যামা ঘেন্না করে।

'বাড়িটা তো তোর নয় শান্তনু। বাড়ির গৃহিণীর মত নিয়েছিস

বলেছিল অবশ্য গৃহিণীটির সামনেই। আর গৃহিণীটি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিল, 'আপনার থাকাটায় আমার অমত হবে, আমাকে এইরকম ছোটলোক ভাবেন আপনি?'

'আহা! ইস! কী কাণ্ড! তা কেন? তবে, ওটা হচ্ছে একটা পারিবারিক আইন। গৃহে একটা বহিরাগতকে পুষতে চাইলে, গৃহিণীর সুবিধে-অসুবিধেটা তো বুঝতে হবে।'

'আমার কোনো কিছুতেই অসুবিধে হয় না। শুধু আমার ওপর কোনো কিছু খবরদারি করতে না এলেই হলো। তা বলে মনে করবেন না স্বামীর প্রাণের বন্ধু বলে তাঁকে তোয়াজ করতে, রোজ রোজ ভালো ভালো নতুন নতুন রান্না করে খাওয়াতে বসবো। ও সব সেন্টিমেন্টের মধ্যে আমি নেই। সুতপা যা করে যেমন করে তাই করবে। ব্যস।'

কৌশিক বলে উঠেছিল, 'সুতপা কী মহাতপা তা জানিনা। তবে তার পারার নমুনাটি ফ্যালনা নয়। আর ভালো ভালো আর নতুন নতুন রান্না তো আপনাদের বাড়িতে রোজই। এই ক'দিনই তো দেখা গেল। নেমন্তন্ন বাড়ি ছাড়া এসব শৌখিন খাদ্য যে বাড়িতে রোজ রোজ খাওয়া হয় ধারণাই ছিল না।'

শান্তনু হেসে উঠে বলেছিল, 'তোর ধারণার সীমানা তো তোর ওই হাড়-কঞ্জুষ সৎমাটি। তাঁর সম্পর্কে জানা আছে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ। জানো পলু

দৈবাৎ কোনোদিন কৌশিকের সঙ্গে দেখা টেখা করতে ওর আস্তানায় গেলে একটু পরেই দেখা যেত ওর সেই সৎজননী খানিকটা ঘোমটা টেনে ঘরের মধ্যে চলে এসে বলতেন, বাবা খুশী। তোমার বন্ধুর জন্যে চা বানাচ্ছি তো একটু চিনি এনে দিতে হবে যে। ঘরে এক ছিটে নেই। আর পারো একটু গুঁড়ো দুধও।' হা হা হা। কোন নির্লজ্জ তখনো সেই চা খাবার আশায় বসে থাকে বলো? বলতেই হয় না কী, 'না না, থাক থাক। ব্যস্ত হবেন না। এইমাত্র খেয়ে এসেছি।' এই স্নেহময়ীর ছাত্রছায়ায় মানুষ হতে হয়েছে কৌশিককে। কৌশিক না কী ছেলেবেলায় বাবে ভাতের সঙ্গে আলুভাতে খেতে ভালোবাসত তাই প্রতিদিনই কৌশিক ভাত খেতে বসলেই, মহিলা হায় হায় করে ওঠেন, আজও ভাতে আলু দিতে ভুলে গেছেন বলে। রোজই না কী ভাবেন আজ নিশ্চয়ই দেবো।

পল্লবী হঠাৎ ছিটকে উঠে বলেছে, 'আর সেই বাড়িতে আপনি আছেন এখনো?'

'আহা কী করবে বেচারা! থাকতে তো হবে কোনো এক জায়গায়?'

'কেন? কলকাতা শহরে মেস নেই? হোস্টেল নেই? হোটেল নেই?'

'কৌশিক হেসে উঠে বলেছে, 'সবই আছে, তবে পকেটে পয়সা না থাকলে কিছুই নেই ম্যাডাম।'

'কেন? তাই বা নেই কেন? আপনি একটা শিক্ষিত ব্যক্তি না?'

'শিক্ষিত হয়েই তো হয়েছে যত জ্বালা। অশিক্ষিত হলে অনেক পথ থাকে।'

শান্তনু হেসে উঠে বলেছিল, কেন বাজে বকছিস কৌশিক? রোজগার কি করিস না তুই? তবে ওই বেচারা হাঁপানি রুগী বাবার সংসারটা চালাতে চালাতেই তো তোর- '

'আরে ওকথা ছাড়। এখন আমি হচ্ছি আমার প্রেতাত্মা।'

'কিন্তু কেন?'

'একটা মেয়ে দাগা দিয়েছে বলে চার পাঁচ বছর কৌশিকের সঙ্গে ঘুরে আর আশা আশকারা দিয়ে দিয়ে মেয়েটা হঠাৎ কিনা ওর গালে এক থাপ্পড় কষিয়ে বসল! দুম করে একটা মাড়োয়ারি ছেলেকে বিয়ে করে বসল!

'ওঃ। খুব পয়সাওলা বুঝি?'

'তা আর বলতে?'

'আর আপনিও দেবদাস বনে গেলেন। মদ ধরলেন?'

'জীবনে কখনো এতটুকু স্নেহ ভালোবাসা পাইনি ম্যাডাম। গোটা আষ্টেক ছেলেমেয়ের ভারে ভারাক্রান্ত স্বার্থপর বাপ, আর অসম্ভব ধুরন্ধর তাঁর দ্বিতীয় পক্ষটি এই ছিল জীবনের সম্বল। হঠাৎ যেন একটা স্বর্গের ছবি দেখেছিলাম। আর তারপর? এমন একখানা কর্মজীবনে এসে ঠেকে গেছি, যেখানে—'পানের' ঢালাও কারবার। আর তার সঙ্গে বে-আইনি উপার্জন।'

'জানেন বে-আইনি।'

'জানি বৈকি।'

শুনে শ্রোত্রী ভুরুটা একটু কুঁচকে বলেছিল, 'অবশ্য আমি ওসব আইন ফাইন মানি না। এযুগে কে কত আইন মেনে চলছে। নিজের জীবনটাকে তো ভোগ করতে হবে। একটা বৈ তো দুটো জীবন নয়? তবে হ্যাঁ - কেউ ঠকালে ভয়ংকর রাগ হয়। মনে হয়, নষ্ট করে ফেলি সে জীবন।'

'এই যে আপনার ওই ভালমানুষের ছদ্মবেশী বন্ধুটি। সারাজীবন—আমায় কীভাবে ঠকিয়ে আসছে। জানেন সেকথা? বলবো? মুখোশ খুলে দেবো? হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব?'

'ভাঙতে কী খুব বাকি আছে পল্লু?'

তবু তোমায় তো মচকাতে দেখি না। একবার ঘাড় নিচু করে স্বীকার করতে দেখিনা, সব ত্রুটি তোমার আর তোমার সেই মা-টি? বরাবর আমায় মাদুলি পরিয়ে এসেছেন। কেন? কেন আমি পার্সে টাকা রেখে চিরদিন বোকা সেজে থাকবো? আমি বাজারে যাচাই করব, আমার টাকাটা অচল কিনা।'

এই হয়েছিল ইদানীং পল্লবীর প্রসঙ্গ। যে কোনো প্রসঙ্গ থেকেই, প্রসঙ্গটাকে ওইখাতে বইয়ে আনতো। সে আর বোকা সেজে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকবে না।

অথচ তার মধ্যেই আবার হৃদয়বত্তা মানবিকতার পরাকাষ্ঠাও দেখা যেত।

শান্তনু কি ওর ওপর রাগ করত? না।

শান্তনু যেন ওকে করুণা করত।

শান্তনু যেন একটা অবোধ শিশুর বেযাড়া আবদারে হাত পা ছোঁড়া দেখত মাত্র।

তবু এইরকম অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যেই কেমন করে যেন শান্তনুর সংসারে কৌশিক দিব্যি সেঁটে বসে গেল।

ডাক্তার দু সপ্তাহকে' আরো ছ সপ্তাহে তুলেছিল। তারপর আরো কিছুদিন খেসারত দিতে হয়েছিল কৌশিককে সেই অ্যাক্সিডেন্টের জের মেটাতে।

কিন্তু ততদিনে এ সংসারে একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেছে।

মরিয়া হয়ে পল্লবী ডির্ভোস স্যুট এনে ছেড়েছিল। সে তার পার্সের টাকাটা ভালো কি অচল তা যাচাই না করে ছাড়বে না।

আর তার আত্মহারা চিত্তের সামনে খোলা রয়েছে একটা ভয়ানক আকর্ষণীয় বাজার।

কৌশিক বেহেড মাতাল, তবে কৌশিক বিবেকশূন্য নয়। শান্তনু দেখতে পাচ্ছে, কৌশিক তাদের সেই ছবির মতো ফ্ল্যাটের সাজানো ড্রইংরুমে বসে বলছে, 'শান্তনু, দোহাই তোর। তুই আমায় ছাড় এবার। বুঝতে পারছিস না

খাল কেটে কুমির আনছিস তুই! নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারছিস। আমি শুকদেব নই। আমি যে দারুণভাবে তোর বৌয়ের প্রেমে পড়ে যাচ্ছি। শেষে মাথা চাপড়াবি, বুক চাপড়াবি।'

বলতো অবশ্য তিনজনের উপস্থিতিতেই। আর শান্তনু কিছু বলার আগেই পল্লবী বলে উঠতো, 'দারুণ কেন, নিদারুণ ভাবেই তো পড়া উচিত। এরকম একখানা অতীব সুন্দরী স্মার্ট মেয়ের সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করেও যদি প্রেমে না পড়েন তো ধরে নিতে হবে আপনি মাটির ঘোড়া, পাথরের পুতুল।'

'কিন্তু পরিণাম?'

'পরিণাম আবার কী? অনিবার্যকে ঠেকাতে পারে? আর ঠেকিয়ে লাভই বা কী! জানেন কলেজে ডজন ডজন ছেলে আমার প্রেমে পড়েছে। তাদের কোনোটা বাসায় গিয়ে মরে থেকেছে কিনা কে জানে!'

কথা! কথা! কত কথা!

'শান্তনু! ভালো চাস তো এখনো আমায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দে। দুধকলা দিয়ে আর কালসাপ পুষে চলিস না।

শান্তনু এখন আমি দিব্য ফিট হয়ে গেছি। হাঁটা চলায় অসুবিধে নেই। ঠিক করেছি কাল চলে যাব।'

শান্তনু কিছু বলার আগেই একটি সুরেলা কণ্ঠ ঝঙ্কৃত হয়, ওঃ একেবারে ঠিক করে ফেলেছি। নিজেই সব কিছুর কর্তা? কে আপনাকে যেতে দিচ্ছে? কই যান তো দেখি!'

'ম্যাডাম, সামান্য সৌজন্যের খাতিরে কেন মিথ্যে একটা জঞ্জাল জমিয়ে রাখছেন বাড়িতে?'

'সে হিসেবটা কষবার ভারটা আপনি নাই নিলেন। যেমন আছেন, তাই থাকুন তো।'

'শান্তনু! শুধু আমিই নই, মনে হচ্ছে তোর বৌও আমার প্রেমে পড়ে বসেছে।'

'পড়ে বসলে, তোকে ঘাড় ধরে বার করে দিয়ে আবার উঠে আসবে এই তোর ধারণা? সঙ্গে সঙ্গে আরো গড়গড়িয়ে পড়তে থাকবে। হয়তো অতল খাদে।'

'শান্তনু! মুখ্যু আহাম্মক হতচ্ছাড়া তুমিই এটি ঘটালে। এখন তোমার পরিবার আমার প্রেমে হাবুডুবু খেতে বসেছে। বুঝলে?'

'কিছুদিন খেতে দে না। শেষপর্যন্ত হাঁপিয়ে পড়বে।'

'আমি ভেবে পাইনা, আসলে তুই সত্যিই একটা অবোধ সরল অতি বিশ্বাসী, না কি একটা শয়তান? ক্রাইম নাটকের ভিলেন! ইনোসেন্ট সেজে বসে বসে একটা ভয়ংকর কিছু শয়তানির প্যাঁচ কষছিস!'

এই সব শুনতে পাচ্ছে শান্তনু।

শান্তনুর যেন নাটকের সব পাত্রপাত্রীর ডায়ালগগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে। একাই সমস্ত দৃশ্যগুলো ম্যানেজ করে যাচ্ছে। নিজে বলছে। 'দেখ কৌশিক ও চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল, তোকে মদ ছাড়িয়ে ছাড়বে। তা সেই সময়টুকু ওকে দিতে হবে তো? একেবারে ফুসমন্তরে হয়?'

হ্যাঁ, এই কথাই বলেছিল শান্তনু। কিন্তু শান্তনু কী এতোদিনে বুঝে ফেলেনি সদিচ্ছার বশে কৌশিক মুখে যতই বলুক, যাবার ক্ষমতা ওর আর নেই · আর পল্লবী, সেই কী ছাড়বে ওকে? ছাড়বে কী করে? ছাড়তে পারলে তো?···অতএব সবটাই নিয়তির হাতে ছেড়ে দিয়ে বসে থেকেছে শান্তনু নামের লোকটা।

হয়তো কখনো ভেবেছে, আমি কি তা হলে খুব একটা ভুলই করেছিলাম? আমি ভাবতাম, ও আমায় প্রচণ্ড ভালোবাসে। যতই মুখে তড়পাক আমায় ফেলে চলে যাবে না। কিন্তু ও যে কী দারুণ খেয়ালি তাও তো জেনে আসছি এতোদিন!

হ্যাঁ, এইভাবেই একটি নাটক অভিনীত হয়ে চলেছিল সপ্তপর্ণী'র ওই ছবির মতো ফ্ল্যাটটায়। বাইরে থেকে তেমন কারো কোনো বুঝবার উপায় নেই। একমাত্র দর্শক কাজের মেয়েটা। যারা না কী ফ্ল্যাটবাড়ির জীবনে অপরিহার্য! আর যাদের সামনে ফ্ল্যাট বাসিন্দাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত জীবনের কোনো গোপনীয়তা থাকে না। থাকে না কোনো আব্রু।

তবে খুব বেশিদিন একটানা থাকে না তেমন কেউ, এই যা সুবিধে।·· একদা তারা নিজের মনিব বাড়িতে যেসব ঘটনা দেখে শোনে, কখনো কোনো ফাঁকে অন্যের বাড়ির কাজের মেয়েকে বলে ফেলে হালকা হয় বটে, কিন্তু ঘটনার শেষ শোনাতে পায় না। কোনো সূত্রেই চলে যায়।···হয়তো তলে তলে কারুর সঙ্গে ভাব করে পালায়, নয়তো বা আচমকা তার কোনো গার্জেন, তা সে মা বাবা দিদি জামাইবাবু এসে উদয় হয়ে দুদিনের নোটিশে তাকে নিয়ে চলে যায়, বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে বলে।·· এরপর আর কে তাকে রাখতে পারবে?

হয়তো সত্যিই সেই অতি চৌকস অতি স্মার্ট আর সব কিছু শিখে ফেলা রীতিমত করিৎকর্মা মেয়েটা মনিব বাড়ির রঙিন টিভি, ফ্রিজ, গ্যাস-স্টোভ, প্রেসার কুকার, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, ওয়াশিং মেশিন, সব কিছুর দক্ষতা আর স্মৃতি বহন করে কোনো গ্রামে গিয়ে পড়ে পুকুর ধারে বসে বাসন মাজতে বাধ্য হয়। আর সেই অসহনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার হতে, তারপর কী হয়, কী হয়ে ওঠে, সে ইতিহাস আলোয় আসে না। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'পরশু বে' বলে নিয়ে যাওয়া মেয়েটাকে ক-দিন পরে দিব্যি পাশের ব্লকের কোনো ফ্ল্যাটের 'বৌদিদির' কিচেনে রান্না করতে দেখা যায়।

এই যে এখন পল্লবী যাকে 'অলকা' বলে ডাক দিল, সেও প্রায় নতুন। অন্তত খুব বেশিদিনের নয়। কাজেই শান্তনুকে সে দেখেনি। যে সাহেবটিকে দেখছে, সেটি তাব দু চক্ষের বিষ। রোজ তার জন্যে রাত দুপুর পর্যন্ত জেগে থাকতে হয়।

হয়তো এসে খায়ও না। তবু থাকতেই হয়। সেটাই পল্লবীর আদেশ বা নির্দেশ।

কিন্তু অলকার আগেব সেই মেয়েটা? যার নাম ছিল সুতপা, সে অনেক নাটক দেখে গেছে।

আর তার ভাবের লোকের কাছে হেসে হেসে গল্প করেছে, 'আমাদেব বাড়ির সাহেবের মতন প্রেমিক হতে পারবি? দেখে যাস তা হলে একদিন। পরিবারের মন জোগাতে একটা বন্ধুকে বাড়িতে পুষে রেখেছে। সেটা আবার 'ঢুকু ঢুকু।' তো আমার মেমসাহেব তাকে ধমকায, আবার এখন ওসব খাচ্ছ?'

আরো কত কী ই বলে। বলে হাসত।

জানিস, একদিন সদ্য দেখলাম মেমসাহেব মানে আর কী 'বৌদিদই বলি দাদাবাবুর গালে ঠাস করে একখানা চড় বসিয়ে দিল! তবু দাদাবাবু ফিরিয়ে মারল না। হেঁটমুণ্ডে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। শুনি না কি ডিভোর্স করবে।'

'কাকে রে?'

'আরে মেমসাহেবই সাহেবকে।'

৫

হ্যাঁ, তেমন একটা ঘটনাই ঘটেছিল শান্তনুব জীবনে।

শান্তনু বলেছিল, 'কেস ঠোকা নিয়ে অত অধীর হচ্ছ কেন পলু? এমনি তো বেশ রয়েছি আমরা। তিন সদস্যর এই সংসারটায় কী এমন অসুবিধে হচ্ছে তোমার? আমি তো আমায় যতটা সম্ভব নির্লিপ্ত করে রেখে দিয়েছি।'

পল্লবী ঠিকরে উঠে বলেছিল, 'তার মানে? তুমি বলতেটা চাও কী? এইরকম একটা গোঁজামিলের জীবন কাটিয়ে চলবো? ক্লিয়ার হতে হবে না? আমায় জানতে হবে না আমার হাতের টাকাটা 'অচল' কী না?'

আর তার উত্তরে বোকা মূর্খ আহাম্মক শান্তনু বলে বসেছিল কিনা, 'তার জন্যে জীবনটার ছন্দ ভেঙে লাভ কী পলু? কী দরকার বাইরের জগতে নিঃস্ব

চেহারা হয়ে যাবার ? আমি তো তোমায় অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছি। যাচাই করতে হাতের কাছে সাজানো দোকানও মজুত রয়েছে। এটা তো খুব একটা অশাস্ত্রীয়ও নয়। মহাভারতের যুগ থেকেই আছে। মানব শ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণদের জন্ম ইতিহাস তো তোমার অজানা নয়।

তা কথাটা শেষ হতে দেয়নি পল্লবী।

'ইতর। ছোটলোক রাস্কেল।' বলে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিয়েছিল শান্তনুর গালে। বলে উঠেছিল, 'বেরিয়ে যাও। এই দণ্ডে বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে। আমি আর তোমার মুখ দেখতে চাই না। ভিজে-বেড়াল, শয়তান ! তলে তলে এই মতলবে তুমি মহান উদারতা দেখিয়ে বন্ধু-বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আসছ ? তোমার অক্ষমতা চাপা পড়ে যাবে কেমন ? ওঃ ! এত মতলববাজ তুমি ? আর তোমার সব বন্ধুগুলোই তোমার ষড়যন্ত্রের সঙ্গী তাহলে। দূর করে দাও ওটাকে। · ডিভোর্স আমি নেবই। আবার বিয়ে করে ছাড়বো। সবাইকে দেখিয়ে দেবো, এতদিন আমি কী ভয়ানক একখানা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পড়েছিলাম।

বলতে বলতে এত বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে প্রায় ফেইন্ট হয়ে পড়েছিল।

তারপর তার উঠে পড়ে লাগা। সে চেষ্টার ফসল ফললোই। শান্তনু সেনের সঙ্গে যুক্ত জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল পল্লবী। কিছুদিন পূর্ব পদবী পিতৃ পরিবারের পদবী রায়। তারপর মজুমদার। তবে খুব তাড়াতাড়ি নয়।

ভাগ্যচক্রে কৌশিক তখন এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে, তার বাবা মারা যাওয়ায়। যে বাপকে জীবনে কখনো শ্রদ্ধা করেনি তার জন্যে উর্ধ্বমুখ হয়ে 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম, পিতাহি-পরমন্তপ' মন্ত্র আওড়াবার জন্যে।···

তা সেই কৌশিক মজুমদার নামের লোকটার জীবনটাই কী স্বাভাবিক সুন্দর ?

সুন্দর না হোক, অন্তত স্বাভাবিকও তো হতে পারতো। লক্ষ লক্ষ লোক সংসারে যেমন তেমন একখানা স্বাভাবিক জীবন তো পায়। দুঃখ-দারিদ্র্যগ্রস্ত যাই হোক। কৌশিকের ভাগ্যে জুটল—একটা অস্বাভাবিক জীবন।

তবু এই এখন কৌশিককে একবার স্বাভাবিক জীবনের ছাঁচে একটুক্ষণের জন্যে ঢুকতে হয়েছিলো। বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে যে কত সব জ্ঞাতি গোত্র এসে হাজির হয়েছিলো। কৌশিককে তাদের নির্দেশের চাপে সৎমায়ের ছেলেমেয়েগুলোর অভিভাবক সাজার দায়িত্ব নিতে হয়েছিলো।

তাদের সঙ্গে হবিষ্যান্ন খেতে হয়েছিলো, আর কুশের আংটি পরে পিতৃকার্য করতে হয়েছিলো।

আর শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও কৌশিকের তখন হঠাৎ হঠাৎ মনে হতো— এই ছাঁচটাই বা মন্দ কী… এখন তো কৌশিক অনেক রোজগার করে। এখনতো ইচ্ছে করলেই ওদের দায়ভারটা সম্পূর্ণভাবে নিতে পারে, ওদের হাল ফেরাতে পারে। দাদা' বলে কী প্রত্যাশার দৃষ্টিতে তাকায় তার সতাতো বোনটা। ভালো নাম জানে না, টিঙ্কু বলে ডাকা হয়, সেটাই জানে।

কৌশিক অবাক হয়ে দেখেছে, ওইটুকু মেয়েটা, বড় জোর উনিশ বয়েস, কী দক্ষ গিন্নী। কাজেকর্মে কী চৌকস। আর ধীর স্থিরও।

বলেছিল মেয়েটা, 'দাদা, এবার তুমি একটা সুন্দর ফ্লাট নিয়ে একটি খুব সুন্দর মেয়ে বিয়ে করে সংসার টংসার করো না।… অবশ্য আলাদাই থাকবে। আমার মা জননীর কাছে বৌকে এনে বসিয়ে দিতে হবে না। যা একখানি মহিলা।…ওঁর সঙ্গে ঘর করা কারো সাধ্য নয় তো বিয়ে কর না বাবু।'

কৌশিক হেসে ফেলে বলেছিল, 'আমি আলাদা একটা সুন্দর ফ্যাটে সুন্দর একটা বৌ নিয়ে সংসার করতে গেলে তোর কী লাভ?'

মেয়েটা গভীর চোখে বলেছিল, 'শুধু কী নিজের লাভই সব? আমাদের মধ্যেকার একজনও একটু ভালো জীবন পেয়েছে, দেখলেও লাভ!'

বলেছিলো, 'আমাদের মধ্যেকার —'

তার মানে সদ্য পরলোকগত কপিল মজুমদারের শোণিত সূত্রে। কৌশিক কী অস্বীকার করতে পারবে সেই সূত্রটুকু?

আহা। কৌশিক যদি ওইটুকু মেনে নিয়ে, ওদের একজন হতে পারতো, হয়তো, কিছুটা স্বাভাবিক জীবন পেতো একটা… ছিটোফোঁটা দাক্ষিণ্য দেখিয়ে ওদের মাথা কিনে রাখতে পারতো, হয়তো বা সেই দাক্ষিণ্যের বহরটা বাড়িয়ে বাড়িয়ে ওদের চোখে মহান হয়ে উঠতো।

অতি সাধারণ ঘরের ছেলে তো কৌশিক ওদের সঙ্গে মিলে মিশে যাওয়া কী অসম্ভব ছিল?

এই তো কিছুদিন আগেও তো কৌশিক ওদের মধ্যেই ছিল।

কিন্তু কৌশিকের ভাগ্যদেবতা, তাকে সাধারণ স্বাভাবিক হতে না দিলে?

কৌশিক তাই একটা অদ্ভুত অস্বাভাবিক জীবনের আবর্তের মধ্যে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। কৌশিক তাই ক্রমশ যত বেশি উপার্জন করছে, তত বেশি মদ খাচ্ছে। তত বেশি বেহেড হচ্ছে। আর একটা প্রায় আধাপাগল মহিলার ইচ্ছের দাস হয়ে একটা পোষা প্রাণীর জীবনে পড়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে।

৬

তাহলে ?

পল্লবী নামের ওই অতি আবেগপ্রবণ অতি মাত্রায় জেদি লোকচক্ষে প্রায় আধপাগল মেয়েটাই যা বলে তাই ঠিক ? মেয়েটাতো অহরহ এই আপাত নিরীহ ভদ্র মার্জিত শান্তনু সেনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বলেছে, 'এই তুমি। তুমিই হচ্ছ যত নষ্টের মূল ! মতলববাজ ধান্দাবাজ বেহায়া লক্ষ্মীছাড়া ইতর।'

কৌশিকের জীবনটাকেও এমন একটা বিদঘুটে চেহারার করে তোলার মূলে কে ? শান্তনুই নয় কী ?

বেহায়া লোকটা কী কৌশিকের সদ্য পিতৃবিয়োগের সময় খুঁজে খুঁজে ওর সেই চালতাবাগান লেনের বাড়িতে গিয়ে একান্তে ডেকে বলেনি, 'ভাই, তোর নিয়ম টিয়মগুলো সব মিটেছে তো ? এবার আমায় বাঁচা।'

বাপ মরতে ন্যাড়া অবশ্য হয়নি কৌশিক, বড় বড় রুক্ষ চুলগুলোকে মুঠোয় চেপে ধরে বলেছিল, 'আবার নতুন কী হলো ?'

'ও আমার মুখ দেখবে না বলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন একা-সেই কাজের মেয়েটাকে ভরসা করে রয়েছে। তাও মেয়েটা তো প্রায় কাটা ঘুড়ির মতো। পাশের ফ্ল্যাটের ড্রাইভারটার সঙ্গে যা মেলামেশা দেখছি লাটাইয়ে আর আটকে থাকবে বলে মনে হয় না। এই দিন কাল, আর একটা পলুর মতো মেয়ে। তুই যেমন ছিলি তেমনি গিয়ে থাক গে ভাই। দোহাই তোর।'

আকাশ থেকে পড়েছিল কৌশিক। পড়বারই কথা। 'তুই আর ওখানে নেই।'

'উপায় কী ? ঢুকতে দেবেই না। ডিভোর্স নেবার জন্যে তো উঠে পড়ে লেগেছে। বলে এখন একই বাড়িতে থাকা চলবে না।'

'তা হলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে ? তোমার অনুপস্থিতিতে, শূন্যগৃহে তোমার সুন্দরী যুবতী গৃহিণীটিকে পাহারা দিতে আমায় গিয়ে সেখানে থাকতে হবে ?·· তার মানে, বেড়ালকে মাছ পাহারা দিতে বসিয়ে রাখা ! কেমন ? এরকম অ্যাবসার্ড কথা কেবলমাত্র তোমার মাথা থেকেই বেরোতে পারে। তা নইলে নিজের আখের খুইয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে, অভিজাত পাড়ায় দামী একখানা ফ্ল্যাট কিনে, সেটাকে ওই আহ্লাদী বৌয়ের চরণে উৎসর্গ করিস ! অতএব ও তোকে বাড়ি থেকে দূর করে দিতেই পারে।'

'আরে বাবা তার কারণ টারণ তো তুই সব জানিস।…গরীব একটা মাস্টার দুখানা মানে ব' লিখে বাজারে ধরিয়ে দিতে পেরে, আর দুএকটা ট্যুইশানির দৌলতে করে খাচ্ছি। মা মারা যাবার পর বারাসতের যা কিছু জমি জমা বেচে টেচে এখন ফ্ল্যাটের দরুন যা বাকি ছিল, সব মিটিয়ে নিঝঞ্ঝাট হয়েছি এই মাত্র। ভেবেছিলাম এরপর আস্তে আস্তে একটা গাড়ি মানে একখানা গাড়ির ওর ভারি শখ। তো যা দাঁড়িয়েছে আমায় একমিনিট সহ্য করতে পারছে না। কী করব বল? ওর পথ থেকে সরে আসা ছাড়া উপায়? এখন একমাত্র তোর হাতেই ওকে দিয়ে রেখে নিশ্চিন্ত হতে পারি।'

'কে যদি ধান্দাবাজ' না বলতে হয় তো, কাকে বলা হবে?

কৌশিক কী সেই 'টোপ' গিলেই চলে এসেছিল? · পল্লবীও কী বলেনি,…

'তার মানে আপনিও আমাকে ত্যাগ করলেন? বন্ধুর জন্যেই ছিলেন। অথচ আমি ভেবেছি আমারই জন্যে। আসলে আমাকে সত্যিকার ভালো কেউ বাসেনি।'

কৌশিক বলেছিল, 'সত্যিকার ভালোবাসে আপনাকে ওই আহাম্মুকটাই।'

'খবরদার! ওর নাম আমার সামনে করবেন না। ঠগ জোচ্চোর! ইতর, ছোটলোক। ঠিক আছে। আমার কাউকেই দরকার নেই। আমার মতো একটা সুন্দরী মেয়ে, একখানা দামী ফ্ল্যাটের মালিক, তার কী আর একটা পাত্র জুটবে না? ডিভোর্সি হলেও! একবার মুক্তি পেতে দিন, দেখিয়ে দেবো। পাত্র চাই বিজ্ঞাপন দেবো।'

৭

অবশেষে সেই মুক্তি এলো।

শান্তনু হতাশ গলায় বলেছিল কৌশিককে, 'ভয়টা তো সেইখানেই কৌশিক ও তো একটা পাগল, লোক চেনবার ক্ষমতা নেই। কে যে কোথা থেকে এসে ওকে গ্রাস করে বসবে সম্পত্তি আর রূপের লোভে, তাই ভাবনা।'

'তা তোমার আর কী করার আছে? পরাজিত সৈনিক।'

'করার নেই' বলে শান্তি পাওয়া যায়? আমি বলি কী, বিয়ে ও করবেই। না করে ছাড়বে না। ওর পাগলামির প্রধান ইস্যুই হচ্ছে তো নিজেকে যাচাই করতে যাওয়া। কিন্তু তুই তো ওর কেস হিস্ট্রি সবই জানিস, তুই যদি বিয়ে করিস, তাহলে সব ম্যানেজ হয়। অবশ্য—'

'কী অবশ্য বল। থেমে গেলি কেন? মুখে তো কিছুই আটকাচ্ছে না। হঠাৎ আবার ঘোমটা টানা কেন?'

বলছি, তুমি যদি অবশ্য কোনো কচি কচি কণ্ঠের 'বাপী' ডাক না শুনতে পেলে জীবন মহানিশা মনে করো, তাহলে আর আমার বলবার কিছু নেই। ও তোকে ভালোবাসে. তুইও ওকে ভালোবাসিস। প্রথম প্রথম আশাভঙ্গ হয়েও তন্দণ্ডে মরিয়া হয়ে উঠবে না। হয়তো কিছুদিন ধৈর্য ধরতে পারবে।'

'তারপর? কিছুদিন পরে?'

'দ্যাখ এমনও তো হতে পারে ততদিনে সেটাকে ভাগ্য বলে মেনে নিতে শিখবে।'

'আর মেনে নিতে না পারলে হয় গলায় দড়ি দেবে, নয় ঘুমের বড়ি খাবে। কেমন?'

শান্তনু শিউরে উঠেছিল।

সেই তো! সেই ভয়েই তো কাঁটা হয়ে থাকি ভাই। ওর যা প্রকৃতি। শেষ অবধি সেটাই না ওর নিয়তি হয়।'

'শান্তনু, শাস্ত্রে একটা কথা আছে জানিস তো? নিয়তি কেন বাধাতে?'

'জানি। তবু মানতে পারিনা। পলুর ওই নিয়তি মানতে পারি না, ভাবতে পারিনা। তো এ যাত্রায় তুই ওকে বাঁচা কৌশিক তার সঙ্গে আমাকেও।'

এই ছিল পটভূমিকা।

তো এই লোককে পল্লবী যা যা বিশেষণ দেয় তা খাটে কিনা?

৮

কিন্তু এ তো নাটকের বিষয়বস্তুটি বলা হলো। শান্তনু নামের লোকটা কী মাত্র তার একটা ঘুম না হওয়া রাত্রিতে এত সব দেখে চলেছিল? এত সব দেখাও তো সম্ভব নয়। সব কিছুই তো তার চোখের সামনে ঘটেনি। যা তার অদেখা, তা কী করে দেখতে পাবে? এটা কী দেখেছে শান্তনু সেই যে একদিন কৌশিক, তার সতাতো বোন টিঙ্কুকে গিয়ে বলেছিল, 'এই' শুনে আহ্লাদে ভাসবি। ছবির মতো একটা ফ্ল্যাট জোগাড় হয়ে গেছে, আর পরমাসুন্দরী এক কনেও জুটেছে—'

'সত্যি? কোথায় দাদা? কোথায়? কবে বিয়ে? কাদের মেয়ে?'

কৌশিক বলেছিল, কাদের মেয়ে ? তা ঠিক জানিনা। সেটা কবে তামাদি হয়ে গেছে। আপাতত একজনের বৌ ছিল, তো—'

'একজনের বৌ ছিল ? যাঃ। এমন বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি ঠাট্টা করো তুমি দাদা।'

'ঠাট্টা নয় রে, সত্যি ! একখানা ডিভোর্সি মেয়ে আমার গলায় মালা ঝুলিয়ে দিচ্ছে। বা বলতে পারিস আমার গলা ধরে ঝুলে পড়ছে।'

শুনে কী মলিনই হয়ে গিয়েছিল টিঙ্কু নামের এমনিতেই ময়লা রঙের মেয়েটা।

এসব দেখেনি শান্তনু। তাই তার চোখের সামনে যে শত শত রিলের ছবি। এই যে রাতদুপুরে বেহেড হয়ে আসা সাহেবটি, উনি না কী গিন্নীর দ্বিতীয় পক্ষের 'হাজব্যান্ড।'

তা এটা এদের কাছে আশ্চর্যের কিছু নয়। এদের তো অভিজাত ঘরেই ঘোরাফেরা বেশি, কারণ নেহাৎ মধ্যবিত্ত গেরস্থালী সংসার এদের চাহিদা অনুযায়ী পুষে উঠতে পারে না।

সে যাক্, চতুর অলকা ভেবে নিলে, আজকের এই সাহেবটার সঙ্গে মেমসাহেবের 'সামথিং' আছে মনে হলো। প্রথম পক্ষটি নয় তো ? মেমসাহেবের চোখেমুখে কীরকম যেন একটা দুঃখু দুঃখু, আবার উত্তেজিত উত্তেজিত ভাব। এখন আবার চলে যাওয়ার পর না খেয়ে বিছানায় পড়ে কাঁদতে লেগেছে। অবশ্য কাঁদে না এরা। কারণ ভাঙে তো মচকায় না। কাঁদে না, হাপসায়।

হ্যাঁ, সেটাই করছিল এখন পল্লবী।

জানতাম, আমি জানতাম ও এখানে খাবে না। অথচ আমি হ্যাবলার মতো, ওর সেই হাতচ্ছাড়া বাসায় চা খেয়ে এলাম। ওই উন্নাসিকটা জিতে গেল আমি হেরে গেলাম।

ওই হারজিতের প্রশ্নেই এত যন্ত্রণা পল্লবীর।

পল্লবীর একথা একবারও মনে আসছে না—শান্তনু আসার পরই পল্লবী কেন, যত্ন করে তার খাবার গুছিয়ে, খেতে বসতে বলেনি। একটু পরেই যে ওকে চলে যেতে হবে, তা তো জানতো পল্লবী।

না, পল্লবী তখন সে খেয়াল করেনি।

পল্লবী তখন কথা নিয়ে কথা কাটাকাটি করেছে শান্তনুর সঙ্গে। তার বক্তব্যের বিষয় তখন শান্তনু কেন, অমন একটা হতবিচ্ছিরি জায়গায় পড়ে আছে। শান্তনু কেন আবার বিয়ে করে একটা নতুন জীবন পাবার চেষ্টা করছে না। তাহলে বুঝতে হবে কারণ হচ্ছে সে-ই। সেই হাটে হাঁড়ি ভেঙে যাবার ভয়। আর শেষ পর্যন্ত বলেছে, 'সাধে বলি একটা অপদার্থ'। কেন, আমায় দেখিয়ে দাও না একবার, তুমি ঠিকঠাক একটা শক্তিমান পুরুষ। তাতে তো তোমারই গৌরব।'

ব্যঙ্গে তিক্ত, তীক্ষ্ণ, তীব্র এইরকম কিছু কথাই বলেছে পল্লবী। খাবার কথা বলেনি। বলেনি, 'কই এসো. তোমার আজকের ইডলি-ধোসার খরচটা বাঁচাও।'

বলেনি। বলতে মনে পড়েনি।

তারপর যেই হর্নটা শুনেই শান্তনু বলে উঠলো, 'ওই এসে গেছেন। আমি তাহলে চলি—'

তখন ঠিকরে উঠে বলেছে, 'সে কী? যাবে মানে? অলকা তোমার খাবার গুছিয়ে টেবিলে দিয়েছে যে—'

আর তারপরও—

বলে উঠতে পেরেছে কি একবারও, 'কই কেমন না খেয়ে চলে যেতে পারো দেখি। যাও তো দেখি।'

না, এমন জোর করতে পারে না পল্লবী। জানেই না। পল্লবী শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবতে জানে।

সেই যখন শান্তনুর মা তাঁর শ্বশুরের ভিটে, বারাসতে যেতে মনস্থ করে বলেছিলেন, 'আমায় বারাসতে রেখে আয় বাবা—'

তারপর পল্লবী রেগে রেগে বলেছিল,—'বললেন, আর তুমি রেখে এলে! একবার বারণ করলে না। ভাব দেখে মনে হলো যেন, 'যাবো বলায় বাঁচলে তুমি?'

শান্তনু বলেছিল, 'তা তুমি তো বারণ করতে পারতে। বাড়ি তো তোমারই।'

'আমি', মুখচোখ লাল হয়ে গিয়েছিল পল্লবীর, 'আমি বলবার কে? বললেই আমার কথা থাকতো?'

'বলার মতো বলতে পারলে হয়তো থাকে।'

'কিন্তু সত্যিই কী সব ক্ষেত্রে তাই?'

শান্তনু কী পল্লবীকে বলার মতো বলতে চেষ্টা করেনি, 'পলু দস্তক'···

ছবিটা প্রদর্শিত হয়ে যাচ্ছিল, তার মধ্যে এসব ছিল না।

কাজেই এক সময় আবছা আবছা ছবিগুলো ছাড়া ছাড়া হয়ে গেল। হারিয়ে গেল।

শান্তনু হঠাৎ একটা গাড়ির হর্ন শুনতে পেলো। পরিচিত গাড়ির।

শান্তনু সেই বেড়ে ওঠা মানিপ্ল্যান্টের লতার কাছে সরে এল। বলে উঠলো, 'ওই রে, মেসোমশাইয়ের গাড়িটা এসে গেলো। হর্ন দিচ্ছেন। চলি—'

পল্লবী রুদ্ধকন্ঠে বলে উঠলো, সে কী? তোমার যে আজ ইডলি-ধোসার খরচ বাঁচাবার কথা ছিলো। অলকা তোমার খাবার গোছাচ্ছে, টেবিল রেডি

শান্তনু একটু হেসে বলেছিল, 'অলকা গোছাচ্ছে, তুমি তো নও!'

'আমি? আমি আবার কবে এসব করি?'

'ঠিক ঠিক। আমায় এখন 'রেডি স্টেডি, গো'—বলতে হচ্ছে। অনেকদিন পরে এখানে এসে খুব ভালো লাগলো। দৈব মাঝে মাঝে মানুষের সহায় হয়।'

পল্লবী রুদ্ধমুখে বলেছিলো 'থামো। মেসোমশাই একবার হর্ন দিলেন বলেই—উঃ। অথচ তোমার মতই অপদার্থ তোমার ওই বন্ধুটি। মদের বোতলের পেছনে যা পয়সা ওড়ায় তা রাখলে এতদিনে একখানা গাড়ি হতে পারতো। সেটা হলে কী আজ আমায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি ডাকতে হতো। আর ছোটলোক ট্যাক্সি ড্রাইভারটার ধমক খেতে হতো? আর পরের দয়ায়—'

হঠাৎ গলার স্বর ভেঙে গিয়েছিলো পল্লবীর।

আবার হর্নটা শুনতে পেলো শান্তনু। কম্বল চাপা মুখটাকে বার করে চোখ খুললো।

সকাল হয়ে গেছে।

রতনলাল গাড়ি বার করে কর্তাকে জানান দিচ্ছে।

৯

'জানতাম। আমি জানতাম, ও এখানে খাবে না। না খেয়ে সাজানো খাবার ফেলে রেখে চলে যাবে। গাড়ির হর্ন বাজালো। পাতানো মেসোমশায়ের গাড়ির। ছুটে চলে গেল যেন অফিসের বসের ব্যাপার। কেন? এত কী? মাসিমা একটু দেখভাল করেন তাই তাঁর পতিদেবতাটিকেও সমীহ করতে হবে। আর কিছু না, সেই চিরদিনের স্লেভ মেন্টালিটি।'

শান্তনু চলে যাবার পর আপনমনে হাপসাতে থাকে পল্লবী, বিছানায় আছড়ে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

অলকা এসে আস্তে বলে, 'দিদি, টেবিলে দুজনের খাবার দিলাম, উনি যে চলে গেলেন।'

উত্তর পেল না।

একটু অপেক্ষা করে আবারও তেমনি ভয়ে ভয়ে আস্তে বলে অলকা, 'সাহেবও তো এখনো ফেরেননি, খাবার কী আবার ফ্রিজে রাখব?'

এ বাড়ির কাজের মেয়েদের এই এক জ্বালা। একদিকে যেমন অগাধ স্বাধীনতা, অবাধ কর্মসুখ, তেমনি আবার বাড়ির গিন্নীর তীব্র মেজাজের দাপট।

কখনো কোনো কারণে পল্লবীর জন্যে সাজানো খাবার পল্লবী না খেলে, হয়তো খিদে না থাকায়, হয়তো বাইরে খেয়ে আসায়, এমনও হয়, পল্লবী হেসে গড়িয়ে বলে, 'আবার কষ্ট করে ফ্রিজে তুলতে যাবি কেন বাবা ? বরং দয়া করে মুখেই তুলে ফেল।'

কিন্তু আজ ?

আজ কড়া গলায় বলে ওঠে, 'ডাস্টবিনে ফেলে দাও গে !'

অলকা বুঝে ফেললো, ব্যাপার গোলমেলে। কাজে লেগেই জেনেছিল, দত্তক নেওয়া তো পৃথিবীর সর্বত্র চিরকালই আছে। নাও না একটা সুন্দর দেখে খোকা অথবা খুকিকে। দেখো তাতেই তোমার মন ভরে যাবে।

রাজী হয়েছিল কী পল্লবী ?

ও ও রকম নকল আর ভিক্ষার ধনে বিশ্বাসী নয়।

ও চায় আসল। ন্যায্য পথে আসা। ওর মতে 'দত্তক' নামে তো জগতের সামনে দৈন্য প্রকাশ হয়ে যাওয়া। ওর মাথার মধ্যে ওই যে কী একটা ঢুকে বসে আছে। আর সকলের সঙ্গে তুলনা করতে চেষ্টা করে না।

তবে আর কে কী করতে পারে ?

অথচ অন্যের ত্রুটি সম্পর্কে ভারী সজাগ পল্লবী। তাই বিছানায় আছড়ে পড়ে থাকা পল্লবী ভেবে চলে, নিষ্ঠুর। চিরকাল নিষ্ঠুর। কখনো আমার মনের দিকে তাকায় না।

এই যে আমি একটা অদ্ভুত অবস্থায় পড়ে ওর সেই নির্জন নিরালা ঘরটায় গিয়ে ওর বিছানায় শুয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিলাম, ওর কী একবারও ইচ্ছে করলো আমায় একটু আদর করে। অন্তত আমার গালে একটু হাত বোলায়। আমার কপালে একটু ঠোঁট ঠেকায়।···তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো ? আমি সত্যি সত্যিই পরস্ত্রী।

পরস্ত্রী। ও। ভারি একেবারে মহাপুরুষ !

তেমন আবেগ ভালোবাসা থাকলে, সত্যিকারের একটা পরস্ত্রীকে অমন হাতের নাগালে পেলে, মহাপুরুষেই লোভ সামলাতে পারে ? ওই কাপুরুষটা সেদিক দিয়ে গেলনা। আমার দিকে তাকিয়ে বসে থাকলো। ওর মধ্যে সে পৌরুষ থাকলে, পারতো ওই ভাবে চুপ করে বসে থাকতে ? আমার ওপর ঝাঁপিয়ে না পড়তে ?

আর তারপর ?

কী অনায়াসে একটা আষাঢ়ে গপ্প ফেঁদে বসলো, ওর সেই 'মাসিমার' কাছে। আমি ওর মামাতো বোন। আমাকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে এসেছে একটু লিফট দেবে বলে। আর আমি ওর ঘর দেখব বলে ঝুলে পড়ে এসে জ্বর বাধিয়ে শুয়ে পড়েছি।

যে এইভাবে ডাহা মিথ্যে গপ্প বানাতে পারে সে কী না পারে। অথচ আমি ? ওই বানানো গপ্পের কারবার জানিনা বলে, সারাজীবন নিন্দে কুড়োলাম।

এই যে এখন কৌশিকের সঙ্গে রেজিস্ট্রি করে ফেললাম, আমি তো ভেবে দেখেছি এটা বৈধ। এটা বিয়েই। তা হলে ওর আত্মীয়স্বজন আমারও আত্মীয় হলো না ? তো একদিনের জন্যে আমায় নিয়ে গেল সেখানে ? তাদের সঙ্গে পরিচয় করালো ? বললেই বলে, 'সে তোমায় নিয়ে গিয়ে দেখাবার যোগ্য নয়। কেন ? আমি কী কখনো গরীবের সংসার টংসার দেখিনি ? আমি আকাশ থেকে পড়েছি। আমার নিজেরই এক পিসি ছিল না, রাম গরীব। বিয়ে বাড়িটাড়ি যাবার মতো একটাও ভালো শাড়ি ছিল না বলে যেতোই না। তা হলে ? তোমার সেই চালতাবাগান লেনে না কোথায় যেন একবার গেলেই আমি ফেন্ট হয়ে যাব ? না এ আর অন্য কিছু নয়, একটা ডিভোর্সি মেয়েকে বৌ বলে নিয়ে গিয়ে দেখাতে লজ্জা। ঠিক বুঝতে পারি।

তার মানে আমি, 'না ঘরকা, না ঘাটকা'।

শান্তনু ! শান্তনু ! তুমি আমায় অত অবহেলা করতে পারলে ? তুমি আমায় হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও, মুঠো খুলে ফেলে দিলে !

ভয়ানক একটা যন্ত্রণায় পল্লবী আর শুয়ে থাকতেও পারে না। উঠে পড়ে

আর আশ্চর্য ! দেখে আজই কৌশিক অন্য দিনের থেকে আগে এসে গেছে। অন্য দিনের থেকে কম বেহেড।

তাহলে পল্লবী গিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না ?

আসলে পল্লবীর কারো সঙ্গে দারুণ একটা সংঘর্ষ করতে ইচ্ছে করছিল। তার সুযোগ পেয়ে যেন বেঁচে গেল।

এখনকার ইস্যু, কেন কৌশিক একখানা গাড়ি করছে না। যত পয়সা নেশায় ওড়ায় সেগুলো রাখলে যেতো না কেনা ? একটা গাড়ি থাকলে পল্লবীর আজ এত হেনস্থা হতো ?

১০

কৌশিক যে খুঁজে খুঁজে শান্তনুর প্রায় অজ্ঞাতবাসের মতো সেই আস্তানাটা খুঁজে বার করে দেখা করতে আসবে, এমন কথা ভাবেনি শান্তনু।

অবাক হয়ে বলল, 'হঠাৎ তুই ?' আর তারপরই ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'কী ব্যাপার ? পলু ভালো আছে তো ?'

কৌশিক বলে ওঠে, 'তোর পলুর সৃষ্টিকর্তার অগাধ দাক্ষিণ্যের ফল পলুর হেলথ। আশ্চর্য রকমের ভালো। শুধু ওই মাথাটা। যে কোন মুহূর্তে হঠাৎ তার সেই ঐতিহাসিক মাথাধরাটি এসে ওকে ধরেন। আর অতঃপর দুরছাই তোকে আবার ওর বিষয় কী বোঝাতে বসছি। মায়ের কাছে মামার বাড়ির গল্প। তবে সাবাস দিই ভাই, প্রায় দশ দশটা বছর তুই ওকে নিয়ে ঘর করেছিস। আমি তো এই দেড় বছরেই—'

শান্তনু ঈষৎ বিষণ্ন হাসি হেসে বলে, গোড়ার দিকে কী এরকম ছিল? অত্যন্ত লাভলি অত্যন্ত জলি চমৎকার একটা মেয়ে।'

'জলি! বলিস কি?'

'সত্যিই রে কৌশিক। তবে ভয়ানক অভিমানী ছিল বরাবরই। তার সেই দুর্জয় অভিমানকে জয় করতে রীতিমত কাহিল হয়ে যেতে হতো। তবে—'

শান্তনু একটু থেমে বলে, 'তবে তখন তো আমার মাঠের মধ্যে একা তাল-গাছের মতো অবস্থা নয় যে. সমস্ত ঝড় ঝঞ্ঝা তার ওপর দিয়েই যাবে। বাড়িতে তখন মা, দিদি. জাঁদরেল বড়পিসিমা।'

কৌশিক অবাক হয়ে বলে, 'এত সব ছিল তোর?'

'থাকতে পারে না? কেন? আমি কী ভুঁইফোঁড়?'

কৌশিক আস্তে বলে, 'মা, দিদি, পিসি। সত্যি! পুরুষের জীবনে পরম পৃষ্ঠবল। সেই কারণেই বোধহয় এখনকার বৌগুলো পতিগৃহে এসেই ওই আপদ বালাই শত্রুদের বিদায় করবার তালে থাকে। কিন্তু এখন তো বাবা তোমার আর ওসব কিছু ছিল না?'

শান্তনু আস্তে মাথা নাড়ে।

'ছিল না। তবে ততদিনে ওর মনের মধ্যে দারুণ ওই কমপ্লেক্সটা ঢুকে বসে গেছে। সত্যি বলতে দিদিই ওর কারণ। দিদিই না কী তার শ্বশুরবাড়ির একটা বিয়েতে নেমন্তন্ন যাওয়া পলুকে আড়ালে ডেকে বলেছিল, বিয়ের বরণডালা কড়ি খেলা কী সব না কীতে যেন হাত দেয়না। কে কী মনে করবে। বাঁজা মেয়েদের না কী ওতে অধিকার নেই।'

তো সেই যে রেগে কেঁদে মাথা ধরেছে বলে না খেয়ে বাড়ি ফিরে এলো, তদবধি ওই মাথাধরা। পরের ইতিহাস তো সবই জানিয়েছি ভাই তোকে। ক্রমেই ডেঞ্জারাস হয়ে উঠেছে।

'বলেছ ভাই। তবে সেই জিনিসটি আমার স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে হাত পা ঝেড়ে নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছ।'

শান্তনু অবশ্য বন্ধুর কথাবার্তার ধরন জানে। এই ওর বাকবিন্যাস পদ্ধতি। তবু যেন একটু আহত হয়। বলে. পলু সম্বন্ধে এভাবে চিন্তা আমি

ভাবতেই পারি না কৌশিক। ও যদি অত খেপচুরিয়াস হয়ে উঠে পড়ে না লাগতো, আমি কী '

একটু থেমে বলে, 'তবে ভাবিনি তোর পক্ষে এটা এত ভারি হবে। জানতাম, তুই ওকে ভালোবাসিস, ও-ও তোকে—'

কথার মাঝখানেই বলে ওঠে কৌশিক, আমি ওকে ভালোবাসিনা কী, এক্ষেত্রে ভালোবাসা শব্দটার মানেই ঠিক বুঝে উঠতে পেরেছি কি না জানি না। তবে এটা সিওর, ও আমায় ভালোটালো বাসে না। ওর সমস্ত ভালোবাসা তোর ওপরই।'

'এই তোর ধারণা ?'

'এই আমার ধারণা'। তবু ওর মাথায় একটা জেদ চেপে বসে ওকে একটা বিকৃত মানসিকতার শিকার করে তুলেছিল। ওর প্রত্যাশা ছিল চটপটে তোকে দেখিয়ে দেবে ওর বিজয়িনী মূর্তিটি। কিন্তু সে আশায় তো ছাই পড়ছে।'

শান্তনু বলে ওঠে, 'এখুনি একথা কেন ? সবে তো—'

'দেড়বছর সময়টা বড় কম নয় শান্তনু। সে যাক। আমার মনে হয়, তুই আগাগোড়াই একটা ভ্রান্ত বুদ্ধি নিয়ে চলে এসেছিস। প্রথম জীবনেই তোর উচিত ছিল, 'সত্যকে ওর কাছে প্রকাশ করা।'

শান্তনু একটু ক্ষীণ হাসি হাসে, 'করতে চেষ্টা করিনি তা ভাবিসনা। বিশ্বাস করেনি। ভেবেছে ওটা ধাপ্পা, ষড়যন্ত্র। আসলে আমারই—তবে হ্যাঁ, তেমন মোক্ষম ভাবে ধরিয়ে দিলে হয়তো—'

শান্তনু টেবিলের কাছে সরে এসে একগ্লাস জল খেয়ে বলে, 'হয়তো সুইসাইড করতো। সারা জীবন সেই ভয়েই কাঁটা হয়ে আছি ভাই। যখন মা পিসির সঙ্গে মতান্তর মনান্তরে মান অভিমান করেছে, কাঁটা হয়ে থেকেছি। আজ পর্যন্ত এখনো তাই। এই যে তুই হঠাৎ এলি, আমার বুকটা কেঁপে উঠল, পলু কিছু করে বসে নি তো ?'

তার মানে বিয়ে হয়ে পর্যন্ত তুই সার্কাস পার্টির ওস্তাদ খেলোয়াড়ের জীবনে আছিস। একখানা ধারালো তলোয়ারের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছিস।'

'হয়তো তাই। হয়তো একেই বলে সেই চিরকেলে কথা—নিয়তি। তবে নিজের স্বার্থে তোকেও অর সঙ্গে জড়িয়ে—'

কৌশিক বোধকরি এই ভারাক্রান্ত বাতাসটা হালকা করে ফেলতেই হঠাৎ জোর গলায় হেসে উঠে বলে, 'তাহলে হয়তো সেটাও আমার নিয়তি। দ্যাখ, এখন সেই নিয়তির খেসারত দিতে প্রমিস করতে হয়েছে, ওকে ওর নতুন—শ্বশুর-বাড়িতে আত্মীয়জনেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। বোঝ ? এখন আমাকে আমার সেই চালতাবাগান লেনের বাড়িতে শুভসংবাদটি দিতে যেতে হচ্ছে কাল সকালে মহারানী আসছেন তোমাদের কুটিরে। রাতারাতি গুছিয়ে

প্রস্তুত হতে পারো তা হয়ে নাও। আর তারপর মহারানীর নাসিকাকুঞ্চন নীরবে হজম করে কৃতার্থমনা ভাব দেখাবে।'

'ও ইচ্ছে করে যেতে চেয়েছে?'

'শুধু চেয়েছে! উৎপাত করে মারছে আমায়। ভেতরে দারুণ সন্দেহ আমি নাকি এই বিয়েটাকে বৈধ ভাবি না, তাই বাড়ির লোককে তাকে দেখাতে চাইনা।'

'বৈধ ভাবিস না? বলছিস কী? তোদের ম্যারেজ রেজিস্ট্রির সার্টিফিকেট-খানা আগুনে ফেলে দিয়েছিস না কী?'

'আমি কী আর ফেলতে গেছিরে ভাই, তাঁর মনের আগুনে তুষের আগুন হয়ে তাকে নস্যাৎ করে ফেলেছে। বলে কিনা একটা ডিভোর্সি মেয়েকে তারা অ্যাকসেপ্ট করবে না।'

'অ্যাকসেপ্ট কেন? তারা কী মধ্যযুগীয়?'

'সেকথা কে বোঝাবে? ও তাই নিজে সরেজমিনে তদন্ত করতে যাবে। অর্থাৎ না গিয়ে ছাড়বে না।'

'তবে যাবে যে, কে আছে সেখানে? তোর সেই সৎমাটি আর তাঁর শাবকগণ, এই তো?'

'আমার তো তাই জানা। তবে খবর দিয়ে যাওয়া কিছু পাড়ার লোক জড়ো করবে কিনা কে জানে।'

'এখনি বারণ করে রাখ। যাচ্ছিস তো জানাতে।'

'হুঁ। চিন্তার সমুদ্রে ভাসছি। তবে আমার সেই বোনটা বুদ্ধিমান আছে। তার কাছেই গিয়ে পড়ি শরণাগত হিসেবে—'

'দেখিস বাবা—'

শান্তনু চিন্তিত ভাবে বলে, 'ও যেন কোনোভাবে আহত না হয়।'

'সে গ্যারাণ্টি স্বয়ং ভগবানই দিতে পারবে কিনা সন্দেহ। সবই লাকের ওপর ছেড়ে দিয়ে রেখেছি।'

'তবে আর কী। জয় মা কালী, পাঁঠা বলি ঝুলে পড় গে যা।'

১১

কৌশিক যখন সেখানে গিয়ে পড়ল, তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। দরজা খুলে দিল টিঙ্কু।

কৌশিক আজ সাদা চোখে।

আজ ছুটির দিন। অফিস যায়নি অতএব ফেরত পথে ক্লাবেও নয়। আসলে আজ দুঃসাহস করতে সাহস পায়নি। তাছাড়া—সারা দুপুর তো পল্লবী অনবরত প্রশ্নে পল্লবিত হয়েছে।

'এই কৌশিক, এই প্রথম যাচ্ছি বলে নতুন কনে টনে সাজতে হবে না কী?'

'আরে ধ্যেৎ।'

'বল বাপু। তাঁদের মনোরঞ্জন করবার কী আছে? বিয়ে একটা করে ফেলেছি, বাড়িতে বৌ দেখানো হয়নি, তাই নিয়ে যাচ্ছি, ব্যস।'

'ঠিক আছে।'

'এই! যাবার সময় খুব বেশি করে মিষ্টি-টিষ্টি নিয়ে যাওয়া উচিত কী বলো?'

'তুমি যদি বলো উচিত, তো তাই হবে।'

'আঃ। ঠিক বন্ধুটির মতো গা ঝাড়া দিয়ে কথা। আমি যদি বলি তবে? কেন, তোমার নিজের একটা বোধবুদ্ধি নেই?'

'এখন অবশ্য মনে হচ্ছে নিষে যাওয়াই উচিত।'

এ কথাটা ডাহা মিথ্যে।

অনেকক্ষণ থেকেই ভেবে চলেছে কথাটা। জানে তো সাধারণত সকলেরই মিষ্টিতেই তুষ্টি। বিশেষ করে তার সৎমাটি। কিন্তু সিদ্ধান্তটি ঠিক নিতে পারছিল না। দেখে পল্লবী যদি বলে, 'ও ঘুষ! ঘুষের কারবার না চালালে কেউ তোমার বৌকে নেক নজরে দেখবে না?'

পল্লবী যে কোন কথায় কী অন্য অর্থ আবিষ্কার করে বসে।

অথচ সারা দুপুর কী ছেলেমানুষীটাই করেছে।

'দ্যাখো, এই একখানা ধাড়ি বৌ নিয়ে গেলে, আবার পাড়াপড়শী কী বলে!'

'ধাড়ি। বয়েসটা কত?'

'পুরো বত্রিশ।'

'কী যে বলো। দেখে কেউ বাইশের বেশি বলবে না।'

'আহা।'

ঠিক নবোঢ়ার ভঙ্গিতে ওই 'আহা' টি বলল পল্লবী।

দেখে একটু দুঃখ হলো কৌশিকের।

হঠাৎ হঠাৎ কী যে এক ভূতচাপে ওর ঘাড়ে।

তবু শান্তনুর কাছে গিয়ে বলে, 'কী একখানি 'মাল' 'আমার স্কন্ধে চাপালে ভাই!' এবং শেষ পর্যন্ত চালতাবাগান লেনে গিয়ে হাজির হলো আগামীকাল সকালে বৌ নিয়ে দেখাতে আসবে বলতে। না এনে তো উপায় নেই। এড়াতে চাইলে আগুন হয়ে যাবে!

যা থাকে কপালে।

শান্তনু বলেছে, 'তাহলে ঝুলেই পড় 'জয় মা কালী পাঁঠা বলি' বলে!'

বুকটা একটু জোরালো করে এলো এখানে। এলো মাসের দেয় টাকা মাস পড়বার কদিন আগেই হাতে নিয়ে। বলবে, 'এলাম, তাই নিয়ে এলাম!'

হ্যাঁ, এ নিয়মটা এখনো পর্যন্ত বজায় রেখে চলেছে কৌশিক। হাঁপানি রুগী কপিল মজুমদারের ঝুলে পড়া সংসারটাকে টানটোন করে ঠিক রাখার দায়িত্বটা যে কৌশিকেরই। এই ধারণাটা যে কেন উঠেছিল কৌশিকের নিতান্ত কম বয়েস থেকে, সেটা তার সৃষ্টিকর্তাই জানেন। এখনো সেই পরলোকগত ব্যক্তির সংসারটার জন্যে দায়িত্ববোধটা রয়েই গেছে! তা যতই মোদো মাতাল উচ্ছন্নে যাওয়াই হোক!

পাবলিকের মতে তো উচ্ছন্ন যাওয়াই। যে লোক বন্ধুর বাড়ির অন্তঃপুরে ঢুকে পড়ে, শেষ পর্যন্ত খোদ মালিককে উচ্ছেদ করে ফেলে, নিজে তার যথা-সর্বস্বের মালিক হয়ে বসে পড়বার মতো ঘৃণ্য নীচ কাজ করতে পারে, তাকে উচ্ছন্ন যাওয়া লোক ছাড়া আর কী বলবে লোকে?

এখানে চালতাবাগান লেনে হয়তো সব খবর এসে পৌঁছয় না। তবে বিয়েটা যে সেকেণ্ড হ্যান্ড মেয়েকে করেছে, সেটা তো চাউর'

তবে টাকা জিনিসটা তো হচ্ছে প্রায় সর্বজ্বর হর গজসিংহ'। তাই কৌশিক বেশ বড় মুখ নিয়েই পাড়ায় ঢুকতে পারে। এবং লক্ষ্য করে না কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে সে যেন বেশ সমীহ ভাব দেখায়।

টাকাটা তো এখন ভালোই রোজগার হচ্ছে কৌশিকের। এবং তার চেহারা আর চালচলন দেখলে আরো বেশি ভালোই মনে হয়। তার ওপর আবার বাপের পুষ্যিগুলোর জন্যে মাসে মাসে খরচা দিয়ে যাচ্ছে, এরপর লোকের দৃষ্টিভঙ্গির একটু বদল হতেই পারে।

এখন তো বেশ বেশি বেশিই দিয়ে যেতে পারে। কপিল মজুমদার বেঁচে থাকতে পেরে উঠত না বলেই কী সেই ত্রুটি পূরণ করতে চায় তার প্রথম পক্ষের অবহেলিত পুত্র কৌশিক মজুমদার?

এ এক অন্য ধরনের আনন্দ!

অনেকটা যেন প্রতিশোধের মতো! তোমরা নীচতা করেছিলে, আমি উদারতা দেখাচ্ছি। হয়তো ভেবেচিন্তে করা নয়, তবু সেটাই হয়ে যাচ্ছে।

দরজা খুলে দিল টিঙ্কু!

কৌশিক বলল, 'সাড়া না নিয়ে দরজা খুললি যে? এটা কর্তার বারণ ছিল না?'

বাপকে কৌশিক আড়ালে কর্তাই বলত। এখনো অভ্যাসটা রয়ে গেছে!

টিঙ্কু অবশ্য দোষ স্বীকার করে না। বলে, 'তোমার কড়া নাড়ার ধরন আমার জানা আছে।'

'কতই বা আসি! এখনো মনে রেখেছিস?'

'কী যে বল দাদা! আগে তুমি এই বাড়িরই লোক ছিলে না?'

কৌশিক যেন একটা দৈববাণীর মতো কথা শোনে। কেমন যেন বিহ্বল হয়ে যায়। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে বলে 'বাড়িতে তুই একা না কী? মহাপ্রভুরা কেউ বাড়িতে নেই?'

'মহাপ্রভু' মানে কৌশিকের বাবার 'দ্বিতীয়পক্ষের' অবদান বাটুল শাটুল আর আটুল।

হাঁপানি রোগী কপিল মজুমদার অন্য অনেক ব্যাপারে পিছিয়ে থাকলেও বংশবৃদ্ধির ব্যাপারে তেমন নয়। তিন তিনটি দস্যি পুত্রের গরবে গরবিনী বীণাপাণি তাই স্বামীর প্রথম পক্ষের ফেলে রেখে যাওয়া ছেলেটাকে অবান্তর মনে করতো, বাড়তি মনে করতো। স্বামীটিও প্রায়শ সে গোড়ে গোড় দিতো।

তবে এখন পালাবদল ঘটেছে।

তার প্রধান কারণ ছেলেটা হাত ফসকে পালিয়ে গিয়ে একখানা লায়েক পুরুষ হয়ে সংসার ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যাওয়া এবং বাপের সংসারটার সঙ্গে এখনো যোগসূত্র রাখার রহস্যময় ঔদার্য দেখাচ্ছে। আর দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে তিন-তিনটি পুত্র গরবে গরবিনী হলেও, প্রথম সন্তানটিই যে মেয়ে। এবং সে দিব্যি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে।

অতএব রোজগেরে সতীনপোকে এখন একটু তোয়াজ করা দরকার। তবে চালাক মেয়ে বীণাপাণি আগে নিজে কখনো সতীনপোর সামনে নির্লজ্জ স্বার্থপরতাটি প্রকাশ করতো না, এবং কখনো দুর্বাক্যও বলতো না। সেগুলো চালাতো কপিল মজুমদারের মাধ্যমে।

অতএব এখনো তার স্নেহময়ী মূর্তিটি দেখাতে তেমন লজ্জা নেই। 'লজ্জা নেই, বাবা তুমিই ভরসা' বলতে। মহাপ্রভু ছেলে তিনটে ক্রমেই পাড়ার মস্তানদের সঙ্গে মিশে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হয়ে উঠেছে, ও দেখেও দেখে না। বরং লোকের চোখ থেকে তাদেরকে আড়াল করতে চায় 'বোকা' 'হাবা' 'ছেলেবুদ্ধি' বলে। যদিও মেয়ের কাছে হার মানতেই হয়।

মেয়ে বলে, 'তুমি আর তোমার সুপুত্র কটির 'গুণ' নিয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে বসো না মা! ওটা স্রেফ লোক হাসানো!'

কাজেই এখন টিঙ্কু দাদার প্রশ্নে ঈষৎ মাথাটা বাঁকিয়ে বলে, 'বাড়ি থাকবে? তাহলে জগতের ভারটা নেবে কে?'

'তা বটে! তা তাঁদের জননীটি? তিনিও তাই না কী? বাড়ি নেই?'

'অনেকটা তাই! বলতে গেলে ইহসংসারেই নেই। তিনি সারা সন্ধে জপের মালা নিয়ে বসে থাকেন।'

'জপের মালা! ভাগ!'

'ভাগ কী গো দাদা! দস্তুরমতো গুরুমন্ত্র আহরণ করে পরকালের পথ পরিষ্কার করবার সাধনায় লেগেছেন।'

'গুরু আবার জুটলো কোথা থেকে?'

'ভাগ্য প্রসন্ন হলে, কখন যে কী জোটে! তবে—' বলেই টিঙ্কু হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে একটু হাসে।

'তবেটা কী?'

'না মানে, ইয়ে ব্যাপারটা হার্মলেস এই ভরসা। গুরুঠাকুর নয়, গুরুমা। সে এক সাধুমা জুটেছেন কী সূত্রে!'

'তুইতো আচ্ছা ফাজিল হয়ে উঠেছিস।'

'দোহাই দাদা, রাগ করো না! মুখ ফসকে বলে ফেললাম। তো সে কথা যাক, ডেকে দিচ্ছি।'

'থাক! থাক! অসময়ে ধ্যানভঙ্গে কাজ নেই, চল বসি গে. একটা কাজের কথা আছে! তার আগে রাখ এটা

বলে প্যান্টের পকেট থেকে নোটের গোছাটা বার করে দেয়।

ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে বলে. 'এক্ষুণি যে?'

'এলাম, তাই নিয়ে এলাম!'

'একটু বেশি বেশি লাগছে মনে হচ্ছে—'

'তা আছে হয়তো তাই। আসলে হঠাৎ কিছু বাড়তি প্রাপ্তিযোগ হয়ে যাওয়ায়—'

'দাদা'—

'কী রে?'

'তুমি এখন বিয়ে টিয়ে করে সংসারী হয়েছ, সেটাও তো ভাবা দরকার। সবই এখানে ঢাললে—'

'ওরে ব্বাস শুধু ফাজিল নয়, খুব গিন্নীও হয়ে উঠেছিস দেখছি।'

হঠাৎ এই মেয়েটাকে যেন নতুন করে দেখতে পায় কৌশিক।

বাবার মৃত্যুকালে ওর শান্তভাব অথচ বিচক্ষণ ভঙ্গীটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এখন মাঝে মাঝে আসার ফলে ওকে যত দেখে ততই মনে হয় মেয়েটা ওর মায়ের মতো হয়নি। বেশ ভাল একটা মেয়ে। এসে ওর সঙ্গে কথা বলায় সহজ একটি স্নেহভাব আসে।

বাড়ির মধ্যে ঢুকে এল কৌশিক। সেই তার চিরপরিচিত ঘরটায়। যে ছোট্ট সরু প্রায় প্যাসেজের একাংশের মতো ঘরে একদা শুতো কৌশিক।...শুধু শুতেই পেতো। দিনের বেলা ঘরটা তার বাবার দখলে থাকতো বৈঠকখানা হিসেবে!

দেখল ঘরটায় একটু মার্জিত ভাবের প্রলেপ পড়েছে। সরু চৌকির

বিছানাটার ওপর সুন্দর দেখতে একটি বেডকভার ঢাকা দেওয়া। জানলা দুটোয় রঙিন ছিটের পর্দা।

দেওয়াল আলমারিতে কিছু বই টই।

হঠাৎ কী মনে হতে বললো, 'এখন বুঝি তুই এ ঘরে থাকিস?'

টিঙ্কু লজ্জিতভাবে মাথাটা একটু হেলিয়ে বলে, 'মাকে অনেক জপিয়ে টপিয়ে আদায় করা হয়েছে। দিতে কী চায়? বলে, এটাকে ওর পুজোর ঘর করবে। ভাঁড়ার ঘর থেকে লক্ষ্মীর ঘটটাকে উঠিয়ে এনে এখানে তার চৌকি পাতবে, আর ঘরভর্তি করে তেত্রিশ কোটিকে বসাবে।...তো হি হি, জানো দাদা, আমি না শুনে চোখ কপালে তুললুম। বললুম, কী সর্বনাশ! ভাঁড়ার ঘর থেকে লক্ষ্মীর ঘটের নির্বাসন? এ যে ভীষণ খারাপ!...তা হতে পারে না। আর তোমার ওই 'হরিনাম', সে তো লক্ষ্মীর ধারে কাছেই ভালো! হরি মানেই তো 'নারায়ণ!' সে কথা শুনে দূরে গিয়ে ঘর দখলের সংকল্প ত্যাগ করলো।'

কৌশিকের খুব ভালোও লাগছে, আবার একটু অবাকও হচ্ছে। মেয়েটা এত সাবলীল? এমন সহজ স্বচ্ছন্দ? অথচ আগে কেমন যেন আড়ষ্ট ছিল। যেন সদাই ভীত, সন্ত্রস্ত! কী জানি কার ভয়ে! রাগী রুক্ষ কর্কশ প্রকৃতি কটুভাষী বাবার ভয়েই হয়তো।

একটা ছোট বোন থাকা বেশ।

ঘরটায় বসে কৌশিকের যেন কেমন নস্টালজিয়া ভাব এলো! এ ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়ে কখনো হোটেলে কখনো কখনো ওয়াই এম সি এ হোস্টেলে থেকেছে আর এখন তো কত দিন পল্লবীর সেই বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে। অথচ এখানে বসে বিষণ্ন একটা ভাবে মনে হচ্ছে, 'জায়গাটা আমার ছিল।' কী আর মন্দ ছিলাম? নিজস্ব বলে একটা সুখানুভূতি ছিল!

এই পুরনো বালি খসা ইট বার করা বাড়িটা কৌশিকের ঠাকুর্দার আমলের বলেই কী? আর সেই সূত্রে কৌশিকের এ বাড়ির খান কয়েক ভাঙা ইটের ওপরও দাবি আছে, ভেবেই কী বীণাপাণি তার নিজ পুত্রদের স্বার্থ সংরক্ষণ সম্পর্কে অত হুঁশিয়ার ছিলো?

চমক ভাঙলো টিঙ্কুর ডাকে, 'দাদা, চা।'

'চা!'

'এই দেখ, আবার কষ্ট করে চা বানাতে গেলি কেন? চা খেয়েই বেরিয়েছি। আবার পথে এক বন্ধুর কাছে এক কাপ হয়ে গেছে'

কোনো কথাটাই বানানো নয়। পলুর কাছ থেকে বেরিয়েছিল চায়ের পর। শান্তনুও খাইয়েছিল এক কাপ চা।

টিঙ্কু একটু অপ্রতিভভাবে বললো, 'তা হোক। করলাম একটু। তোমার সঙ্গে আমিও একটু ভাগ পাব। বাড়িতে কেউ এলেই তো মায়ের সেই মহা

মুহূর্তেই চিনি ফুরিয়ে যায়।...আজ হরিনামে বিভোর তাই চিনির কৌটো হাতে পেলাম।'

তুই এত কথা শিখলি কবে রে ? আগে তো মুখে কথা ফুটত না।'

'সর্বদা কাঁটা ফুটে থাকার ফলেই হয়তো।'

হেসে ওঠে টিঙ্কু।

আর তারপরই বলে, 'খেয়ে নাও। শুধু চা মাত্র। টা বলে কিছু নেই। কিন্তু কী যে একটা কাজের কথা বলছিলে দাদা ?'

'বাঁচা গেল !'

কথাটা বলে ফেলবার মতো পরিস্থিতি হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল, 'আর বলিস না। তোদের ঘাড়ে আবার এক ভার চাপিয়ে বসতে হচ্ছে। তোদের বৌদিটি রোজ আমার সঙ্গে ঝগড়া করছে, তাকে শ্বশুরবাড়ি দেখাচ্ছি না দেওর ননদ দেখাচ্ছি না -'

'সত্যি, সত্যি বলছো দাদা ?'

'শুধু সত্যি। উৎখাত করছে।'

'তবে আনো না কেন ?'

'ওই তো—তোদের আবার ঝামেলায় ফেলা। তো আজ বলে দিয়েছি, কাল সকালে ভোর হওয়া মাত্র তোমায় শ্বশুর বাড়ি দেখিয়ে আনবো !' তো সেটাই তোদের একটু জানাতে এলাম ! দেখা যাক দেখে আবার নাক তোলেন কিনা !'

'কী রে ?'

'এটা তোমার একটু অবিচার ! আমিতো বলবো খুবই সরল ভালোবাসা-প্রবণ মেয়ে। না হলে শ্বশুরবাড়ি দেখতে চাইতো না। অবস্থা কী আর জানা নয় ? তুমি কী আর না বলেছ ?'

এই সময় হঠাৎ হরিনামের মালাটা হাতে নিয়েই বীণাপাণি ঘরে এসে ঢোকে, 'হ্যাঁরে টিঙ্কু, কৌশিকের গলা পাচ্ছি মনে হচ্ছে যেন—'

কৌশিক এবং টিঙ্কুর দুজনেরই বুঝতে বাকি থাকলো না আসামাত্রই তিনি অন্তরাল থেকে সবই শুনেছেন। তবু সেটা কেউ বলে উঠল না।

টিঙ্কু বলে উঠলো, 'হ্যাঁ, দাদা এসেছে, তোমার মাসহারি সংসার খরচটা দিতে—'

'ওমা, এত তাড়া কিসের বাবা ? তবে হ্যাঁ—'

টিঙ্কু তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'তাছাড়া, আর একটা কথা কাল সকালে বৌদিকে নিয়ে এখানে দেখা করাতে আসবে, সেই খবরটা দিতে—'

বীণাপাণি বলে, 'সাধে তোর ছোট ভাইগুলোকে বলি, দাদাকে দেখে শেখ কর্তব্যপরায়ণতা কাকে বলে।'

একটা নিঃশ্বাস ফেলে।

বলে, 'আমারই তো উচিত ছিলো ? একদিন উদ্যোগ করে আনা। তো মিথ্যে মানুষ। তবু বলছি—'

টিঙ্কু বললো, 'কী হলো ? আবার গলার মধ্যে বিষ্টি জমলো কেন ? কী বলতে চাইছ ?'

বীণাপাণি গলার স্বর নামিয়ে মেয়েকে কাছে ডেকে কী যেন বলে।

টিঙ্কু কিন্তু গলা তুলে বলে, 'তা বলতে অতো কুণ্ঠিতই বা হচ্ছ কেন ? নিজেই বলো না !'

'তুই গুছিয়ে বলে দে।'

'ওর আবার গোছাগুছি কী ? ও দাদা, মা বলছে বাড়ির বৌ এই প্রথম আসছে। আসছেই যখন দুপুরে দুটো মাছভাত খেয়ে যেতে হবে।'

কৌশিক বলে ওঠে, 'ওই তো ! এইজন্যেই বলছিলাম টিঙ্কু, তোদের ঝঞ্ঝাট বাড়ানো।'

বীণাপাণি করুণ করুণ মুখে বলে, 'একথা তুমি বলতে পারো বাবা ! বলবার হক আছে তোমার। আমারই তো উচিত ছিল পাঁচজনকে ডেকে একদিন 'বৌভাত' করে বৌ পরিচয় করানো—'

টিঙ্কু হঠাৎ মাকে প্রায় ধমক দিয়ে বলে ওঠে, 'মা তুমি থাম তো। সারাজীবনই তো যতসব উচিত কাজ করে এলে। তাই এখন কাঁদতে বসলে। দাদা তোমায়ও বলি বাবা। ঝামেলা আবার কী; বাড়ির বৌ, তার জন্যে কিছু আর মোগলাই রান্না করতে বলা হবে। শুনলেই তো দুটি মাছভাত ! তোমারই বা এত অস্বস্তি কেন ?'

কৌশিক তাড়াতাড়ি বলে, 'ঠিক আছে ঠিক আছে।···গিয়ে বলি গে সকাল বেলা বেশি তাড়াহুড়ো করার দরকার হবে না। ধীরে সুস্থে এলেই হবে।··· তবে ওই···পাঁচজনকে খবর-টবর দিয়ে বসা হবে না তো'বৌ' পরিচয় করাতে ?'

টিঙ্কু একটু মুচকি হেসে বলে, 'খবর কাউকে দিতে হবে না বাবা ! খবর বাতাসে হাঁটে। তবে চেষ্টা করবো যেন বেশি ভিড় বাড়ায় না কেউ। তাতে হয়তো তাঁকে অস্বস্তিতে ফেলা হবে।'

'তুই খুব বুদ্ধিমান আছিস। ইস, ব্যাকরণ ভুল হলো, না ? বুদ্ধিমতী হবে, তাই তো ?

বলে জোর গলায় হেসে ওঠে।

কত দিন এমন সহজ কথায় সহজ হাসেনি কৌশিক।

১২

জগতে কত তাজ্জব ব্যাপারই ঘটে।

আপনমনে প্রায় উচ্চারণ করেই কথাটা বলে কৌশিক।

আজ যেন কৌশিক একটা মস্ত পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে এলো। অথচ ভয়ে কাঁটা ছিল ফেল হবার।

'মেয়ে জাতটাই একটা তাজ্জব জীব।'

ভাবে কৌশিক। তাই জগৎ সংসারে যত তাজ্জব ঘটনার উৎস ওরা।

চালতাবাগান লেনের সেই শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে পল্লবী এমন আশ্চর্যরকম স্বাভাবিক সুন্দর ব্যবহার করেছে, এমন আন্তরিকতা আর আহ্লাদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে, যা কৌশিকের কাছে অকল্পনীয়।

মাটিতে আসন পেতে আসন পিঁড়ি হয়ে বসে কাঁসার থালা বাসনে ভাত খেতে খেতে বিগলিত আনন্দে বলেছে 'ইস কতদিন এমন আরাম করে খাইনি। সেই ছেলেবেলায় কেষ্টনগরে দিদিমার বাড়ি গিয়ে এইরকম খেতাম। এটা কাঁসার জিনিস না? কাঁসার থালা আর চোখেও দেখিনা। আর এই জিনিসটা। সুক্তো। পুঁইডাঁটার ছ্যাঁচড়া। ওঃ! মার্ভেলাস নামগুলোই ভুলে গিয়েছিলাম।'

আর টিংকুর সঙ্গে তো গলায় গলায় ভাব হয়ে গেল। বয়েসের পার্থক্যে কিছু অসুবিধে হল না।

কিন্তু শুধুই কী বয়েসের পার্থক্য? সাজসজ্জায় চেহারায় চরিত্রে অভ্যাস-গত আর পরিবেশগত যা কিছু সবেতেই তো আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

তবু কোনো এক মহানন্দে, পল্লবী বলল, 'ছোট ননদ জিনিসটা খুব ভালো ভাই। এতো ভালো লাগলো। তোমার মতো এমন মিষ্টি মেয়ে আমি আর কক্ষনো দেখিনি।'

তারপর আবার হি হি করে হেসে বলেছে, 'জানো তো আমি হচ্ছি 'সেকেন্ড হ্যান্ড'। আগে আমার আর এক দফা শ্বশুরবাড়ি এবং শাশুড়ি ননদ ইত্যাদি ছিল। প্লাস পিসি শাশুড়ি তো সে বেশ সুখস্মৃতিবাহক নয়। তবে এই যে দেওর না কি সেটা আগে ছিল না। তো তাদের তো বলতে গেলে দেখলামই না।

দেখেছিল একবার চকিতের জন্য।

পনেরো, সতেরো আর উনিশের তিনটি দামড়া ছেলে। সবাই না কী স্কুল স্টুডেন্ট, হঠাৎ তাদের স্কুলের ইউনিফর্ম পরে এসে একবার করে মুহূর্তের জন্য পল্লবীর পায়ের ধুলো নিয়ে মুহূর্তে হাওয়া।

পল্লবী অবাক হয়ে এই ধাড়ি ছেলেদের দিকে একবার তাকালো। এরা কৌশিকের নিজের ভাই! সহোদর না হলেও এক বাবার ছেলে তো। কৌশিক কী হ্যান্ডসাম। মুখের কাটুনি কী নিখুঁত আর এরা? গাবদাগাবদা গোপলা-মুখো। ওঃ, ঠিক মায়ের মতো।

কপিল মজুমদারের শ্রাদ্ধের সময় যথারীতি একখানা এনলার্জ ফটো করানো হয়েছিল এবং দেয়ালে টাঙানো রয়েছে।

বীণাপাণি বিগলিত গলায় বলেছিল 'এই যে মা, এই তোমার শ্বশুর।'

'প্রণাম করো'টা আর বলেনি। বলতে গিয়েও গলার মধ্যে রেখে দিয়েছিল।··· পল্লবী হাত দুটো জোড় করে কপালের কাছে তুলেছিল একবার। তবু দেখে নিয়েছিল, মুখের কাঠামোটা 'কাঠ কাঠ' হয়ে গেলেও, কৌশিকের সঙ্গে আদলের সাদৃশ্য আছে।···সে রকম সাদৃশ্য ওই মেয়েটার চোখেও রয়েছে। যদিও শ্যামলা রং তবু বেশ একটু লাবণ্য আছে, আছে একটু ঔজ্জ্বল্য।

কৌশিকের সারাক্ষণ শ্রোতার ভূমিকা।

'আচ্ছা ভাই, এসে পর্যন্তই শুনছি 'টিঙ্কু টিঙ্কু'। তোমার ভালো নামটা কী?

'ভালো নাম? সে আমিই প্রায় ভুলে গেছি। দারুণ পোশাকি। কেবলমাত্র স্কুল কলেজের খাতায় আছে।'

'ও মা, তুমি কলেজেও পড়েছ? মানে আর কী—'

বলে লজ্জা পেয়ে যায়

উত্তর শোনা যায়, 'পড়েছি' মানে আর কী পড়ছিলাম। তো এখন তো ছেড়ে দিয়ে বসে আছি।'

'সে কী? কেন? ছেড়ে দিয়ে কেন?'

'ওই আর কী! আর পড়া হলো না। আর একটা বছর পড়লে বি. এ ফাইনালটা দেওয়া হয়ে যেতো।'

এই সময় হঠাৎ কৌশিক ভূমিকা বদল করেছিল। বলেছিলো, 'আরে আমি তো এসব জানি না। তা দেওয়া হলো না কেন?'

টিঙ্কু হঠাৎ দুহাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলেছিলো, 'স্বর্গারোহিত জনের সম্পর্কে মন্তব্য করতে নেই দাদা। তো তুমিও তো কিছুটা ভুক্তভোগী।'

কৌশিকের মনে পড়লো।

উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ করার পর থেকেই বাবা বলতে শুরু করেছিলো, 'আর পড়ে কি হবে? ডিগ্রী নিয়ে কী ধুয়ে জল খাবে? কোনো একটা টেকনিক্যাল লাইনে ভর্তি হলে ভালো হয়।'

'হও এমন বলতো না। বাবা বলতো হলে ভালো হয়। 'করো' নয়, করলে ভালো হয়।'

'পিতৃনির্দেশে কলেজ ছেড়ে 'কম্পিউটার'-এর ক্লাশে ভর্তি হয়েছিলাম। তাও তো বাবার হাঁপানি বাড়লো, মায়ের শরীর খারাপ হলো, এইসব ঘটনায়—'

'হুঁ! বুঝলাম। তুই আবার পড়বি।'

'আবার? ধেৎ। এমন কিছু ভালো স্টুডেন্ট নই দাদা। দেশে একটা গ্র্যাজুয়েট কম হলে কিছু এসে যাবে না। তবে এই কোর্সটা কমপ্লিট করে যদি—'

পল্লবী বলে উঠেছিল, 'এই দ্যাখো, এইসব কেজো কথার চাপে আসল কথাটাই চাপা পড়ে গেল। ভালো-মানে সেই পোশাকী নামটা কী?"

'নাম? নাম হচ্ছে সুদেষ্ণা।'

'বাঃ, খুব সুন্দর নাম তো! অবশ্য টিঙ্কুও বেশ নাম। তো আবার যখন ভর্তি হতে যাবে—'

কৌশিকের মুখের সামনে একখানা মলাট-ছেঁড়া কী যেন পত্রিকা, তার আড়াল থেকে কানে এলো—'আবার ভর্তি হওয়া-হয়ি কেন মা? এইবার বরং ওর দাদাতে তোমাতে মিলে ওর একটা বিয়ের ব্যবস্থা করো। আমি নিশ্চিন্ত হই।'

'বিয়ে? ওর এক্ষুনি বিয়ে?'

কৌশিক আবার কথকের ভূমিকায় এসে যায়, 'কত বয়স ওর?'

বীণাপাণি গম্ভীর গলায় বলে, 'মেঘে মেঘে বেলা হয়েও গেল বৈকি বাবা। ছোট ভাইদের মতো অমন ধাইপেয়ে গড়ন নয় বলেই বোঝা যায় না। বয়েস প্রায় বাইশ হয়ে গেলো।'

যার বয়েসের উল্লেখ সে হেসে উঠে বলে, 'প্রায় কেন মা? পার হয়ে গেলো তো? এই জুন মাসেই তো—একদম পার হয়ে যাবে।'

'দূর। বাইশ বছর আবার একটা বয়েস। এখন রাখো ও চিন্তা।'

'রাখতুম বাবা। যদি যাঁর চিন্তা তিনি থাকতেন। আমার আর সংসারে মন নেই। মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেলেই—'

মেয়েটা বলে ওঠে, 'ও, মেয়েটার বিয়ে হলেই তোমার ছুটি কেমন? তোমার ওই স্কুলবয় দিগ্গজ ছেলে তিনটির চিন্তা কে করবে?'

'ছেলেদের জন্যে ভাবি না।'

'চমৎকার! বোঝাই যাচ্ছে, হুকুম হয়ে গেছে তোরা চরে খেগে যা। ওঃ! হরিনামের মালার মতো 'আত্মরক্ষার' এমন অমোঘ অস্ত্র বোধহয় আর দুটি নেই। তাই না মা?'

হি হি করে হাসে টিঙ্কু।

তারপর ?

সারাক্ষণ কৌশিককে শান্তির সাগরে ভাসিয়ে রেখে আর বিস্ময়ের পাথরে চুবিয়ে চুবিয়ে ফেরার সময় ট্যাক্সিতে বসে বলেছিল পল্লবী, 'বাইশ বছর বয়েসটাকে মেয়েদের পক্ষে বিয়ের বয়স নয়, তোমার ধারণা ? আমি যখন শান্তনুদের বাড়িতে এসেছিলাম, আমার কত বয়েস ছিল জানো ? মাত্র সাড়ে একুশ।'

কৌশিক কিছু না ভেবেই বলে ফেলেছিলো, 'তাই অমন বেচারি বেচারি হয়ে থাকতে হয়েছিলো। ওপরওলাদের তাঁবে ভয়ে জড়োসড়ো।'

পল্লবী মাথাটাকে সিটে হেলান দিয়ে বসে বলে উঠেছিল, 'আমার সে জীবনের কথা তুমি কতটুকু কী জানো কৌশিক ? আমি তো তখন খুবই সুখেই ছিলাম। 'আনন্দ' শব্দটার মানে জীবনে সেই একবারই জেনেছিলাম।'

কৌশিক একটুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকায়, কিন্তু পুরোটা দেখতে পায় না। জানলার দিকে ওর মুখ ফেরানো।

আবহাওয়া হালকা করে নিতে বলে ওঠে, 'তবে আর কী ননদিনীর জন্যে পাত্র খুঁজতে লেগে যাও।'

'খুঁজতে হবে না।'

'খুঁজতে হবে না!'

'নাঃ। সে ঠিকই আছে।'

'আরে বল কী ? ওই খুকিটা ইতিমধ্যেই এইসব ঘটনা ঘটিয়ে রেখেছে ? আর এই সামান্য সময়ের মধ্যে দশ বছরের বড় বৌদির কাছে সেটি ব্যক্ত করেও ফেলেছে ?'

'সবটাই কী আর মুখের কথায় ব্যক্ত করতে হয় ?'

'তাহলে ?'

'মুখের রেখায় চোখের আলোয়, ভঙ্গির ভাষায় বোঝা যায়। মেয়েরা মেয়েদের ওই ভাষাটি বোঝে।'

১৩

হঠাৎ এক নতুন নেশা লেগে গেছে খামখেয়ালী পল্লবীর মনের মধ্যে। টিংকুর বিয়েটা সমাধা করে ফেলতে দারুণ তৎপর হয়ে ওঠে।

টিংকু না কী একবার বলেছিল, 'ও বৌদি, হতভাগাটা যে বলছে, নিজের পায়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত গলায় পাথর ঝোলাবে কোন লজ্জায় ?'

পল্লবী বলেছিল, 'আমার নাম করে বলিস সেই হতভাগাটাকে 'হতভাগা'রা জীবনভোর কত কত লজ্জাজনক কাজ করে চলতে বাধ্য হয়, এটা তার পক্ষে এমন কিছু নয়। আর 'পাথর' শব্দটা সম্পর্কে আমি আপত্তি করছি। মেয়েরা কী আর এখনো গলার পাথর? অবশ্য আমাদের মতো মেয়ের কথা আলাদা। যাদের জীবনের পরিবেশ আকাশে ডানা মেলবার চেষ্টা করারই সুযোগ দেয়নি। কিন্তু আজকের মেয়েরা তো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সহযোদ্ধা। তারা তো সমান তালে ঘর বাইরে সামলে চলে। তবে কী জানিস? ভিতরে ভিতরে পুরুষ সমাজটা সেটা পছন্দ করে না। তারা চায় বৌকে শো কেসের' ডল করে রাখতে। ভাবটা যেন আমারই গরবে গরবিনী থাকো তুমি, রূপসী আমারই রূপে।'

'টিঙ্কু একটু অবাক হয়েছিলো, দাদা একদা বলেছিল, তোদের জন্যে যদিও একটা বৌদি জোটাতে পেরে উঠলাম, তবে একটু পাগল-ছাগল গোছের আছে।

কেন একথা বলেছিল দাদা? এ মেয়ের মধ্যে তো অনেক গভীরতা, অনেক চিন্তা-ভাবনা।

তারপর ভেবেছিল আসলে আমরা কেউ কাউকে চিনি না। দাদা সম্পর্কে আমার পূজনীয় পিতৃদেব আর মাতৃদেবী আমাদের মধ্যে কী একটা বিজাতীয় বিরূপতার ভাব সৃষ্টি করে রেখে এসেছিলেন বরাবর। তার সঙ্গে আতঙ্ক। দাদা স্বার্থপর, দাদা আমাদের আপনজন বলে ভাবেই না।

পল্লবী কৌশিকের গায়ে একটা খোঁচা মেরে বলে, 'তুমি টিঙ্কুর ভাবী বরকে তোমার কোম্পানিতে একটা চাকরি করে দাও। নইলে এখন বিয়ের রাজী হবে না।'

কৌশিক অবাক হয়ে বলেছিল, 'তা এত তাড়ারই বা কী আছে। বিয়ের বয়েস তো পালিয়ে যাচ্ছে না।'

'কে বলেছে পালিয়ে যাছে না? বয়েস তো পালিয়েই যায়। এসে যায় শুভ মুহূর্ত', পরম লগ্ন। আমি এক্ষুনি ওদের বিয়েটা দেখতে চাই। বাইশ বছর! শ্রেষ্ঠ বছর।

তা এও তো পাগল ছাগলের পাগলামিই।

তা ধরেছে যখন ছাড়বে না!

অতএব বেশ সমারোহ সহকারেই বিয়েটা হয়ে গেল টিঙ্কুর সুদেষ্ণার পাড়ার একটা সদ্য চাকরি পাওয়া ছেলের সঙ্গে।

বীণাপাণি বারবার ব্যাকুল প্রশ্ন করেছে, 'অ বাবা কৌশিক খরচাপাতি কেন? এত জামাকাপড় গহনা কেন? গরীবের মেয়ে গরীবের মতোই হোক।'

কৌশিক দু'হাত উল্টে বলেছে, 'আমি ওসবের মধ্যে নেই বাবা। যা হুকুম করা হচ্ছে তাই করছি।'

তবে এক আধবার পল্লবীকে বলতে চেষ্টা করেছে, 'মা বলছিল বাড়াবাড়ি খরচা কেন? কম কম করে করলেই তো ভালো!'

'ওঃ, তা বলবেন তো তোমার ওই মা! খরচা যদি করতেই হয় ওঁর ওই স্যান্ডো গুণ্ডা ছেলেগুলির জন্য!...মেয়ে শুধু সংসারে খাটুক আর গরীবের মতো থাকুক।'

হঠাৎ টিঙ্কুকে স্বজাতি বোধেই পল্লবী এমন বিরোধী পক্ষের দিক ধরেছে।

কৌশিক দেখল পল্লবী কত কর্মক্ষমতা ধরে। পল্লবী সেই চালতাবাগান লেনের বাড়িতে গিয়ে দিনে রাতে থেকে বিয়েটা উদ্ধার করে ফেলল।

আর বীণাপাণি?

সে তো তোয়াজের বন্যা বহাল।

পল্লবীকে 'ঘরের লক্ষ্মী' বিশেষণেই রেখে দিল। এবং কোনো এক সময় না কী বলে রাখলো 'তুমি ছাড়া আর কে জামাইবরণ করবে মা? আমাকে তো ভগবান মেরে রেখেছে।'

বিহ্বল পল্লবী বলে ফেলেছিল, 'আমি? আমার ও সব করতে আছে?'

'কেন নয় মা? কৌশিক যখন তোমায় এ সংসারের লক্ষ্মী করে নিয়ে এসেছে, তুমি মাথার মণি! তুমি ছাড়া আবার কে বরণ করবে?'

বহুদিনের সঞ্চিত হীনমন্যতাটা কী ধূসর হয়ে এল পল্লবীর?...ওর মনোজীবনে কী উত্তরণ ঘটলো?

হয়তো ঘটলো। অবোধ বলেই ঘটল। বীণাপাণির এই স্নেহ বিগলিত উদারতাটি যে কতখানি অর্থমূল্যে কিনে ফেলেছে সে, সে হিসেব কষতে বসলো না পল্লবী,—বীণাপাণির ছেলে বা মেয়ের মতো!

পাড়ার লোক মৃত কপিল মজুমদারের মেয়ের বিয়ের সমারোহ দেখে বাঁকা হাসি হেসে আড়ালে বলাবলি করলো, 'সবটাই হচ্ছে কৌশিকের বাহাদুরি দেখানো। একটা বেয়াড়া বিয়ে করে বসে যে হেয়টা হয়ে বসে আছে, সেটা মোচন করতেই এত।'

কেউ বা বললো, 'এ হচ্ছে নাম কেনা। পয়সা হয়েছে, তা দেখানো!...আরে বাবা, তোর পয়সা তো ঘুষ-ঘাষের, কালো টাকার। জানতে আর কার বাকি আছে? ওদের কোম্পানিটাই তো একখানা নাম-করা চিটিংবাজ!'

কে কোন সূত্রে এসব তথ্য আবিষ্কার করলো সে প্রশ্ন ওঠে না। সত্যমিথ্যা যাচাই হয় না! কথা যখন উঠেছে একবার সে কথাগুলো কায়েম হয়ে বসে!...

১৪

আবারও শান্তনুর আস্তানায় হানা দিতে গিয়েছিল কৌশিক, 'বোনের বিয়ে! যেতে হবে!'

অতি সুন্দর কার্ডে ছাপা সেই নিমন্ত্রণপত্রটার দিকে তাকিয়ে দেখলো শান্তনু! চিঠিতে নিমন্ত্রণ কর্তা হিসেবে অবশ্য কৌশিকের কোনো নাম গন্ধ নেই। নাম আছে বিধবা বীণাপাণি মজুমদারের। তার সঙ্গে যুক্ত আছেন তাঁর চন্দ্রবিন্দু মার্কা স্বামী কপিল মজুমদার!

কৌশিকের দিকে তাকিয়ে শান্তনু একটু অবাক হয়ে বললো, 'এই সুদেষ্ণা তোর নিজের বোন? মানে সহোদরা, না কী—'

'না ভাই, নিজের কোনো সহোদরা নেই, সে তো জানিসই। এই দুগ্ধ-পোষ্যটাকে ফেলে রেখে কেটে পড়েছিলেন গর্ভধারিণী।'

শান্তনু একটু হেসে বলে, 'তাই তো জেনে এসেছি এতদিন···কিন্তু সতাতো বোনের বিয়ে নিয়ে মাতামাতি খরচাপাতি! পলু অ্যালাউ করেছে? সে তো একখানা গাড়ি গাড়ি করে পাগল!'

'তোকে বলিনি—মেয়েরা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার একটি আজব সৃষ্টি!···তোর পলুই তো নাটের গুরু।'

তারপর যতটা সংক্ষেপে অবস্থাটা বুঝিয়ে বলে, 'বলবো কী এই নেশায় ওর পাগলামির যে প্রধান 'ইস্যু' সেটাও যেন প্রায় ভুলে যেতে বসেছে! দুটি প্রেমে পড়া তরুণ-তরুণীর মিলন ঘটিয়ে দেবার মহান ব্রতের তাগিদে ব্যস্ত।

'শুনবি তাহলে, বলেছিলাম—একটা লাল মারুতি যা তোমার পছন্দ বুক করতে কিছু টাকা রেখেছিলাম, বিয়ের এত ঘটাপটা করতে গেলে হয়তো তাতে টান পড়বে।···বলে কিনা, 'চুলোয় যাক লাল মারুতি। সে তো আর মার্কেট থেকে পালিয়ে যাচ্ছে না। ওদের বসন্তের সোনার দিনগুলো যে পালিয়ে যাবে।'

এ কাহিনী তিনটে প্রাণী নিয়ে হলেও, চিরাচরিত রীতিতে ত্রিভুজ প্রেম কাহিনী নয়!

এত বিরহ, মিলন, আবেগ, আতিশয্য অথবা অবৈধের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ইত্যাদি প্রভৃতি তেমন কিছু নেই।

এ হচ্ছে—বিধাতাপুরুষের বঞ্চনার শিকার এক বন্ধ্যা নারীর তীব্র বেদনার বিকৃত প্রতিভাসের কাহিনী।

পল্লবী কী সাধারণ বন্ধ্যা নারীদের মতো মাতৃত্বের ক্ষুধায় উম্মাদ ?

বোধহয় ঠিক তা নয় ।

পল্লবীর বেদনা, যন্ত্রণা, আক্ষেপ, আর্ততা, মাতৃত্বের ক্ষুধা তত নয় । যত এই তার নারী মহিমার দৈন্যে !

সে দৈন্য তার নিজের মধ্যেই কিছুতেই সে কথা মেনে নিতে পারেনি পল্লবী । বিকৃত এক ভ্রান্ত ধারণায় কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে, দু'দুটো পুরুষকে ! বিধাতাপুরুষের বঞ্চনার শাস্তি পেয়ে চলেছে দুটো নির্দোষ পুরুষ ।

এ শাস্তি কী তাদের পাবার ?

তারা তো ওই প্রায় উম্মাদিনী রমণীকে ধুলোয় আছড়ে ফেলে দিয়ে অট্টহাস্য হেসে বলে উঠতে পারতো, 'ওহে মহিলা, তুমিই, তুমিই, তুমিই নিঃস্ব নিঃসম্বল । অক্ষমতার প্রতীক ।'

না তা বলে ওঠেনি তারা, কারণ তারা পল্লবী নামের মেয়েটাকে ভালোবাসে । বড় বেশি ভালোবাসে । ওর ওই ভ্রান্ত ধারণাটাকে চূর্ণ করে দিয়ে ওকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চায়নি । পারেনি ।...

কিন্তু শেষরক্ষা কী হলো শেষ পর্যন্ত ?

সে কথা থাক । ঘটনাচক্র যে কখন কাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে কোন আবর্তে ফেলে !

আচ্ছা সেই ছেলেটার কথাই ভাবা যাক । যে ছেলেটা সম্পর্কে টিঙ্কু একদা 'হতভাগা' বিশেষণ প্রয়োগ করেছিলো !

পার্থসারথি রায় নামের সেই শুধুমাত্র সাধারণ বি. এ. পাশ ছেলেটা যখন বে-আন্দাজি একখানা প্রেমে পড়ে বসে হাবুডুবু, চাকরি খুঁজতে খুঁজতে দিশেহারা, সে কি ভেবেছিলো অভাবিতভাবে তার একখানা চাকরি জুটে যাবে, তার সঙ্গে জুটে যাবে চেলি চন্দন টোপর পরে ছাঁদনাতলায় গিয়ে দাঁড়াতে পাবার শুভযোগ ? ভেবেছিলো—তার সেই বিয়েতে ঘটাপটা হবে ? আর তারপর—

আসলে পার্থ এই চালতাবাগান লেনের পুরনো বাসিন্দা নয় । কিছুদিন আগে ওখানের সমরবাবুর বাড়ির একতলায় দুখানা ঘর ভাড়া নিয়ে কেবলমাত্র রোগাভোগা বিধবা মা'টিকে নিয়ে বাস করতে এসেছিল ।

কোথায় কোনখানে দূর সম্পর্কের কাকার বাসায় আশ্রিতই ছিলো । সেই কাকার হঠাৎ একদিন দিব্যদৃষ্টি খুলে গেলো, এই বাজারে এমন অপচয় কোনো আকাট নির্বোধেও করে না ! অতএব একদিন খুব মোলায়েমভাবে 'পথ দেখবার' নির্দেশ দিলেন দূর সম্পর্কের ভাজ ও ভাইপোকে ।

দোষ দেওয়া যায় না !

ভাই মারা যাবার পর এতদিন যে রেখেছিলেন, সেই তো যথেষ্ট !

মায়ের শেষ সম্বল এক গাছা সরু সোনার হার যেটা তিনি ভবিষ্যতে ছেলের

বৌয়ের মুখ দেখবেন বলে রেখেছিলেন সেটাকেই বিক্রি করে চালতাবাগান লেনের সমীর ঘোষের বাড়ির ওই একতলার ঘর দু'খানা ভাড়া করে এসে ঢুকলেন আগাম ছমাসের ভাড়া দিয়ে। ··

তো গ্রহের ফের !

ছমাসের মেয়াদ ফুরোবার আগেই মহিলার, 'দিন ফুরলো'। ইতিমধ্যে হতভাগ্য ছেলেটা নতুন পাড়ার ওই মেয়েটার প্রেমে পড়ে মরেছে !···এদিকে বাড়িভাড়ার চিন্তা। তারপর ওই ঘটনাচক্র।

সমীর ঘোষ যখন গুন গুন করে বলেছিল, 'তোমার মা তো চলে গেলেন, দুখানা ঘর নিয়ে কী করবে ? একখানা যদি ছেড়ে দাওতো, ভাড়া কমিয়ে দিই।' ঠিক সেই সময়ই চাকরিটা জুটলো। আর ঘর দখলের জন্যে ঘরণী জুটলো। জুটলো ঘর সাজিয়ে তোলার আসবাবপত্র। দেখেশুনে সমীর ঘোষ আর কথাটি কইল না।

অতঃপর ঝুলি থেকে চায়ের সঙ্গে খাবার 'টা' টাও বেরোয়।·· হয়তো ডালমুট, হয়তো পেস্ট্রি, একদিন তো সেলোফেন পেপারের প্যাকেটে মশলামুড়ি পর্যন্ত নিয়ে এসেছিল !

বলেছে, 'তোর দাদাটাকে তো সহজে হাতে পাইনা। অফিস ফেরত ঠিক ক্লাবে গিয়ে জুটবে। তুই টিঙ্কু, খবরদার বরকে বন্ধুদের কবলে সঁপে বসবি না। ওই সব ক্লাবের বন্ধু টন্ধুরা তো বন্ধু নয়, শত্তুর।'

এই রকম মুড নিয়েই তো আসে পল্লবী এখানে। পার্থ ছেলেটি যেমন নম্র তেমনি সভ্য মার্জিত। অথচ মুখচোরা নয়। স্মার্ট ভাবও আছে।

পল্লবীর যেন এদের এখানে নিজেকে মেলে দেবার একটা জায়গা হয়েছিল।

কিন্তু সেদিন গাড়ি থেকে নেমেই ঢোকবার মুখে দেখে টিঙ্কুর বাড়িওলা গিন্নী। সেইমাত্র যেন কোথা থেকে ফিরছেন। প্যাসেজে দাঁড়িয়ে পড়েন।

পল্লবীকে দেখেই হঠাৎ একমুখ কেমন যেন রহস্যের হাসি হেসে গলার স্বর নামিয়ে বলে ওঠেন, 'আদরিণী ননদের জন্যে কিছু না কিছু আছে হাতে, কেমন ? আমরা তাই বলাবলি করি কপালগুণে এমন ভাজ পেয়েছে সুদেষ্ণা। তো এবার আর ওসব না এনে, আচার কাসুন্দি ভাজাভুজি আনতে শুরু করো। সুখবর আছে ননদের। সর্বদা মাথা ঘুরছে, গা বমি বমি ভাব। অখিদে, অরুচি !'

পল্লবী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। তীক্ষ্নভাবে বলে, 'সর্বদা মাথা ঘুরছে অখিদে, অরুচি ! একে সুখবর বলছেন মানে ? অসুখ করেছে বলুন !'

প্রৌঢ়া মহিলা। তবু নবীনার কৌতুক ভাব মুখে মেখে বলেন, 'অসুখ তবে সুখেরই অসুখ তো ! ও, তোমার বোধহয় মানে বুঝতে দেরি হবে তো নিজের না হোক দেখেছ তো পাঁচজনের—'

ততক্ষণে ভিতরে ঢুকে গেছে পল্লবী ! মানে বোকা হয়ে গেছে ! তারপর ?

তারপর কিনা ঢুকেই টেবিলের ওপর চায়ের প্যাকেটটা নামিয়ে রেখে টেবিলে রাখা ফুলদানীটার দিকে তাকিয়ে দেখে বলে উঠলো, 'ওঃ ! বাসি ফুলগুলো বদলানো হয়নি ! ছিঃ ! সাধে কী আর বলে, 'যেমন পরিবেশ তেমন রুচি !'

আকস্মিক এই আক্রমণে দুটো মানুষই যেন চমকে উঠেই হতভম্ব হয়ে গেল।

হাঁ করে তাকিয়ে দেখলো।

কিন্তু তারপর যেই দেখলো বাসি রজনীগন্ধার শুকনো ডাঁটি কটা টেনে তুলে ঘরের মেঝেয় ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো পল্লবী, তখন টিংকু বলে না উঠে পারলো না, 'এটাও কিন্তু খুব সুরুচিসম্মত কাজ হচ্ছে না বৌদি '

একা থাকলে হয়তো বলতো না।

কিন্তু বরের সামনে হঠাৎ এমন আক্রান্ত হয়ে লজ্জায় মাথা কাটা গেলো হঠাৎ—এ আবার কী ?

তা এরপরও ঠিকরে উঠবে না পল্লবী ?

অগ্নিমূর্তি হয়ে বলবে না, 'কী বললি ?'

'কিছুই বলিনি বৌদি ! তুমি রুচির কথা তুললে কিনা তাই বলে ফেললুম !'

'বটে ! মুখে খুব বুলি ফুটেছে দেখছি ! একেই বলে অতক্তজ্ঞ ! আমি চললাম !'

বলে ঠিকরে বেরিয়ে যায় !

পার্থ যে কথাটা বলে উঠেছিল সেটা আর শুনতে পেল না এই যা রক্ষে। শুনতে পেলে কী হতো কে জানে !

শুনলো পল্লবীর ননদ।

একটু তিক্ত হাসি হেসে বলে উঠেছিল পার্থ, 'একেই বলে বড়র পিরিতি বালির বাঁধ ! ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেক চাঁদ !'

কিন্তু যে শুনতে পেলো সে তখন কেঁদে ভাসাচ্ছে।

তারপর ?

তো সেই দুখানা ঘরেই হলো টিংকুর সুখস্বর্গ রচনা !

বিয়ে উপলক্ষে বাড়িওয়ালা একবার দেয়ালের কলি ফিরিয়ে দিয়েছিলো। তারপরই তো ঘরের সাজসজ্জা এসে হাজির হলো ! পল্লবীর খেয়াল চরিতার্থ করতে খাট, বিছানা, আয়না, আলমারি কী নয় ? আর তবুও তার ওপরও পল্লবী ?

যে প্রায় প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে আসতে লাগলো সংসার পাতবার আর ঘর সাজাবার মতো কিছু উপহার হাতে নিয়ে।

এরা দ্যটোতে রীতিমত বিব্রত।

আর সেটাই যেন পল্লবীর কাছে মজা!

পার্থ বলে, 'আচ্ছা বৌদি, ঘরে তো জিনিস ধরছে না। আবার আপনি একগাদা কী সব এনে হাজির করলেন?'

পল্লবী তাকে বকে উঠে বলে, তুমি থামো তো। একটা সংসার পাততে কী লাগে আর নালাগে তুমি জানো?'

টিঙ্কু (এখানে অবশ্য সুদেষ্ণা) কুণ্ঠিত ভাবে বলেছে, 'হাঁড়ি, কড়া, হাতা, খুন্তি, চাকি, বেলুন, বঁটি, কাটারি, শিলনোড়া, এই জিনিসগুলোকেই জানি, তাদের ব্যবহারও জানা! কিন্তু তোমার এই নানারকমের জিনিস? আমি এদের ব্যবহার তো দূরের কথা, নামই জানি না। ওসব নিয়ে কী করব?'

'কী আবার করবি? শিখবি ওদের চালনা করতে! চিরদিন গাইয়া হয়ে থাকবি না কী? এই সবই তো আজকের দিনের সংসারের উপকরণ।'

এ সব ছাড়াও এসে যাচ্ছে ভালো চায়ের সেট, শরবত সেট, কফির কাপ।... এসে যাচ্ছে তার সঙ্গে ফুলদানী, পুতুল, এটা সেটা।...

দেখে দেখে বীণাপাণি পর্যন্ত বেজার মুখে বলে 'বাড়াবাড়ি! আদিখ্যেতা, বড়মানুষী দেখানো!'

বাড়িওলা গিন্নী তো হিংসেয় মুখ কালো করে তেতো গলায় বলেন, 'ধুকড়ির ভেতর খাসা চাল।... এমন বড়মানুষ আত্মীয় ছিলো কে জানতো? মা'টা তো বলতে গেলে বিনা চিকিচ্ছেয় মরলো!'

সেটাকে তিনি তখন 'স্বাভাবিক' বলেই উদাসীন ছিলেন। গরীব গরীবের মতো থাকবে, গরীবের মতই মরবে, এটাই তো ন্যায্য!

কিন্তু গরীব হঠাৎ কোনো অদৃশ্য শক্তিতে না গরীবের মতো বাঁচবে, এ কী সহ্য করা সহজ?...

পল্লবী এদের ভাবভঙ্গিটা যত বোঝে ততই মজা পায়।

আর কৌশিক পর্যন্ত যেদিন বলে বসলো, 'তুমি বোধহয় বড় বাড়াবাড়ি করে ফেলছো। এতে ওদের অস্বস্তি হয়।'

তাই শুনে পল্লবী কট কট করে শুনিয়ে দিলে, 'এটা যদি কৌশিকের নিজের মায়ের পেটের বোনের ক্ষেত্রে হতো, তা হলে বাড়াবাড়ি ঠেকতো না। সতাতো বোন বলেই—'

হ্যাঁ, ভালোবাসার পাত্রকে কটু কথা বলে ফেলতে পারে পল্লবী। বোধ করি ভালোবাসার পাত্রকেই বেশি করে বলতে ভালোবাসে। যেন অধিকারের সীমানাটা মেপে মেপে দেখে! আর দেখে আহ্লাদ পায়।

১৫

অথচ সেই পল্লবী হঠাৎ একদিন তুচ্ছ কারণে, বলতে গেলে অকারণেই যাকে বলে, হাওয়ায় ঝড় তুলে টিঙ্কুদের সঙ্গে এমন ঝগড়া বাধালো, যে আর তার বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোল না। মুখ দেখাদেখি বন্ধ করলো!

কিন্তু কেন এমন অভাবিত পালাবদল?

তার প্রাক্কালে, কী এমন ঘটনা ঘটেছিল?

তা ঘটনা বললে ঘটনা, অথবা একটি 'ঘটনা'কে কেন্দ্র করে সাত তাড়াতাড়ি একটি রটনাই হয়তো এর অন্তর্নিহিত কারণ!

অন্যদিনের মতো সেদিনও হাসতে হাসতে আসছিলো পল্লবী টিঙ্কুর বাড়ি।··· হাতে একটা ভালো ব্র্যান্ডের চায়ের প্যাকেট। এমন আনেই মাঝে মাঝে। আর বলে, তোর হাতের চা খাবো বলে নিয়ে চলে এলাম। কই তোর পতি দেবতাটি? ডাক তাকে। তিনজনে একসঙ্গে জমিয়ে বসে চা খাবো!'

নিজের বাড়ি ফিরে পল্লবী যেন সর্পিনীর মতো ফোঁস ফোঁস করে বেড়াতে থাকে।···

যেন ধারে কাছে কাউকে পায় তো তখনি ছোবল মারে।

পেলো অলকাকে।

বললো, 'সাহেব ফেরেননি?'

অলকা গা মোচড় দিয়ে বলে উঠলো, 'তিনি আবার কবে এমন সাত সকালে ফেরেন? আপনি স্বপনো দেখছেন না কী? সবে তো রাত নটা। নেশা পাকেই নি এখনো!'

'কী? কী বললি? ছোটো মুখে বড় কথা!'

হ্যাঁ, এ ধরনের গ্রাম্য কথা হঠাৎ হঠাৎ বলে ফেলে পল্লবী! রাগের মাথায় নিজের ভাবমূর্তিখানি সম্পর্কে কোন জ্ঞান থাকে না।

কিন্তু অলকারা কী অপমান সয়ে নীরবে থাকে? ছেড়ে কথা কয়?

অলকা বলে ওঠে, 'তা আপনারা যদি বড় মুখে ছোটো কথা কইতে পারেন, আমরাই বা ছোট মুখে বড় কথা কইব না কেন?···নিত্যদিন আমায় রাত বারোটা অবদি সাহেবের জন্যে জেগে বসে থাকতে হয় না?'

'থাকবিই তো। এত টাকা মাইনে দিয়ে লোক পোষা হয় কেন তবে?'

'সে তো একশো বার। থাকতে বাধ্য, থাকি তবে সে কথাটা তো উইড়ে

দেওয়া যায় না। নেশা করার কথায় দোষটা কী হলো? ও আর আজকাল কে না করে? ইতর ভদ্দর কোন জনটা নয়? রাজ অট্টালিকা থেকে বস্তি বাড়িতেও।...শুধুই কি পুরুষ? মেয়ে মদ্দ সবাই তো।...এই আপনাদের মতো বড় ঘরেও দেখেছি কর্তা-গিন্নী সন্ধেবেলায় বোতল নিয়ে বসেছে। ওটাই তো মান মর্য্যেদা! পয়সা থাকলে দামী বোতল খাবে। খাওয়াটা তো মানার। তবে এখানে অন্য অন্য ফেলাটে এ বাড়ির সাহেবের মতো নিরীহ নীরব দেখি নাই কাউকে। অন্য ফেলাটের সাহেবরা বেহেড হয়ে এসে চেঁচায়, ফাটাফাটি করে, গালমন্দ করে। পরিবারকে ঠ্যাঙায় পর্যন্ত। ইনি তো সে সব না। কিন্তু আপনার মেজাজের সঙ্গে তাল রেখে কেউ কাজ করতে পারবে না তা বলে দিলুম। এই অলকা নস্কর বলেই এতদিন পারলো। চললুম আমি, আমার কাপড়চোপড় নিয়ে!'

'যা যা! বেরো এক্ষুণি, বিদেয় হ।'

বলে হাঁপাতে থাকে পল্লবী!

অলকা স্থিতপ্রজ্ঞভাবে বলে 'সে তো যাচ্ছিই। টেবিলে দুজনার খাবার গুছনো রইলো। ব্যস।'

পল্লবী ওর আঁচল ওড়ানোর ভঙ্গি দেখে হঠাৎ যেন চেতনা ফিরে পেয়ে বলে, 'ব্যস মানে? নিজে খাবি না?'

'আমার খাওয়ার দরকার নেই! কত ফেলাট থেকে আমায় সাধে! এখুনি কোথাও গিয়ে ঢুকে পড়লেই, খাওয়াও জুটবে, থাকাও জুটবে, কাজও জুটবে! এখেনে পড়ে আছি নেহাৎ সাহেবের মায়ায়।'

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে!

পল্লবী সর্পিনীর ভূমিকা থেকে ব্যাঘ্রিনীতে পৌঁছয়।

কী বললি? কী বললি—অ্যাঁ?'

'কী আর বলবো। মানুষটাকে যা খোয়ার যা হ্যানোস্থা করেন আপনি, দেখে দেখে মায়া লাগে! সত্যিকার বড় ভাইয়ের মতন ভক্তি করি, তাই! ঠিক আছে চললুম! কাল একসময় এসে মাইনেটা নিয়ে যাব।'

পল্লবীকে আজ ঝগড়ায় পেয়েছে! তাই আবারও বলে ওঠে, 'ওঃ মাইনে! মাইনে তোকে দিচ্ছে কে? এইভাবে চলে যাচ্ছিস—'

'না দিলে দেবেন না। আর একখানা অলকা খুঁজে বার করুন। তারেই দেবেন।'

বলে তরতরিয়ে বেরিয়ে যায় অলকা।

ভেবেছিল, দিদি বলবে, 'হ্যাঁ, তোকে আমি ছাড়ছি যে। দেখি তো কেমন অন্যখানে যাস।'

এই রকম ঘটনাই তো ঘটে অনেক সময়।

কিন্তু আজ একটু অন্যরকম হয়ে গেল।

আর ওর চলে যাওয়ার পর পল্লবী হঠাৎ যেন বিশ্বভুবন শূন্য দেখলো।

এখন কী হবে? রাত দুপুরে যখন বিপর্যস্ত অবস্থায় ফিরবে কৌশিক! কে সামাল দেবে? কে তাকে হুঁশ ফিরিয়ে খাওয়াবে?

ওঃ! সমস্তই সেই লোকটার জন্যে। ওর জন্যেই ওর বোনের বাড়ি যেতে হয়েছে। আর সেই যাওয়ার ফলেই এত অপমানিত হয়ে ফিরতে হয়েছে।

অপমান!

হ্যাঁ, দারুণ একটা অপমানের জ্বালাতেই জ্বলতে থাকে পল্লবী।·· সে অপমানটা করেছে কৌশিকেরই বোন-ভগ্নিপতি। কতদিন বিয়ে হয়েছে ওর বোনের? বছর ঘুরেছে? মোটেই না। মাত্র তো কয়েক মাস। বড়জোর হয়তো সাত আট কী নমাস।

১৬

কৌশিকের অদৃষ্ট।

আজই সে রাত বেশি হবার আগেই ফিরলো। আজই ক্লাবে গিয়ে খবর পেলো দলের একজন হঠাৎ মারা গেছেন!···কাজেই আড্ডা জমলো না।··· জীবন যে কতো নশ্বর সেই নিয়ে আলোচনা হলো কিছুক্ষণ!···অন্য একজন হাসতে হাসতে বললেন, 'কে বলতে পারে এই আমিই রাতারাতি টেঁসে যেতে পারি কিনা!'

কৌশিক বললো, 'সে কথা সকলেই বলতে পারি আমরা। আমিই বা কেন নয়?'

'নাঃ! তোমার হেলথটা দারুণ! কী ফিগার ব্রাদার। যেন পাথরের স্ট্যাচু!'

অল্প নেশা ধরার মুখে এমন আলগা কথা বেরিয়ে আসে লোকের!

কিন্তু কথাটা একেবারে ফালতু নয়। সত্যিই দেখার মতো স্বাস্থ্য কৌশিকের, ইদানীং যেন আগের থেকে অনেক জৌলুস বেড়েছে!

আর সেই জৌলুসটা আজই যেন পল্লবীর বেশি করে চোখে পড়লো।

আর যেই দেখলো কৌশিক হেডটা হারিয়ে আসেনি, সেই যেন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

দুদুটো অপমানের দাহ তাকে সেই থেকে ক্রমশই উত্তপ্ত করে চলেছে।

তাই 'এক্ষুনি ফেরা হলো যে ?' বলে শুরু করে কোন কথা থেকে যে কোথায় গিয়ে পৌঁছলো।

প্রথম প্রসঙ্গটা বোধহয় ছিলো অলকার ঔদ্ধত্য এবং অ-সভ্যতার প্রতিফলে পল্লবী তাকে দূর করে দিয়েছে। তারপরই হঠাৎ বলে উঠলো, 'তোমার বোনের বিয়ে হয়েছে কতদিন হলো ?'

হচ্ছিল কাজের মেয়ের আসপদ্দার কথা ! হঠাৎ বোনের বিয়ে !

কৌশিক প্রায় হতভম্ব হয়ে বললো, 'সে তো তুমিই ভালো জানো।'

'কেন, তুমি জানো না ?'

'আহা আমায় তো সেই তিথি তারিখ মনে করতে অনেক হিসেব করতে হবে। তোমার স্মৃতিশক্তির কাছে আমি ? আর তুমিই তো ছিলে বিয়ের হর্তাকর্তা বিধাতা ! খুব সম্ভব বিয়েটা শীতকালে হয়েছিলো। বর এসেছিল শাল গায়ে দিয়ে। রোগা টিংটিঙে বর ইয়া চওড়া বর্ডার দেওয়া একখানা শাল গায়ে সামলাতে পারছিল না. দেখে হাসি পাচ্ছিল ! বোঝাই যাচ্ছিল ধার করা শাল !

এই খানেই যেন পল্লবী তার বক্তব্যের ঝুঁটিটা চেপে ধরবার সুযোগ পেলো। · ·এখন আর অগ্নিমূর্তি হয়ে নয়, যেন রণকৌশলে আত্মস্থ।

'কী বললে ? রোগা টিংটিঙে ! হাসি পাচ্ছিল ! রোগা টিংটিঙের ক্যাপাসিটির খবর রাখো !·· হ্যাঁ শীতের সময় বিয়ে হয়েছিলো পঁচিশে জানুয়ারি।···আর এখন ? ফার্স্ট উইক অফ নভেম্বর। অর্থাৎ সাড়ে আট মাস। ইতিমধ্যে তোমার বোন 'মা' হতে চলেছেন ! বুঝলে ? রীতিমত জানান দিয়েছেন !'

কৌশিক ঈষৎ চমকে বলে ওঠে, 'এক্ষুণি ! যাঃ। কে বললো ?'

'বলবার লোকের অভাব আছে ? বলি যাঃ কিসের ? অ্যাঁ ? যাঃ কিসের ? সবাই তোমাদের মতো ?·· তোমরা এই তোমরা ! তুমি আর তোমার সেই প্রাণের বন্ধুটি ! মানিক জোড়। দুদুটোই ঢোঁড়া সাপ। স্রেফ জল-ঢোঁড়া। তা না হলে এত ভাব। রতনে রতন চেনে। অপদার্থ ! অপদার্থ !'

কিছুদিনের জন্য ভুলে যাওয়া খ্যাপামিটা আবার উগ্র করে তোলে পল্লবীকে। ·· অতঃপর সেই থেকে আবার পল্লবী সর্বদা আগুন !

টিঙ্কু নামের সেই মেয়েটা আর পার্থ নামের সেই ছেলেটা, যাদের বসন্তের সোনার দিনগুলো পালিয়ে যাবে—' বলে পল্লবী নিজের লাল মারুতির দাবিটাও —পিছিয়ে দিতে পিছপা হয়নি, তাদের নামে যেন এখন বিষ পল্লবী !

যখন তখন হঠাৎ হঠাৎ বলে ওঠে কৌশিকের সামনে, 'ধন্যি বটে একখানা বোন তোমার। কী বেহায়া ! কী নির্লজ্জ ! কী হ্যাংলা ! আর দুদশটা দিন তর সইল না !···মুখ্যু, মুখ্যু দুটোই একের নম্বরের মুখ্যু ! বলি

জীবনটা কিছুদিন এনজয় করে নিবি তো ?···বিয়ের বছর না ঘুরতেই পায়ে বেড়ি পরলি ? ছিঃ !'

কৌশিক শান্তনুর মতো অত নিরীহ নয়।

একদিন বলে বসেছিলো, 'তবু তো পায়ে সেই বেড়ি পরবার জন্যেই উন্মাদ !'

ব্যস !

বিছানায় আছড়ে পড়ে গড়াগড়ি খেতে থাকে পল্লবী, 'আমি মরবো। আমি মরবো। আমায় ঘুমের বড়ি এনে দাও। এক্ষুণি এক গাদা।'

'এনে দেব ? আমি ? চমৎকার। তারপর পুলিশ এসে আমার হাতে দড়ি পরাক ! কেমন ?'

এইভাবে দিন চলছে।

'একটা চাকরি করবে পল্লবী ?' একদিন বলে বসে কৌশিক !

পল্লবী কড়া গলায় বলে, 'কেন ? সব টাকা মদ খেয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাই-বৌয়ের রোজগার না হলে চলবে না।'

'তোমার মনের চোখ দুটো গড়বার সময় কর্তা কী দারুণ ট্যারা করে বসিয়েছিলেন পল্লবী। হা হা হা। এ আই লক্ষ্মীট্যারা নয়, একেবারে মোক্ষম ট্যারা। সব কিছু এমন বাঁকাভাবে নাও কেন পল্লবী ? তোমার নিজস্ব একটা কর্মজগৎ থাকলে, মনটা ভালো থাকতো !'

'ওঃ, মন ! আমার মন ভালো রাখার চিন্তা। বলি চাকরি আমায় দিচ্ছে কে ? কী কোয়ালিফিকেসান আছে আমার ? অ্যাঁ ?'

কৌশিক বোধহয় ওর উত্তেজনা প্রশমিত করতেই হালকা ভাবে বলে, 'আজকাল এত রকমের কাজ হয়েছে, সবেতেই যে ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি লাগে তা নয়। এমনি সাধারণ গ্র্যাজুয়েট হলে কত কাজ পাওয়া যায়। এই তো পার্থই বা কী ?'

'ওঃ পার্থ। তোমার আদরের বোনাইটি ! কোনো শ্যালাবাবুর পৃষ্ঠবল থাকলে অমন হয়।'

সর্বদা কিছু একটা নিয়েই সংঘর্ষ। উত্তাল, উত্তেজিত !

নিজে ঝগড়া করে এসেছে, মান খুইয়ে যেতে পারছে না অথচ অস্থিরতায় ছটফট করছে। কেমন থাকলো সেই মেয়েটা ? এই কুচুটে বাড়িওলা গিন্নীটি আচার টাচার কী সব বললো, সে সব কিছুই হলো না।

একদিন অধীর হয়ে বলে উঠলো 'আচ্ছা তুমি কী ? হলেও সতাতো বোন, 'তবু ওই একটা মাত্রই তো বোন তোমার ! তার এই খবর শুনে একবার দেখতে যাওয়া কর্তব্য মনে হলো না ?'

'আমি ? একা ?'

'একা না পারো আর্মড গার্ড সঙ্গে নিয়ে যাও।'

'একা মানে?'

'মানে, এ ক্ষেত্রে তুমি সঙ্গে না গেলে—'

'আমি? আমার কী দায় পড়েছে? আমি কে? পর বৈতো নয়। তুমি বড় ভাই!'

'দূর! এখন আমার দ্বারা ওসব হবে না। সে পরে যখন 'মামা' হবো ভাগ্নে, ভাগ্নীর মুখ দেখতে যাওয়া যেতে পারে।'

কিন্তু কৌশিকের ও গা ঝেড়ে দেওয়া কথাটা কী থাকলো শেষ পর্যন্ত?

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত এক ঘটনা সব কিছুর মোড় ঘুরিয়ে দিলো। হঠাৎ একদিন সকালবেলাই হবে কৌশিকের সেই ষণ্ডা গুণ্ডা তিন ভাইয়ের মধ্যে একজন কী ভাবে পল্লবীর এই ফ্ল্যাট খুঁজে বার করে এসে হাজির। বীণাপাণির একখানা চিঠি নিয়ে।

'কী ব্যাপার, কীরে?'

'জানি না! পড়ে দ্যাখো!'

মুখ বন্ধ খামটা এগিয়ে দেয়।

কৌশিক তাড়াতাড়ি মুখ ছিঁড়ে চোখ বুলোয়। ততক্ষণ ছেলেটা বিহ্বল দৃষ্টিতে এদিক ওদিক দেখে। বাবাঃ! দাদা তো দেখছি রীতিমতই বড়লোক।

তা বীণাপাণির চিঠির ভাষাটা বড়লোক ছেলেকে লেখার মতই। লিখেছে, 'বাবা কৌশিক, আজ নিতান্ত বিপদে পড়েই তোমায় এই চিঠি লিখছি। অভাগিনীর কপাল! জানিনা আমার অমন গুণের লক্ষ্মীপ্রতিমা বৌমা কী অপরাধে আমার ওপর বিরূপ হয়েছে। আর আসে না। টিঙ্কুটাকে অত ভালোবাসতো। অথচ তার এই দুঃসময়ে একটু খোঁজ নাও না তোমরা। তা তুমি ভিন্ন তো আমার কেউ নেই, তাই লজ্জার মাথা খেয়ে তোমাকে জানাচ্ছি। টিঙ্কুর বাচ্চা কাচ্চা হবার কথা সামনের মাসের শেষে। কিন্তু অসময়ে শরীর বেতাল হয়ে যাওয়ায়, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ডাক্তার বলছে, তাড়াতাড়ি সিজারিয়ান করে ফেলা দরকার। তাতে যদি প্রাণ দুটোকে রক্ষা করা যায়। কিন্তু সে তো অনেক টাকার ধাক্কা। আমি চোখে অন্ধকার দেখছি। অথচ জামাইয়ের একেবারেই ইচ্ছে নয় তোমায় জানাই। তা অজানিতে চুপি চুপি শাটুলকে পাঠালুম। এখন যা বোঝো করো।'

চির দুঃখিনী
তোমাদের মা

ছেলেদের একটা স্কুলের খাতার পাতা ছিঁড়ে লেখা হয়েছে চিঠিটা। তবে হস্তাক্ষর গোটা গোটা, স্পষ্ট, পরিষ্কার। বক্তব্যের মতোই পরিষ্কার!

কৌশিক ঘরে এসে নীরবে চিঠিটা পল্লবীর দিকে বাড়িয়ে ধরে।…

কার চিঠি? কিসের চিঠি?

'বীণাপাণি মজুমদারের!'

'তার মানে? তা আমায় দেবার কী দরকার? বলেও তাতে গোগ্রাসে চোখটা বুলিয়ে নেয় পল্লবী। আর তারপর হঠাৎ কৌশিকের জামাটা খামচে ধরে তীক্ষ্ণ গলায় বলে ওঠে, 'তবু তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে এখানে বসে আছো?'

১৮

নাঃ! দুটো প্রাণকে রক্ষা করা গেল না।

আপাতত রক্ষা করা গেছে প্রাণ অথবা প্রাণ কণিকাটুকুকে! যে নাকি সময় পূর্ণ হবার আগেই মাতৃগর্ভের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে পড়ে পৃথিবীর আলো দেখতে চেয়ে এই এলোমেলো কাণ্ডটা ঘটিয়ে বসেছে!…

কিন্তু তাজা যে প্রাণটা বাইশ তেইশটা বছর ধরে এই পৃথিবীর জল হাওয়া আকাশ মাটি দূষিত পরিবেশ আর পীড়িত অবস্থার মধ্যেও লড়াই করে টিকে ছিলো প্রাণোচ্ছল হৃদয় নিয়ে, তাকে রক্ষা করা গেল না।

টাকা। অনেক টাকাই খরচ করেছিল কৌশিক! টিঙ্কুর ব্লাডগ্রুপের ব্লাড বোতল বোতল জোগাড়ও করে ফেলেছিল, কিন্তু সবটা কাজে লাগানোর অবকাশই মিললো না।

ধীরে ধীরে অচেতনার হাতে আত্মসমর্পণ করতে হলো তাকে।…

কিন্তু তখন কী তার মধ্যে অভিমানের চেতনা ছিল!

ওর বিছানার ধারে প্রায় আছড়ে পড়া পল্লবীর হাতটায় হাত ঠেকিয়ে অস্পষ্ট স্বরে বলেছিলো, 'ওর জন্যে দুটো মোজা বুনতে ধরেছিলাম—শেষ করা হয়নি—'

আরব্ধ কাজটা শেষ করতে পারেনি, এই আক্ষেপটুকুই তার শেষ কথা!… কিন্তু সেটা জানিয়ে গেল পল্লবীকে!

কেন?

হয়তো চোখের সামনে যে মুখগুলো দেখতে পাচ্ছিলো, তাদের কারো কাছেই প্রত্যাশা ছিল না ওটা শেষ করতে পারবে। শুধু পল্লবী!

যে পল্লবী প্রথম এসেই ডুকরে উঠে বলেছিলো, 'তুই এত নিষ্ঠুর? এতখানি জমিয়ে রেখেছিলি আমার জন্যে। কেন? কেন? এত কী করেছিলাম আমি?'

কিন্তু তারপর থেকেই একদম স্তব্ধ হয়ে বসে থেকেছে পল্লবী পাথরের পুতুলের মতো মৃত্যুপথযাত্রিনীর ক্রমশই পাণ্ডুর হয়ে যাওয়া মুখটার দিকে তাকিয়ে।

পল্লবীর মধ্যে যেন শোণিত প্রবাহের তরঙ্গের সঙ্গে একটা ধ্বনি অবিরাম ধ্বনিত হয়ে চলেছে, 'আমি ! আমিই এই মৃত্যুর জন্যে দায়ী ! আমি খুনী ! …আমি জানি তীব্র হিংসের একটা তীব্র বিষ আছে !'

আমি ওকে হিংসে করেছি। হ্যাঁ, সর্বক্ষণ হিংসে করেছি। যে দুর্লভ ঐশ্বর্যের জন্যে আমি আজ দশ বছর ধরে মাথা খুঁড়ে মরছি, আমি নিজেকে সমাজে হেয় করেছি, নিজেকে নষ্ট করেছি, দু-দুটো পুরুষকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ধিক্কার দিয়ে চলেছি, সেই পরম ঐশ্বর্য ওই তুচ্ছ মেয়েটা এমন অনায়াসে অবলীলায় হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলো, এ দেখে আমি রাগে দুঃখে হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মরেছি। কিন্তু তাই বলে আমি কী এই চেয়েছিলাম ? আমি কী কোনো সময় এদিক থেকে ভেবেছিলাম ?…তবু খুনের দায়টা এড়াতে পারিনা আমি !

আমি খুনি !

ওই নিরীহ নিরপরাধ মেয়েটাকে অলক্ষ্যে বিষ প্রয়োগ করে খুন করে বসেছি আমি। তবু আমি বেঁচে থাকবো ? কোন মুখে ? কোন লজ্জায় ? …ওই পার্থ নামের ছেলেটার মুখের দিকে তাকাতে পারছিনা আমি !…মনে হচ্ছে ও হয়তো বুঝতে পারছে, আমারই বিষনজরে ওর জীবনের আলোটুকু মুছে গেল !

মনের মধ্যে এই শব্দ স্রোত, অথচ বাইরে নিস্তব্ধ নিঃশব্দ !

হঠাৎ এক সময় নার্স এসে রোগিনীর নাক থেকে অক্সিজেনের নলটা খুলে নামিয়ে দিল।

আর সারা ঘরে একটা হাহাকার উঠলো।

বীণাপাণির আর্ত চীৎকারে শোনা গেলো, 'মা ! মাগো ! চলে গেলি ? ওরে আমি কী করে থাকবো রে !'

চলে গেলি !

পল্লবীর যেন তাও সাড় নেই।

চলে গেল মানে ? ওই তো রয়েছে !

একটু পরে কে যেন পিঠে আলতো একটু হাত ছোঁওয়ালে, 'চলো।'

কৌশিক আস্তে গভীর বিষণ্ণ গলায় বললো, 'আমায় তো এখন এখানে থাকতে হবে, কখন ফেরা সম্ভব হবে জানিনা, তুমি থেকে কী করবে ? বাড়ি চলে যাও।'

বোধহয় জীবনে এই প্রথম বিনা প্রতিবাদে কৌশিকের একটা নির্দেশ মানলো

পল্লবী।…আস্তে গাড়িতে গিয়ে উঠলো।…কেমন বোকার মতো তাকিয়ে থেকে বললো, 'এখন ওকে নিয়ে কী করবে তোমরা?'

কৌশিক ক্লান্তভাবে বললো, 'দেখি কি নিয়ম। আমাদের কী করতে হবে!'

'আমি চলে যাব?'

'তুমি থেকে কী করবে? আচ্ছা চলো, তোমায় খানিকটা এগিয়ে দিই। বাড়ি ফিরে একটু রেস্ট নাও গে। গতরাত থেকে একভাবে বসে আছো—'

গাড়িটা স্টার্ট নিলো, আর সেই শব্দটা ছাপিয়ে পল্লবীর ডুকরে ওঠার শব্দ উঠলো, 'তাতেই আমার অপরাধের শাস্তি হয়ে গেলো? আমায় তোমরা পুলিশের হাতে ধরে দেবে না? জেলে দেবে না? ফাঁসির হুকুম দেওয়াবে না? আমি একটা খুনি। শত্তুরকে ঠাণ্ডা মাথায় ধীরে ধীরে খুন করে ফেলার মতো ডেঞ্জারাস খুনী! জানো না, বুঝতে পারছো না, আমার হিংসের বিষেই ও মরে গেলো! কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি বুঝতে পারিনি—'

'ছিঃ! পল্লবী! কী বলছো যা তা! ওর নিয়তি ওকে নিয়ে গেলো! পৃথিবীতে কত লক্ষ কোটি মেয়ে প্রথম মা হতে গিয়ে মারা যায় তার হিসেব জানো?'

'মা হতে গিয়ে মারা যায়?'

'যায় না? জানো না? তবু—তবু—প্রাণটা যেন ফেটে যাচ্ছে পল্লবী! সেই ছোট্ট মেয়েটা—'

দুহাতে মুখটা ঢাকলো কৌশিক।

কিন্তু নার্সিং হোমের গেট ছাড়িয়ে পথে বেরোতেই—শান্তনু। সে এখানে কেন? কী করে এল? কী জন্যে?

গাড়িটাকে ঘ্যাচ করে থামিযে—কৌশিক বলে ওঠে, 'তুই এসে গেছিস? থ্যাংক গড! আশা করিনি তবু ঈশ্বরের নাম ক'রে তোর কলেজে ফোনটা করেছিলাম।—কে একজন বললো, 'এখন ক্লাশে নেই উনি। ফিরলে আপনার মেসেজটা জানাবো—তো এতো তাড়াতাড়ি এসে যাবি—'

ওর মুখ দেখেই শান্তনুর এখানের ঘটনাটা বুঝতে দেরি হয় না। আস্তে বললো, 'রাখতে পারা গেল না? ফেলিওর হতে হতে হলো? অথচ চিকিৎসা বিজ্ঞানের এত উন্নতি হয়েছে আজকাল।'

কৌশিক আস্তে বলে, 'ডাক্তার গোড়া থেকেই বলেছিলো, 'আমরা কিছুই নয়। আমরা শুধু চেষ্টা করতে পারি, এই মাত্র।' কিন্তু তোকে খবর দিয়ে ব্যস্ত করার কারণটা বুঝতে পারছিস না বোধহয়?…আসলে দ্যাখ—এই ভয়ঙ্কর স্যাড ব্যাপারটা চোখের সামনে দেখে পল্লবী এত আপসেট হয়ে পড়েছে যে একা বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। তাই তোর কথাটা মনে পড়লো—'

'কেন? কেন? ও কেন? ও কী টিঙ্কুকে জানে? চেঁচিয়ে ওঠে পল্লবী।'

'জানি বৈকি পল্লু! কত দেখেছি ছেলেবেলায়।'

'তাই? তাহলে তুমিই আমায় থানায় নিয়ে চলো। একটা ডায়েরি করে এসো।...না বুঝে খুন করে ফেললেও একটা খুনের আসামী কী বিনা শাস্তিতে পার পেয়ে যাবে? তা হতে পারে না। তাই হলো শান্তনু!'

মাথাটা ঝুঁকিয়ে গাড়ির মধ্যেই শুয়ে পড়ে।

নাটকের ভাষায় যাকে 'জনান্তিকে' বলে সেইভাবে শান্তনুকে বলে কৌশিক, 'বাড়ি নিয়ে গিয়ে পারিস তো একটা ঘুমের বড়ি খাইয়ে শুইয়ে দেবার চেষ্টা করবি—'

পল্লবী এমনিই ঘুমিয়ে পড়ার মতো তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে বিড় বিড় করে বলে, 'চেষ্টা করতে হবে না। বাড়িতে অনেক অনেক ঘুমের বড়ি আছে! ড্রয়ারে, হ্যান্ডব্যাগে, আলমারিতে—অনে-ক! অনে-ক!'

সর্বনাশ! বলে কী!

দুই বন্ধু পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।...

কৌশিকের দৃষ্টিতে ইশারা, যত তাড়াতাড়ি পারিস খুঁজে দেখে সরিয়ে ফেলিস।...

তারপর আস্তে বলে, 'সবসময় একটা ভুল ধারণা মনে পোষণ করে যন্ত্রণা পায়, এই ওর ব্যাধি!...হঠাৎ ধারণা হয়ে বসেছে টিঙ্কুর এই চলে যাওয়ার মূলে ও দায়ী - '

'কী কী বলছিস? কেন?'

'সে অনেক কথা—পরে শুনিস! এখন আমার আর এক মিনিট দাঁড়াবার সময় নেই।··বিশাল একটা যুদ্ধ অপেক্ষা করছে আমার জন্যে! এদিকে বেচারা পার্থ, ওদিকে মা, তাছাড়া যা কিছু করণীয়—কখনো এরকম পরিস্থিতিতে পড়তে হয়নি ভাই—'

শান্তনু আস্তে বলে, 'তোর এরকম মনে আছে আমাদের এন বি আর স্যারের কথা—'

'এন বি আর?'

'আরে নীরদবরণ রায় স্যার! মনে নেই তোর?'

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ! ক্লাশে সব সময় গল্প করে কাটাতেন।'

'গল্প? তা বলতে পারিস। তবে বেশির ভাগই দার্শনিক দার্শনিক কথা বলতেন। বলতেন, 'জীবন' শব্দটার মূল অর্থ কী জানো? 'মোকাবিলা।' আজীবন সর্বদা সমস্যার সঙ্গে প্রতিকূলতার সঙ্গে আর ভাগ্যের নিষ্ঠুর বঞ্চনার সঙ্গে মোকাবিলা করে চলা। এই! এই হচ্ছে জীবন। তো এই তো গত

বাবার তোর বাবা মারা গেলেন! মৃত্যু আর মৃত্যুর পরবর্তী একটা করণীয় সম্পর্কে সদ্য অভিজ্ঞতা রয়েছে।'

কৌশিক ব্যস্ত অবস্থাতেও আস্তে বলে, 'কিছু মনে করিস না ভাই, বাবা মারা যাওয়ায় তেমন কিছু মন খারাপ হয় নি। চিরকেলে রুগী, বয়েসও হয়েছিলো। …কিন্তু টিঙ্কুকে! ওঃ! তাছাড়া—বলতে গেলে তো সাধারণ মৃত্যু নয়। অপঘাতই। একটা অপারেশন কেস। আমার ওই মস্তান ভাইদের মধ্যে একটি আবার নার্সিং হোমেই চিৎকার ছাড়ছিলো, 'ডাক্তার দিদিকে মেরে ফেললো! ডাক্তারের নামে কেস করতে হবে। ওর ডাক্তারী ব্যবসা ঘুচিয়ে দিতে হবে—' …বহু কষ্টে থামাই তাকে।…জানিস তো এখন আকাশে আগুন বাতাসে আগুন। একবার কথাটা ছড়াতে পারলেই– আচ্ছা, যাচ্ছি।…এই গাড়িটা তো আমার অফিসের, তুই একটা ট্যাক্সি ধর·· ওঃ। তুই যাতে এসেছিস সেটা দাঁড় করিয়ে রেখেছিস? ভালো। তবে আর কী! এমন হেল্পলেস লাগছিল! তোকে দেখে বাঁচলাম!…পল্লবী একটু ওঠো, নেমে এসো! এই গাড়িটা বদল করতে হবে। তুমি এখন শান্তনুর সঙ্গে বাড়ি যাচ্ছো, বুঝলে?'

পল্লবী, তেমনি ঘুম ঘুম ভাবে বলে, 'কার বাড়িতে?'

'কেন তোমার বাড়িতে। নিজের বাড়িতে!'

পল্লবী আর কিছু বলে না। কৌশিকের অফিসের গাড়িটা থেকে নেমে, শান্তনুর ট্যাক্সিতে গিয়ে ওঠে।

কিছুদিন হলো, কৌশিককে তার কোম্পানি সম্পূর্ণ— পুরো সময় ব্যবহারের জন্যে একটা গাড়ি দিয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্য! ইদানীং আর গাড়ি গাড়ি করে পাগল হচ্ছে না পল্লবী। উদাসভাবে বলে, 'কোথায় বা যাবো? বেড়াতে যাবার জায়গাই খুঁজে পাইনা।'

ফ্ল্যাটে এসেই লিফটের মধ্যেই বলে পল্লবী, 'তুমি গিয়ে ডোর বেলটা মেরো শান্তনু, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।'

'কেন তোমার সঙ্গে চাবি নেই?'

'আছে! ব্যাগ হাতড়াতে ভাল লাগছে না!'

বললো বটে আবার নিজেই বেলটা টিপলো।

দরজা খুলে দিলো, নতুন কাজের মেয়েটা। দীপালি! পল্লবীকে দেখেই যেন হাতে চাঁদ পেয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে বলে ওঠে, 'এসেছেন? বাবাঃ, বাঁচলুম! যে অবস্থায় কাল রাত থেকে! সাহেব যেই রাত বারোটা নাগাদ টেলিফোন করে বলে দিলেন, রাতে ফিরতে পারবেন না, তাই না এগারো নম্বর ফ্ল্যাট থেকে আমার মাসিকে ডেকে এনে রাতে থাকতে অনুরোধ করে—'

পল্লবী অসহিষ্ণুভাবে বলে, 'তোমার কাহিনীটা একটু পরে শুনলেও চলবে

দীপালি, আমার কথাটা শোনো—আমি এখন স্নান করতে যাচ্ছি, তুমি ততক্ষণ—'

'এত বেলায়, সন্ধে হয়ে আসছে—চান করবেন?'

'করবো না। সকালে চান করেছি। আমার কথা রাখো। তুমি ততক্ষণ এই এঁকে একটু চা দাও—'

দীপালি দু'পা পিছিয়ে বলে, 'সাহেব ফেরেন নি?'

'ফেরেননি, সে তো দেখতেই পাচ্ছ। তাঁর বোন মারা গেল, আর তিনি এক্ষুণি বাড়ি ফিরবেন?'

'মারা গেল! আহা! ইস!'

'দীপালি, কখনো কাউকে মারা যেতে শোন নি? যা বলছি সেটা শুনবে?'

শান্তনু ব্যস্তভাবে বলে, 'আমার জন্যে তাড়া কী? পরেই হবে।'

'তাড়া নেই? তুমি টিফিন করতে সময় পেয়েছিলে?'

'আরে, আমি আবার কবে সেভাবে টিফিন করি?'

'চা খাও না?'

'তা খাই। তুমি স্নান করে এসো না। এক সঙ্গেই খাবো।'

পল্লবী যেন জুড়িয়ে যায়। বলে 'ঠিক আছে। আমি আসছি—তাড়াতাড়ি আসছি—'

বলেই স্নানের ঘরে চলে যায়।

শান্তনু দীপালির দিকে তাকায়। আচ্ছা সেদিন এসে যে মেয়েটাকে দেখেছিলাম, সে কী এ? কী জানি! এক নজর দেখা বৈ তো নয়। হয়তো সে। হয়তো বা নয়। সে নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বলে, 'কী বলো ওঁকে? মেমসাহেব?'

'না বাবা! বললে মারতে আসে। বলি 'দিদি।'

'তো ওই দিদির ভালো করে কিছু খাওয়া দরকার। কাল রাত থেকে আজ এখন পর্যন্ত কিছু খাওয়া হয়নি—'

'তা আর জানি না?'

অতি প্রগলভা দীপালি বলে ওঠে, 'রাতে চিন্তায় মরি! রুগি দেখতে নার্সিং হোমে ছুটবে তা তো জানি না। দুমানুষের রাতে খাবার জন্যে মাছের কচুরি বানিয়ে ছিলুম, আর চিকেন কারি তো সব পড়ে রইলো—'

'ঠিক আছে। এখন চায়ের সঙ্গে যা দেবার, দেবে!

'আর আপনাকে?'

'সে যা হয় হবে!'

'দিদি আসুক। আগে থেকে গুছিয়ে রাখলে, খাবে কিনা কে জানে। আপনি ওনার কে হন? আগে তো কখনো দেখি নি!'

শান্তনু ওই 'কে হন?' প্রশ্নটার উত্তর এড়াতে তাড়াতাড়ি বলে, 'কতদিন আছো এখানে?'

'এই তো কমাস।'

সেও তো উত্তরটাকে ঝাপসা রাখে। কমাস মোটেই নয়, হয়তো সপ্তাহ তিনেক আছে!

'দিদি আসুক বললেও দীপালি দু প্রস্থ চা, টোস্ট, ডিম সেদ্ধ, পটেটো চিপস সাজিয়ে রাখলো টেবিলে একটা ট্রে করে।

কি ভাগ্যি পল্লবী এসে বসে বললো, 'গুড! চা বেশি আছে তো?'

বলে কেটলির মাথা থেকে 'টী কোজি'-টা তুলতে তুলতে বলে, 'তোমাকে আর দুটো টোস্ট দেবে?'

শান্তনু একটু হেসে বলে, 'সেটা নিজেকে জিজ্ঞেস করো! তোমারই কখন থেকে খাওয়া হয়নি। আমি তো—'

'ঠিক আছে। আমার আর লাগবে না।' বলে প্রথম কাপটা শান্তনুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, 'ও চেয়ারটায় বসেছ কেন শান্তনু? এই দিকের এইটা তোমার!'

১৯

ঘুমের ওষুধ খাওয়াতে হয়নি। চা খেয়েই অনায়াসে ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো পল্লবী!...অনভ্যস্ত কষ্টের অবস্থা! ক্লান্তি, উপোস আর শোক। তিন মিলিয়ে কী তীব্রভাবেই পল্লবীকে ভারাক্রান্ত করে বিছানার দিকে টানছিলো।

এখন!

গভীর শ্রান্ত ঘুম!

যখন ঘুমোচ্ছিল, শান্তনু নিঃশব্দে খুঁজতে লাগলো পল্লবীর ঘোষিত ঘুমের বড়িগুলি। ড্রয়ারে, আলমারিতে, বইয়ের র‍্যাকে, বইয়ে থাকের পিছনে। জানা জায়গা।

এই সবই তো পল্লবীর যে কোনো গোপনীয় জিনিস রাখবার ঠাঁই।

আলমারির চাবি?

সে-ও তো জানা। বড় আলমারির পিছনের দেওয়ালেই তো একটা হুক-এ চাবির থোকা ঝোলানো থাকে পল্লবীর! বরাবর একই জায়গায়।

শোবার ঘরটা অবাক হয়ে দেখতে থাকে শান্তনু। ঠিক যেমন ছিল, তেমনই

আছে। এমন কি বুক শেলফটার ওপর কাশ্মীরি কাজ-করা সুন্দর কাঠের ফটো স্ট্যান্ডটাও বসানো রয়েছে শান্তনু আর পল্লবীর যুগল ফটোখানা সমেত।

বিয়ের কিছুদিন পরে যে ছবিটা শান্তনু তুলিয়েছিলো নাম-করা একটা দামি স্টুডিওয় গিয়ে!

দৈবাৎ যদি অচেনা কেউ আসে এ ঘরে? কী জবাব দেয় পল্লবী?

এই রাখাটা কী কৌশিকের উদারতার না পল্লবীর জেদের ফসল?

কি অদ্ভুত একটা পরিস্থিতিতে পড়ে শান্তনু এই তার চিরপরিচিত দৃশ্যের মাঝখানে এসে বসে আছে!

বিছানার ওপর সেই অসময়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়া পল্লবী। হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করেছে। শান্তনু ওর গায়ে একখানা চাদর ঢাকা দিয়েছে, যেমন আগে দিত।

ক্লান্ত হয়ে যেত তো পল্লবী শপিং করে এসেও। গানের জলসা থেকে এসেও, এমন কী কোনো চিত্র প্রদর্শনীতে বা আর্ট গ্যালারি ঘুরেও।···

এই ভাবেই ঘুমিয়ে পড়তো আলুথালু ভাবে।···তবু কেন ঘুমের বড়ির দরকার হয় পল্লবীর?

এখনো এত জমিয়ে রাখার উদ্দেশ্য কী?

সেই ওর চিরদিনের প্রবণতা? চিরকাল কে যেন ওকে সর্বদা আত্মহত্যার প্ররোচনা দিয়ে চলে! আর সর্বদাই ওর আপনজনেদের ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতে হয়।

২০

পল্লবীর যখন ঘুম ভাঙলো, হঠাৎ ভাবলো কোথায় আছি? তারপরই চোখ মেলে দেখলো, চিরপরিচিত জায়গাতেই তো রয়েছি।

কিন্তু কখন শুয়েছি? এখন আলো জ্বলছে কেন ঘরে।·· ওঃ! সেই তখন স্নান করে চা খেয়ে ঘরে এসে শুয়ে পড়েছিলো! এখন সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে!

কিন্তু চাদরটা কে গায়ে দিয়ে দিলো? আর সামনে ওই সোফাটায় শুয়ে কে অমন ক্লান্ত ভাবে।···

শান্তনু! শান্তনু শুয়ে আছে এখানে? সত্যিকার শান্তনু? শান্তনুর শুয়ে পড়ার ভঙ্গিটা তো ভুল হবার নয়।

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে পল্লবী। তারপর আস্তে আস্তে সব

মনে পড়ে যায়!...মনে পড়ে যায় টিংকু নামের মেয়েটার সেই স্থির হয়ে যাওয়া শরীরটা!

খুব একটা কষ্ট হলো! আবারও ভাবলো, সত্যিই কি মানুষের হিংসের মধ্যে এমন বিষ থাকতে পারে, যাতে একটা জলজ্যান্ত মানুষের মৃত্যু ঘটে যায়?

মনকে শক্ত করতে চেষ্টা করলো।

তাই কখনো সম্ভব?

ওটা আমার দুর্বল মনের কুসংস্কার। কৌশিক বলেছিলো, 'পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মেয়ে মা হবার সময় মারা পড়ে।'

ইস! পল্লবীকে ভাগ্যিস 'মা' হতে হয়নি।

তাহলে এই পৃথিবীর এই ভালোবাসার জনেদের ছেড়ে চলে যেতে হতো!

এত মন খারাপ, তবু যেন হঠাৎ মনটা কেমন হালকা লাগছে। আর—আর কী রকম একটা ভালোলাগা ভালোলাগা ভাব।

শান্তনু ওই সোফাটায় শুয়ে আছে। চোখে আলো লাগলে যেমন চোখে হাত চাপা দিয়ে শুতো, ঠিক সেই ভাবে।

কত কত দিন এই দৃশ্যটা দেখেনি পল্লবী। কত কত দিন পরে দেখলো।

সন্ধ্যে হওয়া মাত্র ঘরে ঘরে একবার আলো জ্বেলে দেওয়াটা নিয়ম দীপালির!...জ্বালার পর শান্তনু পল্লবীর ঘুম ভেঙে যাবার ভয়ে নেভাতে গিয়েছিল! কী ভেবে নেভালো না। বোধহয় ভাবলো, অবেলায় বেশি ঘুমনো ভালো নয়।

অথচ সেই ওঠার পর নিজেই শুয়ে পড়লো, আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লো!

পল্লবী খাট থেকে নামলো! নিজের গায়ের সেই চাদরখানা নিয়েই আস্তে শান্তনুর গায়ে ঢাকা দিয়ে দিলো।...তাকিয়ে থাকলো।

কপালটায় একবার হাত বুলিয়ে দিতে ইচ্ছে করলো। খুব ইচ্ছে।

তো পল্লবীর কপাল!

সেই আলতো ভাবে রাখা একটু হাতের স্পর্শেই ঘুমটা ভেঙে গেলো শান্তনুর।

আসলে ঘুমটা তো গভীর ছিলো না।

শান্তনু চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলো।

যেন ভয়ানক আশ্চর্য একটা জিনিস দেখতে পেয়েছে।...এই আনত চোখ দুটো কী শান্তনুর চেনা?

আস্তে কপালে রাখা হাতখানার ওপর একখানা হাত রাখলো।

আর সেই মুহূর্তে সেই হাতের মালিক শান্তনুর গায়ের ওপর হুমড়ে পড়ে রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলো, 'শান্তনু! শান্তনু!...আমার কী হবে? আমি কী করবো?'

২১

শান্তনু সেদিন কৌশিককে বলেছিলো, 'আজকাল বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে ?'

কথাটা ভুল নয় ! অন্তত অনেক ক্ষেত্রেই ।

আস্ত একটা মানুষকে সে বাঁচাতে পারলোনা সেদিন, কিন্তু তার দেহ কোটর থেকে বার করে আনা সেই 'অতি ক্ষীণ' প্রাণকণিকাটুকুকে এ যুগের বিজ্ঞান বাঁচিয়ে তুললো । আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে !

সেই আগেকার আমলে হলে, অকালে পৃথিবীর আলো দেখতে চেয়ে তার জননীটিকেই পৃথিবীর আলো থেকে বিদায় করে দেওয়া বেয়াদপ ওই প্রাণীটাকে কে জমার খাতায় তুলতে যেতো ?···তখুনিই তো খরচের খাতায় ফেলে দিতো ।

হয়তো—

নিতান্ত অবোধ অশিক্ষিত ধাইয়ের হাতে ন্যাকড়ার পলতে করে মধু খেয়ে খেয়ে দু-একটা দিন টিকে থাকবার চেষ্টা করতো !

তারপর ?

তারপর এই অন্যায় বেয়াদপির খেসারত দিতে একসময় হার মেনে আবার অন্ধকার ভুবনে তলিয়ে যেতো ।

কিন্তু এ যুগ ?

তাকে টিকিয়ে রাখছে ।

প্রতিক্ষণ নজর রেখে, আস্তে আস্তে তাকে জিইয়ে তুলছে । সে না কী অসাধারণ সব প্রক্রিয়ায় ।

অন্তত সুদেষ্ণার সেই অকালজাত ছেলেটাকে জিইয়ে তুললো এ যুগের বিজ্ঞান । টিকিয়ে রাখলো ।

তাকে চাকচিক্য দিলো ।

লাবণ্য দিলো ।

দিলো দিব্যি প্রাণশক্তি !

ওই ছেলেটার টিকে যাওয়া প্রায় অভাবিত, অবিশ্বাস্য !

অবশ্য বীণাপানির ভাষায়—'রাখে কেষ্ট মারে কে ?'

কেষ্ট 'রেখেছেন' ! শুনে ছুটে তাকে দেখতে যাবে না পল্লবী ? কিন্তু যাবার সাহসও তো হচ্ছে না ।

তাই ছটফট করে। বলে, 'কৌশিক, আমি দেখতে গেলে কী তার অমঙ্গল হবে?'

'কী যে বল পল্লবী? মাথাটা কী তোমার পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেছে?'

'কেউ বকবে না?'

'কে বকবে?'

'ধরো তোমার মা!'

'ভুল ধারণাগুলো ছাড়ো পল্লবী। তুমি যাচ্ছো না দেখেই মা দুঃখিত। তোমার শরীর খারাপ বলে বলে চালিয়ে চলেছি।'

'আর পার্থ?'

'পার্থ! সে বড় ভালো ছেলে পল্লবী। তার সম্বন্ধে তুমি কোনো ভুল ধারণা গড়ে রেখো না।'

'কিন্তু তুমি আগে যাও। বলেছিলে, যখন মামা হবে ভাগ্নের মুখ দেখতে যাবে।'

'আমি একা যাব না। তুমিও যাবে! সাংসারিক নিয়মে সে তোমার ভাগ্নে।'

'তাহলে আমায় নিয়ে যাবে?'

'তবু সন্দেহ?'

'না, না! সন্দেহ না। কবে নিয়ে যাবে?'

'এখনি বলো তো এখনি!'

'বাঃ! মুখ দেখার জিনিস কই?

'সে তো যাবার সময়ই নিয়ে যাওয়া যায়। কী দিতে চাও বলো। গহনা? টাকা? খেলনা? না না, খেলনা নিয়ে কী করবে সে এখন? মাত্র তো তিনমাস বয়েস হলো।'

'গহনা। গহনাই তো ঠিক। হার, বালা—'

'কিন্তু আছে কোথায় এখন সে ছেলে?'

'কোথায় আর? তার বাপের কাছেই। পার্থ কী তাকে চোখ ছাড়া করতে পারে? তবে অসুবিধে বীণাপাণির। মায়ার দায়ে অবশ্যই, তবে বলতে গেলে চক্ষুলজ্জার দায়েই প্রধানত, নিজের সংসার ভাসিয়ে জামাইবাড়ি পড়ে থাকতে হচ্ছে, নাতি দেখতে।...তাই কী সহজ সাধারণ?

নার্সিংহোম থেকে ছেলেকে ছাড়বার সময় এতরকম নানাখানা নিয়ম নির্দেশ দিয়েছে, ছেলের তদারকিতে মাথা গুলিয়ে যায় বীণাপাণির।

উপায় নেই।

'মেয়ের স্মৃতি চিহ্ন' বলে তো বটেই, মানবিকতার দায়েও। এবং ওই যা বলা হয়েছে, চক্ষুলজ্জাতেও।

এখন বড়ছেলের ওপর একটু চাপা রাগও হয়। তোমরাই তো সাত তাড়াতাড়ি

মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দিলি ! দেখলি না বরের তিনকুলে কেউ আছে কি না। এখন মরুক বীণাপাণি ! টাকাকড়ি দিচ্ছে বটে সেই ছেলেই, কিন্তু শুধু টাকায় কী হয় ? লোক রাখতে বলে বটে কিন্তু ভালো লোক আজকাল মেলে ?

আর মিললেই টেকে ?

কেবল আপন মনে গজ গজ করা।

এ হেন সময় হঠাৎ একদিন ছেলে-বৌ যুগলে।

বৌ তো দিব্যি রয়েছে অথচ ছেলে কেবলই বলেছে, শরীর খারাপ। সবই বানানো গপ্পো।

বুঝতে বাকি নেই বীণাপাণির।

তা সত্ত্বেও, ওরা আসা মাত্রই ব্যস্তভাবে বৌয়ের কুশল প্রশ্ন করতেই হয়, মনে যে ভাবেই থাক।

তবে —পরক্ষণেই বেজার ভাব চলে যায়।

সোনা জিনিসটা বড় দামী। আর বিরূপতা দূর করার একটি ভেষজ।

সোনার হার-বালা দেখে বীণাপাণি প্রথমটা অবাকই হলো। কারণ এটা অভাবিত। তারপরেই মেয়ের নাম করে ডুকরে ওঠে।

'ওরে দেখে যা তোর খোকার আদর !'

খোকা চিরন্তন ওই সম্ভাষণই চলছে।

পল্লবীও তাই বললো।

পার্থ যেখানে বসেছিল, সেখানে গিয়ে তার কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে ডাকলো, 'পার্থ !'

পার্থ টের পেয়েছিলো এরা এসেছে, তবু একাই বসেছিল।

এখন মুখ তুলে তাকালো।

পল্লবী খুব মৃদু গলায় বললো, 'পার্থ, একটা জিনিস আমায় খুঁজে দিতে পারবে ?'

প্রশ্নটা অপ্রত্যাশিত।

পার্থ শুধু প্রশ্নের দৃষ্টিতে তাকালো।

পল্পবী আরো মৃদু হলো, 'ও বলেছিলো, ওর খোকার জন্যে এক জোড়া মোজা বুনতে ধরেছিলো, শেষ করা হয়নি। সেটা খুঁজে দেখবে ?'

পার্থও মৃদুতর।

'খুঁজে দেখতে হবে না। কাছেই আছে। আমাকেও বলেছিলো, মোজাটা বুনে শেষ করে দেবার জন্যে আপনাকে বলতে !'

'বলেছিল ? অ্যাঁ, এই কথা বলেছিল ? পার্থ ! কই, আমায় তো বল নি ! তার মানে সে আমায় ক্ষমা করে গেছে, তুমি পারো নি ?'

'এ কথা বলবেন না !'

পার্থ বলে, 'ক্ষমার কথা কেন ? আমরা তো জানতাম আপনি ওকে কী ভালোবাসতেন। সেদিন রেগে গিয়েছিলেন, অন্যের কাছে ওর খবরটা পেয়ে। কিন্তু ও যে লজ্জায় নিজে মুখে—'

একটু থেমে বলে, 'মোজার কথা বলিনি। কারণ ভাবিনি ওটার দরকার হবে।'

পল্লবী ঠিক তার পিতামহীর ভঙ্গিতে বলে ওঠে, ষাট ষাট—'

ছোট্ট একটা বেতের ঝাঁপির মধ্যে টিস্কুর বোনার সরঞ্জাম ভরা ছিল। দেখা গেল শুধু মোজাই নয়, একটা টুপিও ধরেছিল।

তার সঙ্গে আরো কিছু উলের গোলা।

তার মানে ভাবী শিশুর জন্যে অনেক কিছু তৈরী করে রাখার বাসনা ছিল তার।

অনেক অনেক মেয়ের মতোই, অনেক বাসনা অপূর্ণ রেখে চলে যেতে হলো তাকে।

পার্থ বললো, 'শুধু মোজার কথাই নয়, একেবারে শেষকালে ও আপনার পর আরো ভার চাপাবার কথাও বলে গেছলো বৌদি।'

'কী ? কী ? বলছো না কেন পার্থ ? বলো—'

বলেছিলো পার্থ ! সকলের সামনেই বলেছিলো। বলেছিলো, সুদেষ্ণা, খুব কষ্টের সময় বলেছিলো, যদি সে নিজে না বাঁচে, যে আসছে, তাকে যেন পল্লবীর হাতে তুলে দেওয়া হয়।···পল্লবী তাকে ঠিক বাঁচিয়ে রাখবে, টিকিয়ে রাখবে।

'এই কথা বলে গেছে সুদেষ্ণা ? পার্থ ! আমার হাতে তুলে দিতে ওকে ! আমাকে বিশ্বাস করতে পারবে তোমরা ? ওর গায়ে আমাকে হাত ঠেকাতে দেবে ? আমি তো অপয়া, আমি অমঙ্গলের প্রতীক ! তবু দেবে ?'

ডুকরে ওঠে পল্লবী।

শুনে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কৌশিক। পল্লবীর মুখের দিকে তাকায়। পল্লবী হাসছে, না কাঁদছে ? না কী অবিশ্বাস্য একটা সৌভাগ্যের খবরে দিশেহারা হয়ে বুঝতে পারছে না কী করবে ;

ঝানু সংসারী বীণাপাণি বলে ওঠে, 'ও কী কথা বৌমা ? তুমি যদি ওকে নিতে রাজী হও, তার থেকে ভালো আর কী আছে বৌমা ? ও তো তাহলে বর্তে যাবে।···আর আমি তো বটেই, পার্থও পরম নিশ্চিন্ত হবে। কৌশিক, তোর কী মত ?'

'আমার ? আমার আবার কী মত ? তোমরা যা ভালো বুঝবে। আর পার্থ যদি বাচ্চাটাকে ছেড়ে থাকতে পারে, তাহলে তো পলুই বর্তে যাবে, কৃতার্থ হয়ে যাবে !'

২২

কিন্তু পার্থ ওই ছেড়ে থাকতে পারার প্রশ্নটা তুলতেই দিলো না। বললো 'আমি ওকে কোলে নিয়ে বসে থাকলেই কী ওর জীবন রক্ষা হবে? না কী আমারই জীবন রক্ষা হবে? আপনাদের কাছে থাকলে—'

একটু থেমে বললো, 'কোনো ভীষণ দামী জিনিস ব্যাঙ্ক লকারে' রাখতে পেলে মানুষ যেমন নিশ্চিন্ত থাকে, সেই ভাবেই থাকবো।···তাছাড়া ওকে নিয়ে তো দূরে কোথাও চলে যাবেন না এপাড়া ওপাড়া। ইচ্ছে হলেই তো দেখতে পাওয়া যাবে।'

পল্লবী বলে ওঠে, 'রোজই দেখতে যাবে পার্থ! অফিসে তো জয়েন করবে। রোজই অফিস ফেরত 'ওর' সঙ্গে আমার কাছেই চলে আসতে পারবে।'

'ওর' মানে অবশ্য কৌশিকের সঙ্গে!

কৌশিক অফিসের গাড়িতেই তো আসে।

বীণাপাণি ওই একটা সমস্যা সঙ্কুল ভবিষ্যতের আশাবিহীন, তার ভাষায় 'ঘিন ঘিনে' বাচ্চাকে পালন করার দায় থেকে মুক্ত হতে পেরে যেন হাঁফ ফেলে বাঁচলো! তবু আঁচলে চোখ মুছলো। বললো, 'যাও দাদু, ভালো মামার বাড়ি যাও' সেখানে কত আদর পাবে, কত আরাম যত্নে থাকবে। গরীব দিদিমাকে ভুলেই যাবে! তবু আমার প্রাণের টান—'

যেন সেই শিশুটা তার 'দিদিমা'কে চিনে বসে প্রাণে প্রাণে ভালোবেসে বসে আছে।

ছেলের সঙ্গে কাঁথাকানি বালিশ বিছানা গুছিয়ে সঙ্গে দিতে আসে বীণাপাণি গাড়ির কাছে।

পল্লবী সেই জিনিসগুলোর চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলে, 'থাক থাক ওসব দিতে হবে না। আমি সব কিনে নেবো।'

'সব কিনে নেবে? এখুনি?'

'হ্যা, হ্যা

'তা কাজললতাখানা অন্তত নাও। এ জিনিস তো বাজারে মিলবে না না! আমি নিজের হাতে বানিয়েছি মনসাপাতায় ভূষো পরিয়ে—'

পল্লবী বলে, আজকাল আর বাচ্চাদের কাজল পরানোর নিয়ম নেই মা। ডাক্তাররা বারণ করে।'

'ও মা! বল কী বৌমা? দুধের বাচ্চারা কাজল চোখে দেবে না? চোখ ভালো থাকবে তাতে?…বলি বাচ্চাদের মা ঠাকুমাদেরও তো চোখে থ্যাবড়া করে কাজল পড়তে দেখি গো! কাজললতাখানা সঙ্গে না রাখলে—ছেলেকে বিঘ্ন-বিপদ থেকে রক্ষা করবে কে? কাজললতা হলো মা ষষ্ঠির 'অভয়!' ছেলে যখনই ঘুমোবে তার শিয়রে কাজললতা রাখতে হয় না?'

'তাই? তাহলে দিন! কীভাবে রাখতে হয়?'

'ওমা শোনো কথা! কখনো দেখোও নি? মাথার বালিশের তলায়—'

কৌশিক অলক্ষ্যে পল্লবীর বাহুমূলে একটা সূক্ষ্ম চিমটি কেটে বলে ওঠে, 'ঠিক আছে। তুমি যা বলেছো, তাই হবে। এখনকার মেয়েরা কি আর তোমার মতো এত সব জানে?—আচ্ছা তাহলে—'

ওই এখনকার মেয়েদের নস্যাৎ করা কথাটা কী পল্লবীর কানে ঢুকলো? ঢুকলে কী রক্ষা থাকতো?

পল্লবীর সমস্ত অনুভব অনুভূতি এখন কী এক মহা সমুদ্রের স্রোতে ভেসে যেতে বসে নি?

কোন বীরযোদ্ধা যখন একটা বিশাল সাম্রাজ্য জয় করে সেই জয় গৌরবের আলো মুখে মেখে দেশে ফেরে, সেই আলো পল্লবীর মুখের রেখায় চোখের দীপ্তিতে! পল্লবীর সারা শরীরে কী অপূর্ব রোমাঞ্চ।

একটা তোয়ালে মোড়া শাল ঢাকা শিশুকে বুকে চেপে গাড়িতে উঠতে এই অনির্বচনীয় সুধাস্বাদে ভুবন ভয়ে যায়?

অথচ মন বিষাদে ভারাক্রান্ত।

যেন চুরি করা কোনো ঐশ্চর্য পল্লবীর বুকের উষ্ণতায় ধরা দিয়েছে।

তবু পার্থ সঙ্গে আছে, এই ভালো।

বীণাপাণিকে বলা হয়েছিল, তুমিও চলো না সঙ্গে।

বীণাপাণি চোখ মুছতে মুছতে বলেছে, 'না বাবা, ছিষ্টি সংসার আতান্তরে পড়ে। আজ কতটা দিন সংসার ছেড়ে এখানে পড়ে আছি। নিজের সংসারের দিকে তাকাতে সময় পাইনি! পরে কোনো দিন আমায় দেখিয়ে নিয়ে যেও!'

শুনে অবশ্য পল্লবী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিলো। এ জিনিস একা তার।

২৩

তারপর ?

তারপর শুরু হয়ে যায় পল্লবীর আতিশয্যের পাগলামি।

পাঁচ সাতটা শিশু প্রতিপালিত হবার মতো জিনিসপত্র এসে হাজির হয় সঙ্গে সঙ্গে।

আর ক্রমশ সেই সঞ্চয় বেড়েই চলে!

পার্থ মাঝে মাঝে বলে, 'একটা বাচ্চা মানুষ করতে এত সব লাগে? ও দাদা! ছেলেটা যে নেহাত গরীবের ছেলে।'

কৌশিক বলে, 'ও কথা ভুলে যাও ব্রাদার! ওর বিধাতা ওর কাছ থেকে হীরকখণ্ডটি লুট করে সরিয়ে ফেলে, অবিরত ঝকঝকে কাচের টুকরোর জোগান দিয়ে চলেছেন, কৃতকর্মের ত্রুটি ঢাকতে।

সেই কাচের টুকরোর জোগানদারের মনে আত্মতৃপ্তি, হীরের বিকল্প পেয়ে যাচ্ছে ছেলেটা।'

এদিকে পল্লবীর দিন কাটতে থাকে একটা নেশার ঘোরে। আর?…আর অনিন্দ্যসুন্দর একটি ছন্দে।

ছেলেটাতো দেবতার দানই।

পল্লবীর হাতে দেবতা নিজে হাতে তুলে দিয়েছেন।

ঘটাটা জোরই করতে চায় পল্লবী। নেমন্তন্নর লিস্ট বানাতে বসেই কৌশিককে বলে ওঠে 'তোমার সেই নাক উঁচু বন্ধুটার নামটা রাখা হবে লিস্টে?

'নাক উঁচু? আমার আবার নাক উঁচু বন্ধু কে?'

'কেন? তোমার প্রাণের শান্তনু নাক উঁচু নয়? এত বন্ধু, তোমার ভাগ্নেটাকে একবার দেখতে এলো না!'

'বাঃ ওতো এখানে নেইই এখন।'

'নেই মানে।'

'ও তো গত জুন মাস থেকে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করেছে।'

'অ্যাঁ! তোমায় একবার জানানোও দরকার মনে করলো না।'

'আমায় জানিয়েছিল ফোনে। হঠাৎই অফারটা পেয়ে গিয়েছিল। আর তুমি তো তখন তোমার দেবদত্তকে নিয়ে মশগুল। শুনে বলেছিলো, এখন জয়েনটা করে ফেলি গে, দু দিনের নোটিশে ছুটছি। পুজোর ছুটিতে এসে যশোদা-জননীকে দেখে আসবো।'

'পুজোর ছুটিতে ?'

'মানে সেই অক্টোবরে ?'

এখন এই এতো ঘটা, পল্লবীর এই গৌরবময় ভূমিকাটা একবার দেখতে আসবে না ?

পল্লবী জেদ ধরলো, 'তুমি লিখে দাও—দু দিনের ছুটি নিয়ে উৎসবের দিনটায় চলে আসতে।'

কিন্তু এলো না।

মানে আসতে পারলো না।

ঠিক সেই সময়েই ওর ওখানে বিশেষ মিটিং।

অতএব ফালতু লোকে ভরে গেল প্যান্ডেল, ভোজসভা! আসল লোকটা বাদে। এলো পুষ্প খেমানির বাপের বাড়ির গুষ্টি।

আর তারা সব দেখেশুনেই বোধহয় তাদের মজ্জাগত বেনেতি বুদ্ধিটি পার্থ নামক অবোধ ছেলেটার ফাঁকা মগজটায় ঠেসে ভরে দিলো। তারই প্রতিক্রিয়ায়—

উৎসব অন্তে—যখন পল্লবী অনেক পেয়েও শূন্য হৃদয় নিয়ে বসে রয়েছে, পার্থ এসে বললো, পুষ্প বলছিলো, আপনারা কী খোকনকে দত্তক নিয়েছেন, মানে আইনসঙ্গত ভাবে—।'

'দত্তক! কী আশ্চর্য। কাগজে-কলমে আইনসঙ্গত ভাবে? তুমি জানো না? বললে না তাকে সেকথা? ওতো দেবতার দান। তাই দেবদত্ত। আলদা করে আবার কী দত্তক নেবো!'

পার্থ অপ্রতিভভাবে বলে, 'বলেছি সেকথা। তবে বলেছিলো, সংসার বড় কঠিন জায়গা। এখানে শুধু মৌখিক গ্যারান্টিতে কোন কাজ হতে পারে না। এখন তো ও আপনাদের কাছে রাজার হালে মানুষ হচ্ছে, হবেও কিন্তু দৈবাৎ যদি পরে আপনার নিজের কোন সন্তান হয়—'

'আমার! পার্থ, তুমি কী পাগল হয়েছো? আমার এই এতদিনেও হলো না—'

'সেও বলেছিলাম। বলে কিনা জগতে এমন ঘটনা বিরল নয়। বিয়ের কুড়ি বছর পরেও হয়। বলছে, দত্তক নেন তো নিন। নইলে ভবিষ্যতে প্রবলেম হবে।'

'কী যে বলো পার্থ। নিজের জিনিসকে নতুন করে আইন আদালত করে নিজের করতে হবে?' তুমি নিজে বলোনি যে শেষ কালে বলে গিয়েছিলো—'

পার্থ চুপ হয়ে গেল।

কৌশিক বাড়ি ফেরার পর পল্লবী তার কাছে হেসে হেসে পুষ্পর মানু বেনেতি বুদ্ধির গল্প করে হাসাহাসি করলো। বললো ওদের বাবা হাড়েমজ্জায় বিজনেস।'

তারপরই হঠাৎ বললো, কৌশিক, তোমার কী বিশ্বাস এত বয়সেও মা হওয়া যায় ?'

'বয়েস ? তোমার আবার বয়েসটা কী ? তেত্রিশ চৌত্রিশ না ? আরে বাবা আমার এক পিসি আটচল্লিশ বছরে একখানা ভোঁদড়মার্কা ছেলে ভূমিষ্ঠ করেছিলেন।'

পিসির যে চালু মেশিন ছিলো, তার আগে আরো গুটি আষ্টেককে ভূমিষ্ঠ করেছিলেন. সেটা খেয়াল হলো না কৌশিকের।

এই আলোচনার মধ্যে পল্লবী হঠাৎ বলে ওঠে, 'দেখ কৌশিক, আগে সব সময় মরতে ইচ্ছে করতো। কিন্তু দেবুকে পেয়ে পর্যন্ত মরতে বড় ভয় করে। আমি মরে গেলে ওর কী হবে ?'

'তা হঠাৎ তোমায় এখন কে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা দিলো ?'

'না ! মানে তুমি ভয় দেখালে কি না আমার এখনো মা হবার যথেষ্ট সময় আছে। এমন কী আটচল্লিশ বছর বয়সেও '

কৌশিকের মুখে একটা বিদ্রূপ মাখানো কৌতুকের হাসি ফুটে ওঠে।

তারপর শান্ত ভাবে বলে, 'সে ভয় আর তোমার নেই পল্লবী। কোনোদিনই ছিলো না। এই অমোঘ খবরটা চিরদিন তোমার কাছে চেপে এসেছে শান্তনু। অগত্যা ওর অনুরোধে আমিও। তোমার শরীর যন্ত্রে 'মা' হতে পারার ক্ষমতার একান্ত ঘাটতি। ডাক্তারের সেই 'জবাব' দেওয়া দলিলখানা শান্তনুর কাছে আছে। রাবণ রাজা যেমন নিজের মৃত্যুবাণটা পরম যত্নে লুকিয়ে রেখেছিলো. তাই রেখেছে। অর্থাৎ নিজেকেই চিরদিন কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছে।'

পল্লবী অবাক হয়ে কৌশিকের কথা বলা মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন অন্য ভাষা শুনছে। যেন সবটা মন দিয়ে না শোনা পর্যন্ত বোধগম্য হবে না।

সবটা শুনে বলে, 'কৌশিক, একথা আমায় বিশ্বাস করতে বলছো ?'

'বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছে। তবে দিস ইজ আ ফ্যাক্ট। অমোঘ সত্য পল্লবী।'

এর কারণ ?'

'কারণ ? কেবলমাত্র ভালোবাসা পল্লবী। বলতে পারেনি তোমার মনকে আহত করার ভয়ে। ও যে তোমাকে কী প্রচণ্ড ভালোবাসে পল্লবী তুমি জানো না।'

২৫

পল্লবী যেন তার স্বপ্নের ঘোর থেকে বাস্তবের মাটিতে পা দেয়। আস্তে বলে, 'কিন্তু তুমিও তো সেই আসামীর ভূমিকাতেই রয়ে গেছো কৌশিক। তুমি কী জন্যেও?'

'আমি?

কৌশিক একটু হাসে। বলে, 'আমারও হয়তো একই কারণ। তবে ভালোবাসার পাত্রটির বদল আছে পল্লবী। ওই অসাধারণ হৃদয়বান, অসাধারণ ভদ্র-মার্জিত, সভ্য সুন্দর লোকটাকে প্রচণ্ড ভালোবেসে ফেলার ফলেই আমারও একই দশা। ওর ভয় ছিলো, 'সত্যি' খবরটা জেনে ফেললে, তুমি নির্ঘাৎ নেম সুইসাইড করবে। কিন্তু—আবার একটু হাসলো। বললো, 'কিন্তু এখন হচ্ছে আর সে ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতে হবে না। তোমার নিজের মধ্যে এখন মৃত্যুভয় ঢুকেছে। সাবাস দিতে হবে ওই ভাগ্নে ব্যাটাকে। একটা মস্ত সমস্যার সমাধান করে ফেলার জন্যে।'

কিন্তু কে ভেবেছিলো, সেই ভাগ্নে ব্যাটাকে নিয়েই ক্রমে সমস্যা জটিলতর হতে থাকবে!

হঠাৎ খবর জানা গেল পুষ্প খেমানিকে কানপুরে বদলি হয়ে যেতে হবে। তার মামার সেখানে কার্পেটের ব্যবসা। লাখ লাখ টাকার ব্যাপার। সেখানে গেলে উন্নতির আশা আছে।

তা যেখানে উন্নতির আশা আছে সেখানে যাবে না?

আর কান টানলেই মাথা আসে, এ তো চিরকেলে সত্য। পুষ্প গেলে পার্থও যাবে।

পার্থর চাকরি!

সেখানেও জুটে যাবে। নিজের শালার দৌলতে যেরকম চাকরি জুটেছিলো, শ্বশুরের শালার দৌলতে তার থেকে ভালোই জুটবে।

এখন ঝানু মেয়ে পুষ্পর বক্তব্য, পার্থর ছেলেকে তার মামা মামি যখন বিধিবদ্ধ ভাবে দত্তক নিচ্ছেই না, তখন ঘরের ছেলে পরের ঘরে পড়ে থাকবে কেন?

ঝানু না বোকা?

স্বেচ্ছায় সতীন কাঁটা গলায় নিতে চায়?

ও একটা ব্যাপার। ওদের সমাজে এটা হচ্ছে প্রেস্টিজের ব্যাপার। এতে পুষ্পর নিন্দে হবে।

তাছাড়া ছেলেটা এখানে পড়ে থাকলে পার্থ কী তেমনভাবে মনপ্রাণ ঢেলে পুষ্পর ইচ্ছের পুতুল হতে পারবে? ছেলেটাকে নিয়ে যেতে পারলে সবটাই তো পুষ্পর হাতে।

বজ্রাহত বলে একটা কথা আছে না?

তা সেটা দেখা গেলো পল্লবীকে দেখে।

পল্লবী পাথর হয়ে গিয়ে বললো, 'ওকে নিয়ে যাবে? আমার কাছ থেকে?'

পার্থ কিছু বলার আগে পুষ্প বলে উঠলো, 'এ তো সোমসারের নিয়মই দিদি। মা যশোদা রাণীকেও তো গোপালকে ছেড়ে দিতে হয়েছিলো।'

অকাট্য যুক্তি।

অতএব সেই একদম চুপ।

আর তদবধি পল্লবী নামের মেয়েটা যেন একরকম বাকশক্তি রহিত হয়ে গেলো। ছেলেটাকে যখন নিয়ে গেলো তাকিয়ে দেখলো না। ছেলেটা 'মাম্মা মাম্মা' ভরে তুমুল চিৎকার করলো, পল্লবী কানে হাত চাপা দিয়ে বিছানায় পড়ে থাকলো।

আর পার্থ?

তার অবস্থা তো এখন সম্মোহিতের মতো। সম্মোহিত ব্যক্তি যেমন সম্মোহক যা বলে, তাই করে চলে পার্থও তাই করে চলেছে।

পুষ্প তাকে সান্ত্বনা দিলো, 'কেন ভাবনা করছো? ওইটুকু বাচ্চা। দুদিনে ভুলে যাবে। পাতানো মা বৈ তো নয়। নিজের নাড়ির সঙ্গে যোগ আছে কিছু? তুমি তো ওর বাপ বটে। সত্যিকার। পিওর। তোমার সঙ্গ পাবে তো?'

২৬

এখন কৌশিক কী করবে?

পল্লবী আহার নিদ্রা ছেড়েছে, পল্লবী ভয়ানক একটা রোগীর মতো একেবারে শয্যাগত হয়ে পড়েছে। পল্লবী তার খোকন সোনার যা কিছু চিহ্ন দেখছে দূর করে ফেলে দিচ্ছে, মুছে ফেলছে। তার দশ বিশখানা অ্যালবাম ছুঁড়ে ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে চেঁচাচ্ছে, 'কৌশিক, সব দূর করে দাও। কৌশিক খুব

ভালো হয়েছে। নেমকহারামের ছেলে তো—নেমকহারামই হত। চারাগাছই নির্মূল হয়েছে ভালো হয়েছে। আরো শেকড় গাড়লে—'

'কৌশিক আর কক্ষনো ওকে আসতে দিও না। মাম্মা মাম্মা করে কেঁদে মরে গেলেও না।'

এই পাগলিনীকে নিয়ে কী করবে কৌশিক ?

পল্লবীর বাপের বাড়ি থেকেও নেই। পল্লবীর তিনকুলে আর কেউ কোথাও আছে কিনা জানা নেই কৌশিকের।

কৌশিক শুধু জানে শান্তনুকে।

শান্তনুই তার ভরসা, সহায়, তার আশ্রয়। তার বিপদে মধুসূদন।

কাজেই শান্তনুকেই আসন্ন একটা বড় ছুটির আগেই ছুটি নিয়ে চলে আসতে হলো হঠাৎ একটা জরুরি টেলিগ্রাম পেয়ে।

না এসে কী করবে ? যদি আর্জেন্ট টেলিগ্রাম পায়, 'পল্লবীকে বাঁচানো শক্ত হয়ে উঠছে। তোমায় জানানো উচিত বলে জানালাম। টেলিফোনে হতাশ হয়ে টেলিগ্রাম। আর বিশদ বলা সম্ভব হচ্ছে না।'

হ্যাঁ, এই বিশদটি বলেও ওঠা হয়নি শান্তনুকে। পল্লবীর কাছ থেকে যে পার্থ তার ছেলেকে নিয়ে চলে গেছে, এ কী চট করে বলা যায় ? পরিস্থিতি বোঝাতে হবে তো ?

তা সে সব না জেনেই ছুটে চলে এলো শান্তনু।

কিন্তু এসে পড়ে যে শান্তনু এমন একটা অদ্ভুত অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে যাবে তা কী ট্রেনে সারা রাতের হাজারো ভাবনার মধ্যেও ভাবতে পেরেছিলো ?

সে শুধু ভাবতে ভাবতে এসেছিলো, হঠাৎ কী এমন অসুখ করে গেছে পল্লবীর ? না কী কৌশিক তিলকে তাল করেছে ?...গিয়ে কী অজ্ঞান অচৈতন্য দেখবে, না কী গিয়ে দেখতে হবে নার্সিং হোমেই ?...

তা নয় — স্টেশন থেকে প্রায় উর্ধ্বশ্বাসে এসে ট্যাক্সি থেকে নেমেই ওপর দিকে তাকিয়ে দেখলো, কৌশিক বারান্দায় দাঁড়িয়ে। তার মানে খুব সম্ভব নার্সিং হোমে নয়। অন্তত বন্ধুর জন্যে অথবা অন্য কারো আসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে মনে হচ্ছে যখন, তখন হয়তো কেস তত সিরিয়াস নয়। না কী ডাক্তারের অপেক্ষায় ? এই সবই ভেবেছিল চকিতে।

কিন্তু একথা কী ভাবতে পেরেছিল শান্তনু ফ্ল্যাটে সে ঢুকে আসা মাত্রই পল্লবী ছুটে এসে শান্তনুকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা ঘষতে ঘষতে ডুকরে উঠে বলবে, 'শান্তনু ! শান্তনু ! তুমি এসে গেছো ? তোমায় কে খবর দিলো ?...শান্তনু ! তুমি কেন আমায় ছেড়ে চলে গিয়েছিলে ? তুমি থাকলে কী ওরা আমার মানিক সোনাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারতো ? সাধ্য হতো ? তুমি ওদের বকতে, তাড়িয়ে দিতে। কৌশিক ওদের বকলো না,

তাড়িয়ে দিলো না। দেবে কেন? ওরা যে কৌশিকের আপনজন। দলের লোক। শান্তনু তুমি আর আমায় ছেড়ে চলে যেও না।'

এই দারুণ অস্বস্তিকর অবস্থাতেও শান্তনুকে শান্তভাবে বলতে হয়, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। যাবো না, তো তুমি স্থির হবে, তবে তো?'

'স্থির হবো?'

'বা, হবে না? আমি কত দূর থেকে চলে এসেছি, এখন স্নান করবো, চা খাবো, তাই না?'

কৌশিকের সঙ্গে অলক্ষ্যে দৃষ্টি বিনিময় করবার চেষ্টা করলো শান্তনু অনেকবার, কিন্তু আশ্চর্য একরকম নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে কৌশিক। যেন স্ট্যাচু একখানা। চোখে চোখ পড়ানো গেল না।

এও তো ভালো জ্বালা!

শান্তনু আবার একটা অস্ত্র ছাড়লো। বললো, 'অনেকদিন তোমার হাতের চা খাওয়া হয় নি পলু, আগেই বরং এককাপ চা খাওয়া যাক। তারপর স্নান করা যাবে।'

পল্লবী যেন ভুলে গেছে, দেখতেও পাচ্ছে না কৌশিক নামের একটা দীর্ঘদেহী পুরুষ তার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

পল্লবী বললো, 'এক্ষুণি যাচ্ছি! চা তো, না কফি?'

'কফিতে তোমার সুবিধে?'

'বাঃ। আমার কী সুবিধে অসুবিধে? তোমার যা ইচ্ছে হচ্ছে—'

'তা হলে চা, চা-ই ভালো।'

'কিন্তু তোমার কাজের মেয়েটা কই?'

'বারে', বললে যে আমার হাতের চা খাবে।'

'আহা সে তো অতি উত্তম। তবে তোমাকে আবার খাটতে হবে। কষ্ট হবে।'

'একটু চা করতে কষ্ট হবে? আমি এতই অকর্মা?'

বলে এতক্ষণে যেন কৌশিককে দেখতে পেলো, এইভাবে বলে, 'কৌশিক! আমি কী সংসারের কিছু কাজ করি না?'

কৌশিক খুব দ্রুত বলে, 'কী যে বলো? না করলে চলে? কত সময়ই তো কাজের মেয়েটা থাকে না। যাক তাহলে আমিও এক কাপ চা পেয়ে যাচ্ছি?'

'পাবে না? আমায় তুমি কী ভাবো?'

বলে কিচেনের দিকে চলে যায় পল্লবী।

কৌশিক মনে মনে বলে, 'কী ভাবি, তা নিজেই জানি না।'

তারপর পল্লবীর অনুপস্থিতির সুযোগে দুই বন্ধুর যে বাক্যালাপ হয়, তাতে শান্তনুকে জরুরী টেলিগ্রাম করবার পটভূমিকাটিকে সংক্ষিপ্ত সমাচারে শেষ

করে ফেলে, কৌশিক বলে, 'যাক। মনে হচ্ছে বোধহয় দুশ্চিন্তাটা আপাতত কেটে গেছে। পাঁচ ছদিন ওকে কিছু খাওয়ানো যাচ্ছে না, কথাও বলানো যাচ্ছে না। এটাই হয়ে উঠেছিল সমস্যা।'

ট্রেতে বসিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবে তিনকাপ চা নিয়ে এলো পল্লবী। সঙ্গে কিছু নোনতা বিস্কিট !

ট্রেটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বললো 'তুমি তো ট্রেনে এসেছো, আর কিছু খাবে ?'

শান্তনু গম্ভীর ভাবে বললো, 'অনেক কিছুই খেতে পারি, যদি তুমিও শেয়ার করো। রিপোর্ট পেলাম, তুমি না কী খাওয়া, দাওয়া ছেড়ে দিয়েছো ? আমার বন্ধুটাকে জব্দ ফেলেছ।'

পল্লবী লজ্জিত ভাবে একবার কৌশিকের দিকে চোখ তুলে বলে, 'বাঃ। ওরা এমন খারাপ ব্যবহার করলো, আমার বুঝি ভীষণ কষ্ট হয় নি ? আমার বুঝি খিদে পেতো ? আজ তুমি এলে—খুব ভালো লাগছে, তাই খাচ্ছি।'

বলে দু আঙুলে দুটো বিস্কিট তুলে নেয়।

শান্তনুর লজ্জায় মাথা কাটাযাচ্ছে, কৌশিকের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না বেচারা। তবু সহজভাবে কথা বলতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

'পার্থবাবু তা হলে একটি বটগাছেই নৌকো বেঁধেছেন—'

'তা বলতে পারিস।'

'ছেলেটা হেলদি হয়েছে ?'

'ঈশ্বরের ইচ্ছে, অবিশ্বাস্য।'

'তবু ভালো।'

ছাড়া ছাড়া অন্তরলেশশূন্য কথা।

কৌশিকের মধ্যে বিরাট একটা ভাঙচুর হয়ে চলেছে।

শান্তনুর অবিরতই লজ্জা।

কিন্তু সেই লজ্জাটা যে এইখানে এসে পেঁছবে, তা কী ভাববার মতো ? সেটা সীমারেখায় যখন পেঁছলো, হঠাৎ কৌশিক বলে উঠলো, 'বিপদের ওপর বিপদ। কোম্পানি আমায় কিছুদিনের জন্যে 'হংকঙে' পাঠাতে চাইছে— বিশেষ চাপ দিচ্ছে।'

শান্তনু বলে ওঠে, 'তা এতে আর বিপদ কী ? ভালোই তো ! পলুরও বরং কিছুদিন বাইরে ঘুরে এলে শরীর মন দুই ভালো হয়ে যাবে।'

'পলু।' ওকে সেখানে কোথায় নিয়ে যাবো ? কোথায় কী ভাবে কাজ করতে হবে তাই জানা নেই। তাছাড়া—সে অন্য ধরনের পরিবেশ। তার চেয়ে তুই এক কাজ কর না, তুই তোর কাছে নিয়ে গিয়ে কিছুদিন রাখ না। নর্থ বেঙ্গলের ওয়েদার এ সময় ভালো।'

এমন অদ্ভুত আর আকস্মিক একটা প্রস্তাবে শান্তনু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কৌশিকের দিকে তাকিয়ে দেখলো। সেই মুখে কিসের ছাপ? ব্যঙ্গ? বিদ্রূপ? না কী হতাশা?

গলার স্বরে যেন হালছাড়া ভাব?

কিন্তু শান্তনু কিছু বলার আগেই, পল্লবী হঠাৎ হাততালি দিয়ে বলে ওঠে, 'সেই ভালো। সেই ভালো। তোমার কাছে থাকতে পেলে, আমি ঠিক ভালো হয়ে যাবো।...আমার সব কষ্ট কমে যাবে। তাই নিয়ে চলো শান্তনু। ওর সেই পাজি আপনজনটাকে উচিত জবাব দেওয়া হবে। সে ভাবছে— অধিকারের দাবিতে সে খোকন সোনাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে বলে, আমি পড়ে পড়ে কাঁদছি। দেখবে মোটেই তা নয়, দেখবে আমি বেড়াতে যাচ্ছি, খাচ্ছিদাচ্ছি—' হঠাৎ থেমে গিয়ে বলে, 'আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। ঘুমোতে যাচ্ছি। শান্তনু তুমি আমার ঘুমের মধ্যে পালিয়ে যাবে না তো? না না। ঘুমোতে যাবো না বাবা। তোমাদের বিশ্বাস নেই।'

'কী মুশকিল। চলে যাবো কেন? খাওয়া দাওয়া করবো না?'

'খাওয়া দাওয়া! ঠিক?'

'ঠিক! কৌশিক দেখবে তো, আমায় নিয়ে যাবার ভয়ে পালিয়ে যায় না যেন।'

কৌশিক একটু কৌতুকের হাসি হেসে বলে, 'যেতে ওকে দিচ্ছে কে?'

'তা হলে তোমরা যখন খাবে, আমায় ডেকো কৌশিক। দারুণ খিদে পেয়েছে। ডাকবে তো?'

'এই দ্যাখো, ডাকবো না? তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও গে—'

২৭

কৌশিক একটা হাই তুলে বলে, 'আমিও তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে অফারটা নিয়ে নিই গে—'

'তার মানে? তুই বলতে চাসটা কী? তুই কী ভাবছিস আমি সত্যিই ওকে নিয়ে যাব ওখানে?'

কৌশিক সিগারেটে জোর একটা সুখটান দিয়ে বলে, 'আলবাত ভাবছি! তোমার জিনিস তুমি ফেরত নাও ভাই। আমার ছুটি।'

'জিনিসটা ঘটিবাটি? তাই ফেরত নেবো! ইয়ার্কি পেয়েছিস?'

'আরে বাবা, বরফও তেতে উঠছে দেখছি। দেখছি এইটাই হবে সমস্ত সমস্যার চমৎকার সমাধান।'

'কৌশিক!'

শান্তনু গাঢ় গলায় বলে, 'ওই বাচ্চাটাকে নিয়ে গেছে বলে বড্ডো বেশি আপসেট হয়ে গিয়েই পলু এত বেশি উল্টোপাল্টা পাগলামি করলো। বুঝতে পারছিস না এটা সাময়িক। তার জন্যে তুইও দেখছি বড্ড বেশি আপসেট হয়ে গেছিস, কিন্তু—'

'রাবিশ!' কৌশিক বলে ওঠে, 'তুই কী আমায় একটা ছিঁচকাদুনি অভিমানিনী মেয়ে ভাবছিস? তাই আমি অভিমানে অস্থির হয়ে—দূর। যা বলছি খুব ভেবেই বলছি।'

'তাহলে? তুই কী বলতে চাস? সত্যিই আমি ওকে আমার ওখানে নিয়ে যাবো?'

'বললাম তো আলবাত নিয়ে যাবি। আর ভেবে দেখলাম সেইটাই হবে অনেকদিনের জমানো জঞ্জাল সাফ করার একমাত্র উপায়।'

'আইন বলে একটা জিনিস আছে কৌশিক, সেটা বোধহয় ভুলে যাচ্ছিস। এখন ও তোর কী বলে, বৈধ পত্নী। ওকে আমার সেই দ্বিতীয় ব্যক্তিবিহীন বাসায় নিয়ে যাবো অনির্দিষ্ট কালের জন্যে? এটা হয় না কী? আমায় কী ফাঁসাতে চাও মানিক? পাগলামি রাখো। একটা বাস্তব কথা কও।'

কৌশিক কিন্তু একই ভাবে বলে, 'এটা আমার পাগলামি নয়, শান্তনু! সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। বৈধ কথাটার আর একটা মানে হচ্ছে— বিধাতা নির্দিষ্ট। অন্তত আমার তাই মত। আমাদের সেই প্রহসনের নকল বিয়ের সার্টিফিকেটখানা ছিঁড়ে ফেললেই তো ল্যাটা মিটে যায়। আর আইন? ওটা আবার এযুগে একটা কথা না কী? ছেড়ে দে ওকথা!'

'এ সিদ্ধান্ত কী তোর ঠিক এই মুহূর্তের নয় কৌশিক? পলুর পাগলামি দেখে?'

'তোর পলুর পাগলামি দেখাটা আমার নতুন নয় শান্তনু। তবে অচিরেই ভেবে দেখেছি, আসল আসামী হচ্ছ তুমিই। তোমার পাগলামিই ঘটনা চক্রকে এমন জটিল করে তুলেছে। পল্লবীর যে 'মা' হবার ক্ষমতা নিজেরই নেই, সেই সত্যটিকে গোপন করে একটা মায়ার আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখে তুমি তাকে আঘাত থেকে বাঁচাতে চেয়ে তার সমূহ ক্ষতিই করেছো ভাই। সারা-জীবন মায়াকাজল চোখে দিয়ে থাকা যায় না। আমি অবশ্য এর জন্যে তোকে একখানা আদর্শ প্রেমিক ভেবে পুজো করে এসেছি এ যাবত, তবে ক্রমশ দেখছি, 'অতি প্রেম' 'অতি স্নেহ' এসব বোধহয় ক্ষতিকরই। 'আঘাত?' তো বাচ্চাটাকে ওর কাছ থেকে নিয়ে যাওয়ায় কম আঘাত তো পায়নি। তবু

মারা তো গেল না। একটু বেশি পাগলামি শুরু করলো, এই পর্যন্ত। তবে —টিংকু ওর একটা পাগলামি সারিয়ে দিয়ে গেছে শান্তনু—'

কৌশিকের গলার স্বর বিষন্নতায় ভারি হয়ে আসে, 'মা' হতে গিয়ে মারা পড়বার ভয়ে, ও কাঁটা হয়ে গেছে তাই আমি যখন ওর কাছে চরম সত্যটি প্রকাশ করে দিলাম তোর নিষেধ অমান্য করে ও হার্টফেল তো দূরস্থান, মূর্ছাও গেল না।'

'বলেছিস? ওকে বলেছিস?'

'বলেছি। এবং ও তার জবাবে বলেছে 'ভাগ্যিস। তা না হলে হয়তো মরে যেতাম। যাকগে ওসব কথা, এখন আসল কথায় আসি ভাই। চরম সত্যটা তোকেও বলে ফেলি। সত্যিই তোর জিনিস তোর কাছে গছিয়ে দিয়ে ছুটি চাইছি। এই অক্টোপাসের বন্ধনে আমার দমবন্ধ হয়ে উঠেছে শান্তনু। আমার রোলটা কী একবার ভাব শান্তনু। একটা চ্যালেঞ্জের হাতিয়ার মাত্র। প্রেম নয়, ভালোবাসা নয়, মমতা নয়, কেবলমাত্র একটা চ্যালেঞ্জের হাতিয়ার। ভেবে দেখ সেটা কী যন্ত্রণার!'

শান্তনু আস্তে বলে, 'এটা তোর ভুল ধারণা কৌশিক। আমি তো দেখেছি, তোরা পরস্পরকে ভালোবেসেছিস—'

'ভুল ধারণাটা তোরই শান্তনু। আমার কথা বাদদে। কিন্তু তোর পলু? সে একান্তই তোর। ও একটা কথা খুব সত্যি বলেছিলো, পকেটের টাকাটা 'চল' কী 'অচল' সেই টাকাটা নিয়ে হাটে না বেরোলে কী করে যাচাই হবে? ঠিক! সেটাই 'যাচাই' হয়ে গেছে আমার কাছেও। আমার পকেটের টাকাটা একদম 'অচল'।

'কৌশিক!'

শান্তনুর এই ভরাট গলার ডাকটার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের মধ্যে থেকেও একটা মিহি অথচ তীক্ষ্ণভাব শোনা যায়, 'কৌশিক। ও চলে গেলো না তো? তুমি ওকে আটকাও।'

২৮

'হলো তো?'

হঠাৎ খুব খাপছাড়াভাবে হো হো করে হেসে ওঠে কৌশিক, 'যাচাই' হলো তো? এবার ছাড় আমায়। পৃথিবীতে মেয়ের অভাব নেই। দেখেশুনে

একখানা কামপ্রচিয়ান মেয়েকেও বিয়ে শাদি করে ফেলে সুখে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে।'

এই সময় আলুথালু ভাবে বেরিয়ে আসে পল্লবী। একই গলায় বসে থাকা দুটো পুরুষের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, 'কী বলছিলে কৌশিক? সুখে জীবন কাটানো? তাই তো চাইছি কৌশিক। তোমার ওই পাজি আপন-জনটাকে বলে পাঠাবে তো—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার বাচ্চাটাকে নিয়ে আমরা দু-জনে সুখে জীবনটা কাটাতে পারবো না?'

শান্তনু হঠাৎ খুব চড়া গলায় বলে ওঠে, 'পাগলামিরও একটা সীমা আছে পলু। একথা তোমায় আমি আগে কত শতবার বলিনি? একটা দত্তক নাও। রাজি হয়েছিলে?'

পল্লবী ছলছল গলায় বলে, 'ও কী? বকছো কেন? এত জোরে জোরে বকছো কেন শান্তনু? তখন কী আমি খোকন সোনাকে দেখেছিলাম? বুঝতে পেরেছিলাম, একটা বাচ্চা কতখানি? পরের হলেও। তখন হেরে যাবার যন্ত্রণায় আর ঠকে যাচ্ছি এই ধারণায়—না না শান্তনু, আর আমি কিছু জ্বালাতন করবো না তোমাদের। তুমি খোকন সোনাকে নিয়ে এসো, সেই পাজিদের কাছ থেকে। বলো সে না আসলে আমি মারা যাবো। তাতেও দেবে না? দেবে গো নিশ্চয়ই দেবে। তোমার পায়ে পড়ি শান্তনু, ওকে নিয়ে এসো। তারপর ওকে নিয়ে সেই অনেক দূরে তোমার কাছে চলে যাবো। সেখানে শুধু তুমি আমি আর খোকন সোনা। অন্য কেউ ডিসটার্ব করতে আসবে না। ভাবো তো—কী সুন্দর হবে আমাদের সেই জীবনটি। যে জীবনের স্বপ্ন দেখে এসেছি চিরজীবন।'

হঠাৎ কৌশিকের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, 'তুমি মাঝে মাঝে বেড়াতে যাবে কিন্তু কৌশিক। নিশ্চয় যাবে। যাবে তো? বেশ জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে। আর খোকন সোনাটা তো তোমারি ভাগ্নে। সত্যি ভাগ্নে!

শান্তনু হঠাৎ রুক্ষ গলায় বলে ওঠে, 'ও কী করে মাঝে মাঝে আড্ডা দিতে যাবে? ও তো হংকঙে চলে যাচ্ছে?'

'হংকঙে! যা! কেন?'

'অফিসের কাজে। কোম্পানি পাঠাচ্ছে।'

পল্লবী সহানুভূতির গলায় বলে, 'ইস, অত দূরে! বেচারি! তো মাঝে মাঝে ছুটি পাবে তো, তখনই যেও। কেমন? অনেকদিন না দেখলে তোমারও তো মন কেমন করবে? বলো? করবে না?'

উজ্জ্বল উন্মোচন

গেরস্থ ঘরের সাদামাটা ছেলে সুমনের একটি মাত্র বিলাসিতা, দাড়ি কামানোর ব্যাপারে। এই কাজটির জন্য তার নানাবিধ সরঞ্জাম, বহুবিধ আয়োজন। গরম জল, ঠাণ্ডা জল, তোয়ালে, আফটার শেভিং তা সত্ত্বেও ফিটকিরির জ্বালা।

অথচ কাজটি সমাধা হয় স্রেফ সাবেকি প্যাটার্নে, খোলা ক্ষুরে। এ নইলে নাকি যথার্থ আরাম হয় না।

আজও ওই সব সরঞ্জাম নিয়ে গুছিয়ে বসে গাল দুটোকে সাবানের ফেনায় ফুলো ফাঁপা করে নিয়ে সবে-শানানো ক্ষুরটিকে নিয়ে একটা গালে একটা টান মেরেছিল, সহসা একটা উত্তেজিত স্বরের ডাক শুনেই ফ্যাঁস করে বেশ খানিকটা ফালা। রক্তারক্তি কাণ্ড।

ডাক না গর্জন ?

এ স্বর (অথবা গর্জন) কার ?

বড় পরিচিত না ? অথচ এখন কী নিদারুণ অপরিচিত লাগলো ! কে কাকে কী বলছে।

গালে তোয়ালেটা চেপে ধরে স্বরটাকে অনুধাবন করবার চেষ্টার মধ্যেই স্বরটা যে সপাটে আছড়ে পড়লো সুমনের সামনে, 'শরীরী'।

'দাদা' !

রুষ্ট ক্ষুব্ধ উত্তেজিত সুজয় সামনে এসে দাঁড়িয়ে তীব্র ঘোষণা করে উঠলো। 'দাদা। এভাবে মানিয়ে চলা তো আর সম্ভব হচ্ছে না। বুঝছি আমাকে এবার পথ দেখতে হবে।'

সুমনের সাদা তোয়ালের রংটা যে প্রায় লাল হয়ে উঠেছে, সেদিকে তাকিয়ে দেখলো না সুজয়, একই ভাবে বললো 'কথাটা তোমায় জানিয়ে রাখলাম।'

সুমন একবার হাতের তোয়ালেটার দিকে তাকালো আর একবার ভাইয়ের মুখের দিকে তাকালো। কোনটা বেশি লাল? ফর্সা ধবধবে সুজয়ের গোলগাল মুখটা বরাবরই কোনো মানসিক বিপর্যয়ের উত্তেজনায় লাল হয়ে ওঠে সেই ছোটকাল থেকে।

একবার বাড়ির কাজ করুনির ছেলেটা সুজয়কে 'তুই' বলে কথা বলে ফেলেছিল বলে, সে এই ভাবে টকটকে মুখে এসে নালিশ করেছিলো, 'দাদা। একে আর রাখবে না এখানে। এক্ষুনি তাড়িয়ে দাও বলছি।'

'কাকে? অ্যাঁ কাকে?'

'ওই পঞ্চু পাজীটাকে। ও আমাকে— ও আমাকে—'

ভাইয়ের মুখের রঙের দিকে তাকিয়ে, সুমন রেগে চড়াং করে উঠে বসেছিলো। 'পঞ্চু তোকে এইভাবে গালে চড় মেরে লাল করে দিয়েছে? অ্যাঁ?'

সুজয় আরো উত্তপ্ত হয়ে বলেছিলো, 'কী? ও আমার গালে চড় মারবে? এতো সাহস? ও আমায় 'তুই' বলেছে। বলে কি না, "এই ছোড়দা দেখবি আয় রাস্তায় কী মজা হচ্ছে।"

সেদিন হতভম্ব সুমন হেসে ফেলেছিলো।

অবশ্য মনে মনে। মুখে বলেছিলো, 'অ্যাঁ! এতো সাহস, রোসো, আজই ঠিক করছি ওকে।'

আজ এখন আর হতভম্ব সুমন মনে মনে হেসে ফেললো না। করুণ নয়নে তাকিয়ে, ততোধিক করুণ বচনে বললে, 'কী বলছিস জয়? তোর কথাটাতো ঠিক বুঝতে পারছি না।'

বোঝা যাচ্ছে আজ সুজয় অস্ত্র-শস্ত্র শানিয়েই রণসজ্জায় এসে দাঁড়িয়েছে। হয়তো দীর্ঘদিনের প্রস্তুতিতে।

তাই কাঁধ নাচিয়ে বলে ওঠে, 'তা পারবে না জানতাম। চিরদিনই ন্যাকা সেজে পার পেয়ে যাচ্ছ। কিন্তু সব কায়দা চিরদিন চলে না।'

গলাটা দারুণ চিন চিন করছে। কিন্তু শুধুই কি গলাটা? প্রত্যক্ষভাবে যেটা ধারালো ক্ষুরের একটা টানে ফালা হয়ে গেছে।

তা করুক চিনচিন। সুমন অস্থির গলায় বলে, 'কিন্তু এখন হঠাৎ হলোটা কি, সেটা বলবি তো?

"এখন' 'হঠাৎ' নয়, সর্বদাই হচ্ছে তবে সহ্যের একটা সীমা আছে তো? বাড়ির একটা লোক দুজনের একজন সংসারের সমান অংশীদার, সে বেচারী সর্বদাই অনধিকারীর 'রোলে' পড়ে আছে। বৌদি তাঁর শুচিবাই আর আচার বিচারের ছুতো দেখিয়ে ওকে ভাঁড়ারে হাত দিতে দেন না, রান্না ঘরে ঢুকতে দেন না। এর মানেটা কী? অসময়ে একটু চা খেতে ইচ্ছে হলে চোরের মতন

একপাশ দিয়ে ঢুকে একটু জল গরম করে নিতে হবে। চা, চিনি দুধ হাত পেতে চেয়ে নিতে হবে। কেন? কেন? হোয়াই? এলা এ সংসারের কেউ নয়? এলার কোনো কিছুর ওপর দাবি নেই?'

সুমন প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে গিয়ে বলে, 'তুই বলছিস কী জয়? তোর বৌদি এই রকম খারাপ ব্যাভার করছে বৌমার সঙ্গে? কই ডাকতো তাকে একবার দেখি।'

থাক দাদা। আর সিনক্রিয়েট করতে হবে না। এসব তুমি জানো না?'

সুমন একটু মলিন ভাবে বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তা জানি। হাড়ে হাড়ে জানি। ক্রমেই ছুঁই ছুঁই আর গোবর গঙ্গাজলের ঘটা বাড়ছে, শুনলে বিশ্বাস করবি—আমাকে পর্যন্ত আজকাল অফিসের পোষাকে ঘরে ঢুকতে দেয় না। আগে বাথরুমে গিয়ে হাত-পা ধুয়ে ধড়াচুড়ো ছেড়ে, ভিজে গামছা পরে তবে ঢোকার পারমিশান।'

'বাঃ! চমৎকার। তুমি এই সব মেনে নিচ্ছ?'

'উপায় কী? শান্তি বজায় রাখতে। সবার ওপরে শান্তি সত্য বুঝলি?'

'তুমি বোঝোগে। সবাই তো তোমার মতন বরফের পুতুল নয়। রক্ত-মাংসের মানুষ। তাদের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠছে।'

'ঠিক, ঠিকই তো। তিনি বড় বলে কী মাথা কিনেছেন? না না, অতো ইয়ে চলবে না। ডাক একবার তাকে, আমি ভাল করে কড়কে দিচ্ছি।'

'আঃ দাদা। বলছিই তো অতো নাটকের দরকার নেই। আমরা অন্য ব্যবস্থা করে নেব।'

সুমন হতাশ ভাবে বলে, 'কী ব্যবস্থা?'

'কী আবার! একটা ফ্ল্যাট দেখে নিয়ে—'

'জয়!' সুমন যেন আর্তনাদ করে ওঠে, 'কী বলছিস তুই? অন্য একটা ফ্ল্যাট দেখে চলে যাবি? নিজের বাড়ি ছেড়ে?'

'নিজেদের' আর ভাবতে পারছি কই দাদা? এতো পরের বাড়িতে চোরের অধম হয়ে থাকা। তবে যতদিন না ফ্ল্যাট পাচ্ছি, শোবার ঘরের মধ্যেই একটা স্টোভ-টোভ জেবলে যা হোক করে চালিয়ে নিতে হবে।'

সুমন হঠাৎ রাগে আগুন হয়ে উঠে বলে, কী? তুই বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে যা হোক করে? কেন? কিসের জন্যে? মহারানীর গোবর গঙ্গাজলের বাতিকের জন্যে? তার থেকে তিনিই তাঁর ঠাকুরের ঘরের দোরে বসে একটা তোলা উনুন জেবলে হবিষ্যি ফুটিয়ে নিয়ে বিশুদ্ধতা বজায় রেখে চলুন গে। পিসির মতো।'

'আঃ দাদা। কী যা তা বলছো?'

'ঠিকই বলছি। হপ্তার মধ্যে তিন চারটে দিন তো বার-ব্রত উপোস পালার

জন্যে নিরিমিষ্যি চালান তিনি। তবে সারা সংসারটাকে মুঠোয় পুরে রেখে আবার সবাইকে জব্দ করা কেন? না না ওসব চলবে না। কাল থেকে তিনিই 'ভেন্ন হাঁড়ি' হোন। আমরা আর সবাই এক হাঁড়ি। তুই আমি বৌমা নীপু টুকাই। ব্যস। আমরা ইচ্ছে মতন মাংস খাব, মুরগি খাবো, ডিম খাবো। তোফা থাকব। নীপু? নীপু কইরে – আয় শোন—'

'দাদা! অনর্থক কতকগুলো বাজে কথা বলে ঘুরিও না দাদা। নীপু টুকাই স্কুলে যায়নি? যা বলেছি, তাই হবে।'

'তাই-ই হবে। তোরা এবাড়ি ছেড়ে চলে যাবি? শুধু একজনের খাম-খেয়ালি শুচিবাইয়ের জন্যে? কোথায় সে? তাকে একবার ডাক না জয়।'

'ডাকতে হবে না। আসামী হাজির।'

খুব শান্ত একটি গলার স্বর বেজে ওঠে। 'এই যে—কী শাস্তির ব্যবস্থা দেওয়া হবে হোক। ফাঁসির হুকুম হলেও মাথা পেতে নিতে রাজি। 'পরম গুরু বলে কথা।'

স্বরে কৌতুক।

তার মানে স্বামীর উদ্দাম মন্তব্যগুলো ছাতের ঠাকুর ঘর থেকেও কানে গেছে সুষমার।

পাতলা ছিপছিপে গড়ন, মাজমাজা মুখের কাটুনি কাটাছাঁটা। পরনে একটা লাল পাড় মটকা শাড়ি। গাযে সেই গোছেরই একটা সেমিজ।

সুমন তড়বড় করে বলে ওঠে, 'না না। এসব হেসে ওড়াবার কথা নয়। শুনলাম, তুমি সংসারের সব কিছু আগলে রাখো, বৌমাকে ভাঁড়ার ঘরের কিছুতে হাত দিতে দাও না দিলে ফেলে দাও।'

সুষমা আত্মস্থ ভাবে বলে, 'তা সকালে বাসি কাপড়ে বেলা দশটা পর্যন্ত ঘুরলে ডিম সেদ্দ মাখানো চা পাউরুটি খেয়ে হাতটা একটু না ধুয়ে পর্যন্ত ভাঁড়ারের আলমারি নাড়তে এলে ফেলে দেওয়া ছাড়া উপায় কী? তোমার পিসিটা যে মরণকালে আমার হাতটি চেপে ধরে একখানা জম্পেস অনুরোধ করে রেখে গিয়ে, আমার পরকালটির মাথা খেয়ে গেছেন।'

'তার মানে! তার মানে?'

'মানেটা জানোনা? বলে জাননি, তোমার হাতে আমার 'গোপালের' ভার দিয়ে যাচ্ছি বড় বৌমা। দেখো যেন তাঁর ভোগরাগটি না বন্ধ হয়। মনে নেই সে কথা?

'বললে তাই মনে পড়লো, কিন্তু তাঁর গোপাল তো ঠাকুর ঘরে কলা, বাতাসা মাখন, মিছরি, ক্ষীর, ছানা সন্দেশ, রসগোল্লায় ডুবে থাকতেন দেখেছি। তার সঙ্গে আমাদের ভাতের হাঁড়ির সম্পর্ক কী? অ্যাঁ?'

'আছে সম্পর্ক। সে আর আমি তোমায় বোঝাতে বসতে পারব না।

ভাঁড়ার শুদ্ধ না থাকলে এতো বাহারটি হবে কোথা থেকে? শুধু তাই, নিত্যি শুধু নাড়ুই তো নয় পিঠে পায়েস চন্দরপুলি। যাকগে সেকথা, কিন্তু তোমাদের সংসারটায় কি আমি নতুন কিছু আমদানি করেছি? পিসির আমল থেকে যেমন চলছে, সেটাই প্রাণপণ কষ্টে চালিয়ে চলবার চেষ্টা করছি মাত্র। তবু কী আর তাঁর 'গোপালের তেমন সেবাটি করে উঠতে পারছি? বেচারী রোগা হয়ে যাচ্ছেন দিন দিন।'

পেতলের একটা পুতুল। রোগা হয়ে যাচ্ছে। এত ন্যাকামি বরদাস্ত করা যায় না।

সুজয় ব্যঙ্গ বিদ্রূপে মুখটা বাঁকিয়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ বরের মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠে সুষমা।

'ও কী? কী কাণ্ড করেছ? রক্তে যে ভেসে যাচ্ছে! অত বড় তোয়ালে খানা লালে লাল হয়ে গেছে। ও জয়! কী হবে? বাজে কথা রেখে, দ্যাখো না ভাই, কী লাগাতে হবে। তোমার ঘরে আছে কিছু ওষুধ?'

অতএব সুজয়কে একটু অপ্রতিভ হতেই হয়।

'আমার ঘরে? দেখি—কী আশ্চর্য। এত অসাবধানে খোলা ক্ষুরে—আর এই এক আশ্চর্য। শেভিঙের ব্যবস্থার কত নতুন নতুন উন্নতি হচ্ছে, এমনিতে তো সেফটি রেজার ছাড়া—এখনো আর কেউ খোলা ক্ষুর ব্যবহার করে? তাও রোজ শানানো চাই।'

এত তোড়জোর করে আসা। তখনকার মতো ব্যাপারটা ধামাচাপা পরে যায়। কারণ গালে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হয় সুমনকে। দুতিন দিনের মতো অফিস কামাই।

এলা ঘরের মধ্যে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে।

করবে না? একেই কী বলে না, বাড়া ভাতে ছাই? পাঁচ বছরের ছেলেটা আর তিন বছরের মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়লে, সারারাত ধরে বরকে জপিয়েছে, কাল যদি একটা হেস্তনেস্ত না করো আমি কিন্তু গড়পারে চলে যাব।'

এলার জীবনটা যে এত দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে, এ ধারণা অবশ্য সুজয়ের তেমন ছিল না কারণ দৈনন্দিন জীবনের নিত্য ছন্দে খুব একটা ছন্দপতন তার চোখে পড়তো না। কেবলমাত্র এলার মান অভিমান, রোষ, ক্ষোভ, সর্বদা চামরমনি চালের ভাতের মধ্যে কাঁকরেরমতো, স্বস্তির বিঘ্ন ঘটাত।

তবে রবিবার হলেই সেই এলাকে নিয়ে গড়পারে বেড়াতে গেলেই আবার যখন তার হাস্যোচ্ছল আলো ঝলমল চেহারাটি দেখত, মনে করত বাঁচা গেল বাবা।

কিন্তু সপ্তাহে একটি দিন মাত্র বাঁচলেইতো আর বেঁচে থাকা নয়।

এলা কাঠ কবুল। সে আর এমন হাততোলা হয়ে থাকতে পারবে না।
পারবে না। পারবে না।

মেনে টেনে নিয়ে পারবার চেষ্টাই বা করতে যাবে কেন? তার নিজের একটা জীবন চাই না?

অফিসে গিয়ে, কী যাওয়া আসার পথে বাসে বসে ভাবতে চেষ্টা করে সুজয়. আগে তাদের সংসারটা কী রকম ছিল? পিসি থাকাকালীন।

ঘর সংসারের এত খুঁটিনাটির কথা ছেলেদের মনে থাকবার কথা নয়, তবু ভাবতে থাকে। বৌদিতো ওই ভাবেই পিসির মুখাপেক্ষী ভাবেই থাকত। কখনো কখনো পিসি গঙ্গা নাইতে কী ঠাকুর মন্দিরে গেলে অনেকক্ষণের মতো বাড়িটা ভারমুক্ত থাকলে, বৌদি সুজয়ের কাছে এসে হেসে হেসে বলত, 'এই জয় দোকান থেকে একটু চিনি আর একটু আমুল গুঁড়ো নিয়ে আসতে পারবে? তাহলে মৌজ করে অসময়ে একটু চা খাওয়া যায়। সেই সঙ্গে অবশ্য ভজুর দোকানের খান কয়েক আলুর চপ।

বলত আর হাসিতে ঠিকরাত।

'তোমার দাদা যা ভ্যাবলা। ওকে ষড়যন্ত্রের মধ্যে রাখা হবে না। তবে ছুটির দিন অসময়ে বাড়িতে এক কাপ চা -- আর আলুর চপ পেলে না'—হি হি,

বাড়িতে তখন গ্যাসের উনুন ঢোকেনি। চায়ের জলের জন্য একটা জনতা বরাদ্দ ছিলো। তবে তাতে শুধু জল গরমই হতো। 'অচ্ছুৎ' কিছু চাপানো যেত না। তা চাপালে সেটাকে রাখা হবে কোথায়? তাছাড়া, 'ছিষ্টি' এঁটোকাঁটা হয়ে যেতো না তাহলে?

বাড়িতে ডিম সরাসরি প্রবেশ নিষেধ ছিল। কেবলমাত্র মাছই। তাও আলাদা তোলা উনুনে, দালানের একপাশে কোণে বসে।

কিন্তু এগুলো যে ভয়ানক দুঃসহ একটা কিছু তা কোনোদিন মনে হতো না সুজয়ের। জানতো এটাই আমাদের বাড়ির নিয়ম। এটাই স্বাভাবিক। এটা কেবলমাত্র মহিলার বেয়াড়া খামখেয়ালি শুচিবাইপনার ফল তা মনে হতো না কোনদিন। পিসি গত হতেও সেই তালেই তো চলতো সংসার।

এলাই ক্রমশ তার চোখ খুলে দিয়েছে। ক্রমেই অনুভব করতে শিখেছে— ওই বাজে কুসংস্কারগুলো আঁকড়ে বসে, একটা পঙ্গু জীবনযাপন করার কোনো মানে হয় না।

'জীবন' হবে অবাধ মুক্ত।

জীবন পীড়িত হয় অর্থাভাবে। সেখানে মানুষ নিরুপায়। কিন্তু—এটা কী অকারণ স্বেচ্ছা পায়ে বেড়ি পরে পরে—

এও দেখে আশ্চর্য হয় পিসি মরে যাওয়ার পরও বৌদি সেই ছাঁচটাকেই আঁকড়ে ধরে বসে থাকলো।

পিসি যখন মারা গেছে, এলা তখন সবে নতুন বৌ, সব সময় ঘরের মধ্যেই থাকতো, সঞ্জয়কে বলতো, তোমাদের বাড়িতে এসে নিজেকে যেন জেলখানায় বন্দি বলে মনে হয়। সাহস করে ফ্রিজ থেকে এক গেলাস ঠাণ্ডা জলও খেতে পারি না। চিরকাল দেখে আসছি—লোকে রান্না তরকারি, রাঁধা মাছ, এই সবই রাখে ফ্রিজে। তোমাদের এখানে 'ফ্রিজ' হচ্ছে একদম 'সতি শিরোমনি'। কাঁচা আনাজ দুধ, ফল আর বাটা মশলা ছাড়া আর কিছুই ঢুকবে না ফ্রিজে। সারা দুনিয়ায় এমন অদ্ভুত একখানা বাড়ি দেখবে না।

কালের প্রবাহে সেই অদ্ভুতত্ব অনেকটাই কমে গেছে। প্রতিনিয়তই তার ডানা ছাঁটা চলেছে। এখন আর ফ্রিজে কাঁচা মাছ না ঢুকলেও, রাঁধা তরকারি ঢুকছে। তবে আমিষ যুক্ত নয়। সাবধানে অন্য সব কিছুর সঙ্গে 'স্পর্শ দোষ' না ঘটিয়ে রাখা হয়। হয় এমন অনেক কিছুই। অন্যের প্রকৃত অসুবিধে ঘটে, এমন ব্যবস্থাগুলোকে ক্রমেই বাতিল করে চলেছে সুষমা। তবু সুষমাকে নিয়তই কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়।

তথাপি চলছিলও।

কিন্তু এলা কিছুতেই সেই 'চলা' টাকে চলতে দিতে রাজি হচ্ছে না।

সুজয় কেবলই ঠেকিয়ে রেখে আসছে 'দাদাকে বলবো কী করে?'

কিন্তু এমন খোঁড়া যুক্তির ঠেকো দিয়ে দিয়ে আর ভাঙা বাঁধকে ঠেকিয়ে রাখা যায়? যুদ্ধক্ষেত্রে নামতেই হবে। এই নির্দেশ এলার।

সুমনের ওই রক্তারক্তি ঘটানোর কাণ্ড, সেদিনের ঘোষিত যুদ্ধটা একটু ঝিমিয়ে গিয়েছিল, আবার যেদিন গালের ব্যান্ডেজ খুলে অফিস গেলো, সেই দিনই এলা আবার ধামাচাপা পড়ে যাওয়া যুদ্ধটাকে হাতে তুলে নিলো। বললো, 'ওসব অনুমতি টনুমতির ন্যাকামিতে কাজ নেই। তুমি, আমার শোবার ঘরের পাশের বারান্দায় একটা 'ঘের' দিয়ে কিচেন বানিয়ে দাও।'

'এই দোতলায়?'

চমকে উঠেছিল সুজয়।

আর এলা বিরক্তিতে বেজার হয়েছিল, না তো কি একতলায় তোমার বৌদির পবিত্র এলাকার এক কোণে? পেঁয়াজ, রসুন, মুরগি-মশল্লার ঝাঁজে তাঁর পবিত্রতায় ধাক্কা দেওয়া হবে না? যতদিন না ফ্ল্যাট জোগাড় করতে পারো, এই ব্যবস্থাই চলবে।

কিন্তু সুজয়ও তো চোখে অন্ধকার দেখছে। অতি ক্ষুদ্র ফ্ল্যাটের যা ভাড়া, তাতেই তো তার মাইনের অনেকটাই বেরিয়ে যাবে।

আহা এই বাড়িটা যদি তাদের পিতৃপুরুষের নিজস্ব হতো, তা হলে কী সুবিধে হতো। এক্ষুণি দাদার ওপর চাপ দিয়ে বাড়িখানা বিক্রি করিয়ে,

সেই টাকার অর্ধেকের দাবিদার হয়ে আদায় করে ফেলতে পারলে একখানা ভবিষ্যযুক্ত ফ্ল্যাট ভাড়া কেন কিনে ফেলাই যেতো। হায়। তিন প্রজন্ম ধরে বাস করে এসেও বাড়িখানা তাদের নিজস্ব নয়। ভাড়াটে বাড়ি। একটা সময় সুজিতের ঠাকুরদা গ্রামের বাড়ি থেকে চলে এসে সস্তাগণ্ডা 'দক্ষিণ কলকাতা' এলাকায় এই বাড়িখানি ভাড়া করে বৌ ছেলে মেয়েকে নিয়ে এসে এখানে সংসার পেতেছিলেন। ওপর নিচের চারখানা চারখানা আটখানা ঘর আর সিঁড়ির মাথায় আড়াই তলার একখানা হাফঘর সমেত এই বাড়িটার যা ভাড়া, এখন সে ভাড়ায় একটা ছাগলের খোঁয়াড়ও মেলে কি না সন্দেহ। আইনমাফিক সামান্য বাড়তে বাড়তে যেখানে এসে পৌঁছেছে, তাও এ যুগের পক্ষে অতি বিস্ময়কর।

ভাগ্যিস মাথার ওপর স্বয়ং বাড়িওয়ালা থাকেন না, তাই রক্ষে। তাঁর কোনো এক ওয়ারিশানকে, তিনমাস অন্তর ভারাটা মানি অর্ডার করে পাঠাতে হয়। মধ্যপ্রদেশের কোনো একটা ঠিকানায়।

কাজেই চিরন্তন 'ভাড়াটে-বাড়িওয়ালা' বিবাদের নির্লজ্জতা এখানে নেই।··· অনেকের ধারণা সুমন-সুজয়দের নিজেদেরই।·· তেমন ধারণা হবে নাই বা কেন ?

মাঝে মাঝে বাড়িটাকে সারানো বাড়ানো, এবং পরিবর্তনে আর পরিবর্ধনে পুরনো ধাঁচের বাড়িটা প্রায় 'নিউ মডেল' করে তুলেছে এরা।···অনুপস্থিত বাড়িওয়ালাকে না জানিয়েই। জানে তারা সাতজন্মে দেখতে আসবে না। এবং এলেও বর্তমান মালিক, বাড়ির সেই রূপান্তর বুঝতেও পারবে না। অতএব নির্ভয়।

কিন্তু তাই বলে তাদের না জানিয়ে নির্ভয়ে বিক্রি করে দেওয়া যায় না তো। অতএব, এটা থেকে প্রাপ্তির আশা নেই। বাস করতে করতে সুজয়ের ছেলেও বুড়ো হয়ে যেতে পারে। ওই পর্যন্তই।

হ্যাঁ শুধু সুজয়ের ছেলেই। সুমনের তো সে গুড়ে বালি। তার এই দীর্ঘ ঊনিশ বছরের 'বিবাহিত জীবন বৃক্ষে' কোনো ফল ফলেনি।

বলতে গেলে বাড়ির ওই শিশুদুটো—দুই দম্পতিরই।

তো সে যাই হোক, আসলে তো সেটা 'বাস্তব' নয়। সুজয় সুমন সুষমা-তিনজনে যতই অবস্থাটাকে 'স্বাভাবিক' বলে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিয়ে বহন করে চলতে পেরেছে, এলা তা পারছে না। পারবার চেষ্টা করতেও রাজী নয়। তারমধ্যে তীব্র প্রতিরোধ। এ আবার কী ? এ আবার কেমন ? জীবনটা তো চতুষ্পাদ কবিতা নয়। যে ছন্দে মিলে গেলেই হলো ? তোমাদের কাছে যেটা বড় সুন্দর ছন্দ, আমার কাছে সেটাই বিরাট এক 'অস্বচ্ছন্দ।'

অতএব ক্রমশ সুজয়ের মধ্যেও সেই 'বোধ' জন্মাতে শুরু করছে।·· সে ভাবতে শিখছে, 'সত্যিই তো যা বলে, সেটাইতো ঠিক। তাদের 'সম্পত্তি'

আর একটা নিঃস্ব দম্পতি বুভুক্ষের মতো হামলে পড়ে গ্রাস করে বসে থাকবে, তাই দেখে দেখে চোখ বুজে থাকতে হবে? তাদের ছেলেটা মেয়েটা মা বাপের থেকে জ্যেঠি জ্যেঠুকে বেশি ভালোবাসবে, তাদের প্রতি অধিক অনুরক্ত হবে। এটা বরদাস্তর যোগ্য?'

অথচ চোখের সামনে সেই অসহনীয় ঘটনা ঘটে চলেছে।

এলা এক এক সময় তার 'ঠাকুমার বাক্যি' প্রয়োগ করে টিপ্পনি কাটে, সেই যে বলে না, 'আপনার ধন পরকে দিয়ে, দৈবজ্ঞ বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে।' আমাদের হবে তাই। কখনো কখনো বলে, 'তোমাদের মা ছিলো না' তাই পিসি বলে গলেছো। পিসিকে পরম পুজ্যি করে কাটিয়েছো, এরা কি 'মা মরা'? আমার নীপু টুকাই। তাই 'জ্যেঠি' বলে অজ্ঞান হবে? জানো টুকাই আমায় শাসায়—মা তুমি এঁটো হাত ধুলে না, অন্য সবে হাত দিলে জ্যেঠিকে বলে দেবো। মা তুমি ছাদে বেড়াতে বেড়াতে না কাচা কাপড়ে জ্যেঠির পুজো করবার কাচা কাপড় ছুঁলে যে বড়? জ্যেঠিকে বলে দেবো। শুনলে কী হয় বুঝতে পারো? আপাদ মস্তক জ্বালা করে ওঠে না। আবার নীপু পাজীটাও পর্যন্ত বলে কিনা, মা, তুমি জ্যেঠুর টোস্টে কমকম মাখন লাগাচ্ছো যে? আমাদের সকলের টোস্টে অ্যাতো অ্যাতো পুরু। বিচ্ছু হচ্ছে দুটি। বুঝলে? দুটি বিচ্ছু যেন জাতি শত্রু।'

অর্থাৎ কেবল মাত্র সুষমার ছুঁৎমার্গ'ই প্রধান অ-সুখ নয়। 'অসুখের শিকড়' আরো গভীরে।

সুজয় নামের শিক্ষিত ভদ্র বছর ত্রিশের লোকটি কি ভেবে দেখতে চেষ্টা করে এই শিশু দুটোর 'বিচ্ছুমি'র উৎস কোনো প্রতিপক্ষের প্রবল প্রভাব না এ পক্ষের নীচতা, ক্ষুদ্রতা, অসহিষ্ণুতা, আর চিত্ত দৈন্য?

না, অত তলিয়ে বোঝবার ক্ষমতা তার নেই। কাজেই চিরদিন যাদের দেখে এসেছে, যাদের ভালোবাসায় বিগলিত থেকেছে, তাদেরকেই হঠাৎ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে! ভাবে, ও! ভেতরে ভেতরে ইনি এই? মনে করতাম না জানি কতো উদার, কতো মহৎ। কত ভালোবাসাপ্রবণ। সব ফোক্কা, জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হতে থাকে।

এ বাড়ির সুমন নামের ছেলেটার ভাগ্যে এমন 'জ্ঞানচক্ষুর শলাকা জোটেনি, তাই সে 'পৃথিবীর স্বরূপ' বুঝতে শেখেনি কোনোদিন। বুঝতে পারেনি, 'পিসিকে যা ভাবতাম, দেখছি তা নয়।'

পিসিই এ সংসারের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তাঁর দাদা পর্যন্ত বোনের দাপটে থরহরি কম্প থাকতেন, সেটা দেখতেই অভ্যস্ত ছিল চোখ। সেই চোখটার চশমা বদল হয়নি।

তাই সে এদিন অফিস থেকে ফিরে সুষমা নির্দেশিত পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ হয়ে যখন বারান্দায় বসতে এলো, দেখে চমকে গেলো।

এ আবার কী? এখানে একটা ক্যাম্বিসের পর্দা টাঙানো কেন? তার অন্তরালে আগুনের শিখা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মনে হচ্ছে। রান্নার ছ্যাঁক ছোঁক শব্দ, এবং মনোমুগ্ধকর সৌরভ।

চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। জিগ্যেস করবার মতো কাউকে দেখতে পায় না। ওই ঘেরাটোপের আড়ালেই যেন কেউ নড়াচড়া করছে।

একটু বসে, একবার গলা খাঁকারি দিল।

কোনো সাড়া এলো না। উঠে পড়ে ঘরে ঢুকে এলো। পিছনের প্যাসেজে চলে এলো। এর একপ্রান্তেই শিশুদুটোর পড়ার ঘর। এ সময় মাস্টারমশাই আসেন। সরু ফালি মতো একটু ঘর। দরজায় পর্দা ঝোলানো।

পড়ার সময় কেউ গিয়ে পর্দা সরিয়ে উঁকি দিলে দারুণ রেগে যায় এলা। তাই সেই দুঃসাহসে গেল না। আস্তে ডাকল—'টুকাই।'

টুকাইয়ের পড়াটা বোধহয় ততোটা গুরুতর নয়, এই ভেবে ওর নামটাই উচ্চারণ করল।

ক্ষণ পরেই টুকাই পর্দা সরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো। খুব মৃদু ইশারায় বললো, 'এখন পড়ছি, কথা বলা চলবে না।'

তবু সুমন আস্তে বললো, 'তোর বাবা এখনো ফেরেনি?'

টুকাই ছোট্ট ছোট্ট দুখানি হাত উল্টে অবজ্ঞার ভঙ্গিতে ঠোঁট উল্টে ইশারায় জানালো, 'বাপী আজ অফিস যায়নি।' এবং তারপর ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে নিশ্চুপ থাকার ইশারা জানিয়ে ফের ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলো।

অগত্যাই শেষ শরণ 'সুষমা'।

এখনতো সে ঠাকুর ঘরে। একটু দাঁড়াতেই হালকা ঘণ্টা নাড়ার শব্দ শোনা গেলো। অর্থাৎ গোপালের আরতি হচ্ছে।

অতএব অপেক্ষা। কিন্তু কতোক্ষণ ঘণ্টা নাড়বে সুষমা? অনন্তকাল?

নেমে যাবে? একদম নীচের তলায়? সেখানে অন্তত কাজের মেয়েটা আছে। অন্তত, থাকা উচিত। নেমে আসছে। মাঝামাঝি জায়গায় তার সঙ্গেই দ্যাখা।

মাঝারি বয়েস, ছোটোখাটো মাপের মানুষ। বিধবা সধবা না কি কুমারী জানে না সুমন। আর দেখে বোঝা যায় না। বলতে যাচ্ছিলো কিছু তার আগেই সে বলে উঠলো, 'আপনার চা জলখাবার এখানে দোতলায় উঠিয়ে আনব, না, নীচতলায় রাখবো।'

সুমন বললো, 'নীচেই রাখো। যাচ্ছি।'

তারপর চায়ের টেবিলে বসে দেখলো প্লেটে যথারীতি খান চারেক বিস্কুট, একবাটি আলুরদম, একটা সন্দেশ সাজানো।

খেতে খেতে জিগ্যেস করলো, 'ছোড়দাবাবু, আজ অফিসে যায়নি?'

সাবিত্রী আস্তে মাথা নাড়ল।

'কেন? শরীর খারাপ?'

'না তো। সারাদিনইতো ঘুরতেছে—'

'চা খেয়েছে?'

'এখানে খাবে না।'

সুমন একটু থতমত খেয়ে বললো, 'এখানে খাবে না?'

'না. ওনাদের চা দোতলার বারান্দায় বানানো হচ্ছে।'

বারান্দায় ঘেরাটোপ রহস্য ভেদ হলো।

আস্তে বললো, 'বড়বৌদি কখন থেকে ঠাকুর ঘরে?'

'সেই বৈকাল থেকে।'

আর কোনো কথা বললো না। শুধু খেয়াল হলো সামনের খাদ্যগুলো তাকে শেষ করতে হবে।

খুব একটা কর্তব্য কাজের মতো খেতে লাগলো। আর প্রতীক্ষা করতে লাগলো, কতোক্ষণে 'গোপালের' কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে নেমে আসবে সুষমা। নিঃসন্তান এই মহিলাটিকে কী এ রোগটা পেয়ে বসতো। যদি পিসি মরণকালে বাকদত্ত করিয়ে নিয়ে ঘাড়ে না চাপিয়ে দিয়ে যেতো। কই সুষমার মধ্যেতো বন্ধ্যানারীর আক্ষেপ আকুলতা দেখেনি কোনোদিন।

পরমানন্দেই থেকেছে। বরং বাইরের কেউ সে কথা তুললে, আক্ষেপ করলে, বলেছে 'ওমা। নীপু, টুকাই 'আমার' নয়?' যদিও নীপু জন্মাবার আগে তার বিবাহিত জীবনের দশটা বছর কেটে গেছিলো।

নীপু জন্মাবার পর পিসি আহ্লাদে ভেসে বলেছিলো, 'এতোদিনে ঘরে জ্যান্ত গোপাল এলো। বড় বৌকে তো দয়া করলেন না। -'

তবে সেই শান্ত গোপালটিকে নিয়ে বেশি দিন নাড়াচাড়া করতে পারেননি। জ্যান্ত গোপাল, পেতলের গোপাল দুইয়ের মায়া কাটিয়েই বিদায় নিলেন পৃথিবী থেকে।

কিন্তু সুষমাকে যে কী বন্ধনেই ফেলে গেলেন।

এখনো সুষমা ভাবে—'পিসিমার ঠাকুর ঘর।' 'পিসিমার বাসন।' 'পিসিমার ট্রাঙ্ক পিসিমার চাকি বেলুন, শিলনোড়া, বঁটি, কুরুনি।'

অতি বিশুদ্ধ এই সব বস্তুগুলি সেই বিশুদ্ধতা রক্ষার কী এতো দায় তার? সেকথা ভাবে না সুষমা। ভাবেনা, শেষ পর্যন্ত কী হবে এই তুচ্ছ বস্তুগুলোর।

এই এক অদ্ভুত নিষ্ঠা।

অথচ আর একজন?

তার যেন মানসিকতাই হচ্ছে বিশুদ্ধতা ভাঙার। সর্বদাই তাই তার মনের

মধ্যে, এবং মনের বাইরেও প্রশ্ন, কেন? কিসের জন্যে? তিনি আবার এসে এসব নিয়ে ভোগ করতে বসবেন? পেঁয়াজ বাটবার পক্ষে একটা ছোট্ট শিল হলে সুবিধে হয়।

তা হতে দেয় না সুষমা।

যাক, এইবার এলা নিজেকে পেয়েছে। পেতে বসেছে নিজের একটি সংসার। যেখানে তার স্বাধীনতায় কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

এদের চোখের সামনে দিয়ে। মোট মাটরি বেঁধে, স্বামী সন্তানের হাত ধরে ড্যাং ডেঙিয়ে চলে যেতে পারলে, কী গৌরবই হতো।

কিন্তু কী আর করা?

অক্ষম অপদার্থ একটা লোককে ভর করেই তো তার জীবন। ভিজে ন্যাকড়ায় বানানো সলতে। তাকে তাতিয়ে তুলে জ্বালাতে যে কী পরিশ্রম।

রাতে খেতে বসে সুমন হতাশ চোখে সুষমার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেলে বললো 'ওরা আর কোনোদিন একসঙ্গে খাবে না?'

সুষমা স্তব্ধতা ভেঙে বললো, 'আমি কী করে জানব?'

তুমি একবার জিগ্যেস করবে তো এ সব কী?'

'কাকে জিগ্যেস করব?'

কেন? ওই ওদেরই।'

'সব কথা ভুলে যাও কেন?' সেদিনও তো তোমায় বলেই রেখেছিলো জয়, শুধু সেদিন তোমার ওই ব্যাপারটায় ডাক্তার ডাকাডাকি কাণ্ড ঘটায়—'

সুমন আস্তে একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'সেদিন ক্ষুরটা আর একটু পিছনে নেমে যদি গলাটায় বসতো।'

সুষমা তার চির স্বভাব হারিয়ে চুপ করে থাকে।

অন্য সময় হলে উচিত উত্তর না দিয়ে ছাড়তো?

'কী হচ্ছে বসে থেকে? শুধু রুটি দুখানা নিয়ে নাড়াচাড়া। থাক, আর কষ্ট করতে হবে না। জানি আজ পারবে না। শুধু দুধটা খেয়ে উঠে পড়।'

'আর তুমি?'

'আমার কথা আমি ভাবব।'

অথচ উঠে পড়াও হয় না।

একটু পরে একটা প্রশ্ন যেন বাতাসে ভেসে উঠল 'আচ্ছা। জয়টারও একটু মায়া হলো না?'

'এ নিয়ে আলোচনা করে কী হবে?'

'চুপ করে থাকতে পারছি না সুষমা।'

কতোদিন পরে, সুমন এমন পুরো নামটা ধরে ডাকলো সুষমাকে?

সুষমা মুখ নিচু করে টেবিলের জিনিসগুলো অযথা নাড়াচাড়া করতে থাকে।

একসময় সুমন বলে ওঠে, 'নাও, তোমার কোথায় কী আছে খেয়ে নাও। আজতো আবার তোমার সন্তোষী মা?'

'হুঁ।

হঠাৎ রাগের গলায় বলে ওঠে সুমন, 'কী হলো তোমার ওই সব—'সন্তোষী মা' চণ্ডী ফণ্ডী করে? কতো সন্তোষ দিলেন ওঁরা? কত মঙ্গল করলেন?'

সুষমা আস্তে বলে, 'সেটাই ভাববো এবার।'

কিন্তু দোতলায় সেই ঘেরাটোপের আড়ালে?

অস্থায়ী ব্যবস্থায় যে খাওয়া-দাওয়া হলো, সেখানে কোন মানসিকতা?

সেখানে অন্য এক পরিস্থিতি।

সন্ধ্যাবেলা চায়ের সঙ্গে 'টা' নামক বস্তুটা এতো বেশি করেছিল এলা, যে রাতে আর খেতে বসার প্রশ্ন ওঠেনি।

ছেলেমেয়েও সেই তখন ভারাক্রান্ত হয়ে সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়েছে।

রাতে মশারি টাঙাতে টাঙাতে এলা বলল, 'তুমি এমন করছো, যেন আমি একটা নরহত্যার পাতক করেছি। ভাই ভাইয়ে আলাদা হাঁড়ি এমন যেন ঘটনা কখনো দেখোনি শোনোনি। অথচ প্রবাদ বচনেও আছে—'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।'

সুজয় একটু ক্লিষ্ট স্বরে বলে, 'আমি তো কিছুই বলিনি তোমাকে।'

'মুখে বলোনি। তবু না বলে তার শতগুণ বোঝাচ্ছো। এখন দেখছি—আমারই গড়পারে থাকা উচিত ছিল।'

'আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। এখন আর কথা বলতে পারছি না।'

'সে তো পারবেই না। আমি কথা বললেই তো তোমার ঘুম পায়।'

এলা মশারির ঝালরটা গুঁজে দিয়ে বালিশটা নামিয়ে নিয়ে মাটিতে বেড কভারটা একটু বিছিয়ে শুয়ে পড়ে।

সুজয় অস্বস্তির গলায় বলে, 'ও কী? বাইরে শুচ্ছো? মশায় খেয়ে ফেলবে যে।'

'এ হচ্ছে গণ্ডারের চামড়া। মশা ছেড়ে, বাঘেও খেতে পারে না।'

'পাগলামি কোরো না। তোমার তো আবার মশা কামড়ালেই অ্যালার্জি—'

'যাকে অ্যালার্জি নিয়েই জীবন কাটিয়ে চলতে হয় তার আবার তুচ্ছ দুটো মশা।'

'ঘুম পাওয়াটা' আর কতক্ষণ রাখতে পারা যায়?

অগত্যাই আবার সন্তর্পণে মশারির ধার খুলে নেমে আসতে হয়।

'এ আবার কী? তুমি আবার মাটিতে শুতে আসছো কেন? মশার মধ্যে?'

'উপায় কী?'

তারপর আর কী? এক পক্ষের যখন উপায়হীনতা, অপরপক্ষের তো তখন জয় সুনিশ্চিত।

সকালে বাজারে আলুওলা অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করে 'কী ব্যাপার? আপনি? দাদার শরীর খারাপ না কী?'

'না ভালোই আছেন।'

মাছওলা বললো, 'আপনাকে তো কোনোদিন মাছের বাজারে বড় দেখি না। দাদার শরীর ভালো নেই?'

'কেন? আমার একদিন আসতে নেই?'

'না তা বলছি না। আসতে দেখি না তো—কত নেবেন?'

এর কাছে শুধুই রুই।

অথচ সুঞ্জয় না জানে মাপ, না জানে দাম।

সুজয় মনে মনে ঠিক করে ফেললো কাল থেকে আর এ বাজারে নয়। অন্য পাড়ায় চলে যাবো। বললো, 'দিয়ে দিন যা হোক। মানে যেমন দেন।'

হ্যাঁ এখন তো মাছওলাকেও 'আপনি, আজ্ঞে' করতে হয়।

'আপনার দাদাতো দেখি চারামাছ, মৌরালা, পুঁটির বেশি ভক্ত আড়াইশো মতো নেন বাচ্চাদের জন্য।'

'ও। তাহলে ইয়ে—তাই দিন।'

লোকটার আর কথা বলার সময় থাকে না। অন্য খদ্দেরদের দিকে মুখ ফেরায়। ওজন করে মাছ এগিয়ে দেয় তার সহকারি। লোকটা ভাবে, রোজ এর দাদা আসে, কড়া নজর। একপিস মাছ শালপাতার তলায় ঠেলে ঢুকিয়ে রাখার জো নেই।

বাড়ি ফিরতেই এলা থলি উপুড় করে চেঁচিয়ে উঠলো, 'এগুলো আবার কী? এই কাঁটার কুল চারা মাছগুলো? কে খাবে? কাটা পোনাই বরং আর একটু যাকগে। এই তোমায় বলে রাখছি—আর কিছু পারো না পার একটা ছোটখাটো ফ্রিজ অন্তত তাড়াতাড়ি কিনে ফেলো। এক সপ্তাহের মতো মাছ, মাংস, ডিম, সব্জি কিনে এনে ভরে রেখে নিশ্চিন্দি! রোজ সকালে হ্যাংলার মতো থলি হাতে বাজার ছুটতে হয় না। রবিবারে রবিবারে আরামসে গুছিয়ে বাজার করবে।...আর হ্যাঁ—গ্যাসের জন্যে তোড়জোড় করো। বারমাসতো কেরোসিন চালানো যায় না। তাই বা লাইন দেবে কে? ওই গঙ্গার মা টাকে চুপি চুপি তুতিয়ে পাতিয়ে রেখেছি আচ্ছা হ্যাঁ গো রেশন কার্ড ছাড়া না কী কেরোসিন মেলে না?'

সুজয় বললো, 'তা তো জানি না।'

'তা জানবে কেন? চিরদিন বুড়োখোকা হয়ে দাদার পুষ্যি সেজে থাকা হয়েছে তো? রেশন কার্ডও তো ওর নামে। ফ্যামিলির হেড হিসেবে?'

সুজয় ঈষৎ ক্লান্ত ভাবে বলে, 'তোমার সব প্রশ্নের উত্তর একদিনেই দিয়ে উঠতে পারা যাবে না।'

'বাবাঃ। কী মেজাজ! 'সুখ' যে আমার কপালে কতো আছে, তা বুঝছি।'

কিন্তু বাড়ির নিচের তলায় সাবেকি সংসারে যেখানে দিন-দুই 'বাজার' হয়নি, তারপর বাসনমাজুনি গঙ্গার মার দ্বারাই চলছে।

সুষমা বলে, 'মাছটুকু যদি তুমি দেখে শুনে আনো। ও বাসি টাটকা বোঝে না।'

'মাছ ফাচের দরকারটা কী?' সুষমা রায় দেয়, 'তুমি তো অর্ধেকদিনই নিরিমিষ্যি। বাকি কটা দিন হলো আর না হলো—'

'আর তুমি?'

'আমারও না হলে চলে যাবে। এইতো দু-তিন দিন আলু-টালু বড়া-ফড়া দিয়ে বেশ চলে গেলো।'

'মাছ বন্ধ করে তোমার শরীর টিকবে? একে চোখ খারাপ।'

'ছাড়ো তো এসব বাজে কথা। দেশে কজন দৈনিক মাছ-ভাত খাচ্ছে? সবাই অন্ধ হয়ে যাচ্ছে?'

অতএব গঙ্গার মাকে সামান্য কিছু মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হলো, বাজারটা করে দেবে বলে …'সামান্য' বলে যে সে রাজি হলো তা নয়। বাজারটা হাতে থাকা, একটা তালুক থাকার সমান। তা সে যতই ছোটো স্পেলের হোক। কথাতেই তো আছে 'রাজার জন্য রানী, কানার জন্যে কানি।'

সংসার ভাগভিন্ন হলে সাবেকি কাজের লোকেদের পরম মওকা। দু-পক্ষ থেকে পয়সা লোটে। এবং কথা চালাচালির মজাটা লোটে।

এলা অবশ্য তাকে বলেছিল, একটা বাসনমাজনি যোগাড় করে দিতে, তো গঙ্গার মা নিজেই গা পাতলা করে এসেছিলো, ওমা এটুকুর জন্যে আবার অন্য লোক কেন? আমিই সেরে দেবো। বলি, খাবার লোকতো আর বাড়েনি ছোট বৌদি।…যাদের বাসন মাজতুম তাদেরই মাজবো।'

সিন্ধুঘোটকের মত ফোকলা মুখে সামনের দুটো দাঁত বার করে হেসে বলেছিলো 'আমারই লাভ। দুই দাদাবাবুর পকেট থেকে দু'প্রস্থ মাইনে পাবো।'

'কী সোজা হিসেব।'

'তা এইভাবেই তো সংসারী লোকেরা 'সুবিধে অসুবিধে' আর 'লাভ লোকসানের' হিসেব করে থাকে। ইতর, ভদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত কে নয়?'

ব্যতিক্রমীদেরই হয় যন্ত্রণা।

তাই সুমনের সেই যন্ত্রণা, যন্ত্রণায় হৃদযন্ত্রটা যেন ক্রমেই কমজোরি হয়ে আসছে।

আর সুষমা ?

তার কথা বলতে গেলে তো লোকে অবিশ্বাসের হাসি হাসবে। সে কে ? পরের বাড়ির একটা মেয়ে বৈ তো নয়।

সে অধিক যন্ত্রণায় ছটফট করে শিশু দুটোর 'চোরে'র ভূমিকায়।

তাদের যে ইঁদুর দৌড়ের লাইনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া আছে এবং তার জন্যে আষ্টেপৃষ্ঠে সর্বাঙ্গে নাগপাশ। তবু তারই ফাঁকে ফাঁকে, এক আধবার 'প্রহরিণী'র অনুপস্থিতিতে বা স্নানের ঘরে থাকার সময়টুকুতে চলে আসে এদিকে। আর মুখে তালাচাবি দেওয়ার ভঙ্গিতে ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে বলে, জানো জ্যেঠি, আজ না আমাদের দোতলায় মুরগি রান্না হয়েছে।···জানো জ্যেঠি, ছোটো মেসো বলেছিলো এদের জ্যেঠুকে দরজার সামনে দেখলাম, চেহারাটা এতো খারাপ হয়ে গেছে কেন ? অসুক-বিসুখ ধরেছে নাকি কিছু ?'

বাইরের লোক সুমনকে দরজার সামনে দেখতে পায়। যখন তখন দেখতে পায়। কিন্তু সুমন যাকে একটু দেখতে পাবার জন্যে অযথা দরজার সামনে ঘোরাঘুরি করে তাকে দেখতে পায় না।

কোন দরজা দিয়ে যে যাওয়া আসা করে সে ? বোঝা শক্ত।

সে হয়তো 'মাহেন্দ্রক্ষণ'-এর অপেক্ষায় অপেক্ষায় থাকে। আবার কখনো কখনো সিঁড়ির তলার সরু দরজাটা খুলে, গলি দিয়েও বেরিয়ে যায়। তারও যেন লুকোচুরি খেলা।

তবে দৈবাৎ সিঁড়িতে মুখোমুখি হয়ে যায়। একপক্ষ কৃতার্থ মন্য হয়ে কিছু বলতে যাবার আগেই অপর পক্ষ সট করে পাশ কাটিয়ে সাঁ করে নেমে যায় অথবা উঠে যায়।

তবে সুষমা একরকম চালিয়েও যাচ্ছে।

সে এমন ক্ষেত্রে অনায়াসে বলে ওঠে, 'জয়-এর প্রাণে এত ভয় কেন ? এমন চুপিসার হয়ে গেছে, যেন কেউ দেখতে পেলেই পুলিশে দেবে।···জগৎ সংসারের চিরকেলে লীলা। এতো আপসেট হবার কী আছে ?'

জবাব অবশ্য পায় না। তবে বলে তো নেয়। আবার পঞ্জিকার পাতায় 'ষষ্ঠী' দেখলেই অনায়াসে, এলার ঘরের দরজায় এসে বলে, 'এলা, আজ ষষ্ঠী। ভুলে ভাত খেয়ে ফেলিসনি। তোর খাবারটা নীচের তলাতেই হবে।'

এলা হয়তো মৃদু আপত্তি করে, 'কী দরকার আবার আপনার অতো খাটবার ? দোকানের খাবারটাবার খেয়েও তো চলে যায়।'

এমনিতেও এলা আগে আগে বড়জাকে সহৃদয় ভাবে বলতো, 'আচ্ছা দিদি, আপনার বাড়ির লুচি, পরোটা যা, দোকানের রাধাবল্লভী-ডালপুরিও তো তা তাই খেলেই হয়। বাড়তি কেন খাটুনি ? ওরা কী গ্র্যান্ড আলুরদম বানায় ! আপনি তা খুব ভালোবাসেন।'

সুষমা গালে হাত দিতো।

'ওমা। ষষ্ঠী মনসার দিনে দোকানের খাবার? ওদের কোনো শুদ্ধবার আছে। অন্যদিন খাই বলে, বার-ব্রতর দিনে?'

এখন এলা অনায়াসে নিজের একার জন্য প্রেসক্রিপশনটা পেশ করে।

কিন্তু বোকা সুষমা অথবা সপ্রতিভ সুষমা বলে, 'আমি তো নিজের জন্যে করবোই। ··তুই কত খাস? তাছাড়া নীপু ও টুকাইয়ের জন্যে ষষ্ঠীর প্রসাদতো রাখতে হবে একটু। আজ ওটাই বিকেলের টিফিন হবে।'

এর বেশি কিছু বলে না।

আর বুদ্ধিমতী এবং অতি সপ্রতিভ এলাও বেশি কিছু বলে না। আলগার ওপর থাকাই ভালো।

শুধু সেই লোকটা।

যার না কী চেহারাটাই বড্ড খারাপ হয়ে গেছে সে এক একদিন রাত্রে মশারির বাইরে বেরিয়ে ঘর ছেড়ে ছাদে উঠে গিয়ে পায়চারি করে।

রাতে পায়চারি রোগটা তার আছে। করতো টানা লম্বা দালানে। এখন দালানের অর্ধেকটা তো যবনিকার অন্তরালে।

কোনো এক সময় সুষমাও নিঃশব্দে উঠে আসে।

কিছু বলে না, এমনি পাঁচিলের ঝার্নিসের কোলে বসে পড়ে।

সুমন চলতে চলতে একসময় বলে, 'আমি একটু হাওয়া খেতে এলাম। তুমি আবার উঠে এলে কেন?'

'একা ভয় করছিলো।'

'না না। ওরাও যদি হঠাৎ কেউ ছাদে আসে? কী মনে করবে?'

'কী মনে করবে? বুড়োবুড়ির দেখছি ফুর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ। রাত দুপুরে চাঁদের আলোয় হাওয়া খেতে এসেছে।'

'অঃ। তাই কী বলছি? বলছি—আমি তো এক্ষুনিই নিচে চলে যাচ্ছিলাম।'

'যাও যাও।'

আবার তক্ষুনি একটু থেমে বলে, আচ্ছা আমি কী করলাম বলতো? জয় তো আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে বসে আছে। আমার মুখটাও কী দেখবে না প্রতিজ্ঞা করেছে? চিরকালের 'মনের কথা' বলার সঙ্গিনী। অতি গোপন দুঃখও ব্যক্ত না করে থাকতে পারে না।

অন্ধকারে মুখ দেখা যায় না। চাঁদের আলো তো সবদিন থাকে না। সুমন আস্তে বলে, 'মুখ দেখবে না, না নিজের মুখটা দেখাতে পারবে না বলেই চোর পুলিশ খেলে বেড়াচ্ছে কি না কে জানে।'

সুমন কথাটা বুঝতে চেষ্টা করে। চুপ করে যায়।

তবু অনেকগুলো দিন রাত্রি সপ্তাহে মাস কেটে যায়।

এলা তাগাদা দিয়ে বরকে দিয়ে একটা ফ্রিজ আনাতে পারে না।

এদিকে সাবেকি ফ্রিজে আরশোলার বাসা হতে শুরু করে। শূন্য হা হা।

কী রাখবে সেখানে সুষমা ?

বাচ্চারা অপর শিবিরে।

কাজেই ফলটল আসে না, আসে না মাখনও। দুধও আসে না প্যাকেট প্যাকেট।…একটা মাদার ডেয়ারির প্যাকেট আসে, তখনি জ্বাল হয়ে সুমনের জন্যে ছানা কাটানো হয়ে যায়।

আনাজপাতিই বা কতো ? গঙ্গার মা'র নিয়ে নিত্যকার আসা বাজার সেদিনই কোটাকুটি হয়ে যায়। এতএব ডালডাল বাটনা বেটে ঠাণ্ডা ঘরে রেখে দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

বুকে বল নিয়ে একদিন সুষমা বলে উঠল, 'এলা। একটু দাঁড়া শোন।'

'কী বলছেন ?'

'বলছি, ফ্রিজটা তো এখন আর তেমন কাজে লাগছে না, পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে যাবে। তুই ওটাকে সুবিধা মতো জায়গায় বসিয়ে কাজে লাগা না।'

'আমি ? কেন ? না, না।'

'না না কেনরে বাবা ? শুনিতো ফেলে রাখলে নষ্ট হয়ে যায়। আর অকারণ চালু রেখে শুধু বরফ জমা।'

এলার যে লোভ হয় না তা নয়। তবু নিস্পৃহগলায় বলে, 'দেখি আপনার দ্যাওরকে জিগ্যেস করি।'

সুষমা হেসে ওঠে। বলে, 'তুই আর হাসাসনে এলা। কবে থেকে আবার এমন 'পতি পরম গুরু' হলি ? তোর ঘর সংসারের ব্যাপারে ওর অনুমতি নিতে হবে ? তবে এমনি মুটে ডেকেতো নাড়াচাড়া করলে হবে না। ওদের লোক ডাকতে হবে, তাই ওদের পিত্যেশ। তা নইলে গঙ্গার মার ষণ্ডা গুণ্ডা ছেলে দুটোকে দিয়েই ওপরে তুলিয়ে দিতাম।'

এলা একটু অপ্রতিভ ভাবে বলে, 'ওপরে তোলবার কী আছে ? আমি কী আর নিচেয় নামি না ?'

'আহা তা নয়। তবে রান্নাবান্না, খাওয়াদাওয়ার জায়গায় হাতের কাছে থাকলেই তো সুবিধে।'

সুজয় অবাক হয়ে বললো, 'তুমি ওটা নিতে রাজি হলে ?'

'না হবার কী আছে ? একজনের দরকার। আর একজনের, পড়ে রয়েছে। তাছাড়া এজমালি জিনিস। আমারওতো ভাগ আছে।'

'কী মালি ?' সুজয় বোকার মতো তাকায়।

'এজমালি ! কথাটা শোনোনি কখনো ? যৌথ সংসারের যা কিছু সবকিছুই এজমালি বলে।'

সুজয় গম্ভীর ভাবে বলে,'ওটা ঠিক বোধহয় সে পর্যায় পড়ে না। ওটা আমার বিয়ের আগে কিনেছিলো হঠাৎ কোনো বোনাসের টাকায়।'

'কিসের কী অতো জানি না। বিয়ে হয়ে পর্যন্ত তো এই সাত আট বছর দেখছি। জানি, সংসারের জিনিস। তবে হ্যাঁ, তুমি যদি ক্ষমতা দেখিয়ে এর মধ্যে আমায় একটা নতুন এনে দিতে পারতে, মুখটা বড় থাকতো। অন্যেরও সাহস হতো না একটা সাত পুরনো জিনিস ভিক্ষে দিতে আসবার।"

অতএব জিনিসটা দোতলায় ওঠে ! তবে নতুন রং গায়ে চাড়িয়ে।

সুমন সুষমার এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়ায় কৃতার্থ মন্য হয়ে, দুদিনের কড়ারে রং করিয়ে দিলো।

অবশ্য যুক্তি একটা খাড়া করলো। জিনিস যখন দোতলার ঘরে থাকছে, তখন একটু ভাবিযুক্ত হওয়া উচিত।

হ্যাঁ, ঘরেই উঠেছে। দালানে নয়।

দালানের কোণের দিকে যে ছোট ঘরটায় বাড়ির আলতু ফালতু জিনিস থাকতো, থাকতো পিসিমার সেই সব বিশুদ্ধ বাসন-পত্র, সেই ঘরটাকেই সাফ করে নিয়ে এলা ভাঁড়ার করেছে। যে ভাঁড়ারের আলুর সঙ্গে পেঁয়াজ এবং ডিমের অবাধ সহাবস্থান।

মাঝে মাঝেই ইলেকট্রনিক মিস্ত্রি আসে। আসে অন্য মিস্ত্রি। কী যে করে, কখনো ঠুংঠাক কখনো ঠকাঠক।

সুমন এক সময় (সুষমার সামনেই অবশ্য) স্বগতোক্তি করে। 'জয়টা যে কী করছে। বাড়িটা যে পরের, তা খেয়াল করছে না।...হঠাৎ যদি হুড়ো আসে।'

কিন্তু কজন আর সবদিকে খেয়াল রেখে চলতে পারে ? বিশেষ করে, যাকে অন্যের খেয়াল খুশির বশে থাকতে হয়।

অবশেষে একদিন এলো সেই হুড়ো।

বাড়িখানা বাড়িওয়ালা বেচে দেবে স্থির করে ব্যবস্থা করেছে। একবার কলকাতায় এসে কাজ মিটিয়ে যাবে। অতএব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যেন অনুগ্রহ করে বাড়িটা ছেড়ে দেওয়া হয়।

বর্তমানের মালিক পূর্ব মালিকের জামাই বা নাতজামাই। তার সঙ্গে এদের আলাপও নেই। চিঠি এসেছে উকিলের। এবং সেটা সুমনের নামেই।

বাধ্য হয়ে ভাইকে ডেকে কথা বলতে হলো।

সুজয় বললো, আমি আর কী বলব?'

'তা ছেড়ে দিতে তো হবে।'

সুজয় এই নাবালকের দিকে করুণা আর অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, 'তুমি এখনো নীপুর বয়সেই আছো। বলেছে বলেই ছেড়ে দিতে হবে?'

'হবে না? উকিলের চিঠি যে রে।'

'কুড়িটা টাকা খরচা করলেই একখানা উকিলের চিঠি পাঠানো যায়।'

'কিন্তু তারপর?'

'তারপর আবার কী? দশ বিশ বছর ধরে মামলা। জানোনা? না শোনোনি?'

'সবই জানি। তবু ওরে বাবা? মামলা। তার থেকে তো মানে মানে চলে যাওয়াই ভালো।'

'সে তো নিশ্চয়। তবে সেই মানটা রাখার উপায়টা জানা আছে?…এর দশগুণ ভাড়া দিয়েও এর সিকির সিকি বাড়ি জুটবে না। আইনের বলে ভাড়াটে ওঠানো যায় না। আমি নড়ছি না।'

সুজয় চলে গেলো।

তবু সেই উকিলের চিঠিটাকেই মাথায় ঠেকালো সুমন এর জন্যেই তো এতদিনে দমচাপা বুকটা একটু হালকা হলো।

তবে সুজয়ের ঘোষণাটা অস্বস্তিকর।

নড়বেনা মানে কী? দশ বিশ বছর ধরে মামলা চালাতে হবে? কে চালাবে?

সুষমা হতভম্ব হয়ে বললো, 'শিমুরালি গিয়ে থাকবে তুমি?'

'উপায় কী? আবার রিমাইন্ডার এসেছে। অথচ বাড়িই বা পাচ্ছি কোথায়? মামলায় জড়াতেই হবে।'

হঠাৎ ঘাড়টা ফিরিয়ে বলে, 'এক বাড়িতে থেকেও যখন হাজার মাইল দূরত্ব তখন বাড়তি কী আর হবে।'

'আর তোমার অফিস?'

'অফিস? হাজার হাজার লোক ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করে ওখান থেকে। কেন আমাদের বিধুকাকাইতো করছে।'

কাকাকে সুমন আপনি আজ্ঞে বলে না। কারণ দুজনে একই বয়সী। আর একদা স্কুলে পড়ার আমলে, বিধু কলকাতায় এদের এখানে বেশ কয়েকবছর থেকে গেছে। অতএব তদবধি খুড়ো ভাইপোর প্রণয়।

'খুড়ো পারছেন বলে তুমিও পারবে?'

'পারবো ভাবলেই পারা যায়। কতো জিনিস তো পারা অসম্ভব ভেবে দিব্যি পারা যায়।'

'আর তোমার ভাই যদি বলে, দাদা আমার ঘাড়ে মামলার দায়টা চাপিয়ে কেটে পড়লো।'

সুমন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। 'বললে বলবে। কী আর করা যাবে?'

শিমুরালিতে এদের পিতৃপুরুষের ভিটে বাড়ি। জ্ঞাতি গোত্তররা এখনো সেখানে বসবাস করে কেউ কেউ। যাদের মধ্যে ওই বিধু। বিধুভূষণকেও ডাকে চিঠি দিয়ে সুমন নিজস্ব সংকল্প জানিয়েছিলো। সে তার উত্তরে একখানা পোস্টকার্ডে পরিপাটি ছাঁদে তিনটি শব্দ লিখে পাঠিয়েছে 'ওয়েল কাম। স্বাগত! আসুন! আসুন!

ব্যস আর কিছু নয়।

নাম অই খুড়ো বিধু!

খুড়ো বিধুরও একটা ইতিহাস আছে। বিধুভূষণ নামে সুমনদের একজন পিসেমশাইও আছেন।

সে যাক।

ওই তিনটি কাথই যথেষ্ট।

সুমনের এখন অস্থিরতা, দিনটা এলে হয়। আসছে কই? সুষমার যে নানান ফ্যাকড়া। সংক্রান্তি, মাস পয়লা, বেস্পতিবার। আবার আশ্চয্যি, শুভ শুক্রবারও এসে জোটে, অমাবস্যা।

'ভরা অমাবস্যায় এই চিরকালের বাড়িখানা ছেড়ে চলে যেতে চাও তুমি?'

'তা তোমার 'দিন' যে আর পাওয়া যাচ্ছে না। পরদিন তো আবার শনিবার ছুতো করবে।'

'সে তো করবোই। শনি মঙ্গলের মতো 'অশুভ' আর কোনো বার আছে না কি? সেই 'অশুভ' দিনে তোমার জন্মস্থান এ যাবতের বাসস্থান ছেড়ে চলে যাবো?'

সুষমার সব সময় মুখচোখ লাল লাল, ফুলো ফুলো।

সুমনের যুক্তি, 'আরে বাবা যতই চিরকালের হোক তবু ভাড়াটে বাড়ি বৈ তো নয়। যাচ্ছি তো চিরকালের পিতৃপুরুষের ভিটেয়। আর জন্মস্থান? ওটা আবার একটা কথা না কী? আমাদের মতোই গেরস্থালি সমাজে বেশির-ভাগ লোকেরই তো জন্মস্থান হয় মামারবাড়ি। তাহলে তো সবাইকে মামারবাড়ি আঁকড়ে পড়ে থাকতে হয়।'

সুষমা এতো যুক্তির ধার ধারে না। তার শেষ রায় হচ্ছে রবিবার।

অথচ সেইটাই তেমন ইচ্ছে ছিলো না সুমনের। রবিবার মানেই তো সুজয়ের উপস্থিতি। রবিবার মানেই তো বাচ্চাদের স্কুল ছুটি। সামনে দিয়ে এই বিদায়যাত্রার দৃশ্য রচনা?

ভেবে কূল পাচ্ছিল না সুমন।

কিন্তু শেষ অবধি দেখলো ভাগ্যই তার দুশ্চিন্তা লাঘবের ভার নিয়ে নিয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায়, বাপের বাড়ি গেলো এলা, স্বামী সন্তানদের নিয়ে। গঙ্গার মা মারফত সুষমাকে বলে পাঠালো. আজ যাচ্ছি, ফিরব কাল বিকেলে। তোমার বড় বৌদিকে একটু বলে রেখো।

গঙ্গার মা চোখ কপালে তুলে বললো, 'ওমা! ওনারা যে কাল ভোর সকালে দেশের বাড়িতে যেতেছে।'

'দেশের বাড়িতে?'

'হ্যাঁ গো। শিমুরালি না কোথায়।'

'বাঃ চমৎকার! আমাদের একবার জানানোর দরকার মনে হলো না? তোমায় কে বললো?'

'ডেকে হেঁকে বলে নাই কেউ কিছু। তবে কত্তা গিন্নীর কথাবার্তার আঁচ করতেছিলাম। তো আজই ডেকে বড় বৌদি বলল, আমরা দেশের বাড়িতে যাচ্ছি গঙ্গার মা। এই তোমার পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে নাও। আর এ বাড়িটা কখনো ছেড়ো না বাপু। ছোট বৌদিকে কষ্ট দিও না। 'নতুন লোক' জোগাড় করা শক্ত।'

'তা ভালো। শুনো বড় বৌদির কথা। ওনারা তাহলে আর ফিরবেন না?'

'তেমনি তরোই তো মন নিছে।'

'ঠিক আছে!'

চলে যায় এলা।

বাইরে ট্যাক্সিতে ঘন ঘন হর্ন বাজছে।

ট্যাক্সিতে উঠেই এলা বললো, 'কাণ্ড শুনবে? তোমার দাদা, বৌদি নাকি কাল—'

'জানি।'

'জানো? তুমি জানো? তোমায় কে কখন বলল?'

'আজ দুপুরে দাদা আমার অফিসে গিয়েছিল।'

বিধুর উচ্ছ্বাসটা মাত্রা ছাড়া।

'এই দ্যাখ সুমন এই দিককার এই দিকটা হচ্ছে তোদের ভিটে। বৌমা তুমিও এসো। দেখো এসে—এই রান্নাঘরে তোমার দিদিশাশুড়ি রান্না করতো। দিদিশাশুড়ি জানো তো? সুমনের ঠাকুমা।'

সুষমা হেসে ফেলে বলে, 'দিদিশাশুড়ি কাকে বলে জানিনা? আমায় কী ভাবেন।'

বিধু হেসে হেসে ঠাট্টার গলায় বলে, 'তা কী জানি। কলকাত্তাই মাইয়া।'

মডার্ণ। অতোসব গাঁইয়া কথা—তাছাড়া দিদিশাশুড়ি শ্বশুরের মাও হতে পারে, শাশুড়ির মাও হতে পারে।'

'বাঃ! শ্বশুরের ভিটেয় শাশুড়ির মা রাঁধতে বসতেন নাকি।'

খুব একচোট হাসি হয়।

কতোকাল যেন এমন প্রাণখোলা হাসির চাষ হয়নি।

সুষমা ভাবতে চেষ্টা করে। সুজয়ের বিয়ের সময় পর্যন্ত। তাই না?… বিয়ে বাড়িটা খুব সরগরম হয়েছিলো।

মনে পড়ে গেলো, সুষমা জেদ ধরেছিলো, সে সুজয়ের বরসাজ-এর সময় চন্দন পরিয়ে দেবে।

দিতে বসেও ছিলো। হঠাৎ সুজয়ের কে এক পিসতুতো না মাসতুতো দিদি এসে ঠোঁট উল্টে বলে বসলো, 'আহা! কি ছিরির চন্দন পরানো হচ্ছে। সরোতো—আমি পরাই।'

কিন্তু সুজয় প্রতিবাদ তুললো, না'। বৌদিই পড়াবে।'

পিসতুতো দিদি কাঁধ নাচিয়ে বললো, 'বাবাঃ। কী লক্ষ্মণ দাওর। দেখা যাক, এরপর কতোদিন এ ভক্তি টেকে।'

সেদিন সুষমা বুঝতে পারেনি। একথা কেন বলেছিলো ওদের অরুণাদি। পরে বুঝতে শুরু করলো।

বিধুর হাঁক শোনা গেলো, এই যে দ্যাখোতো বৌমা। সেই সুমনের ঠাকুমার আমলের তুলসী মঞ্চ। যেমনটি ছিলো ঠিক তেমনটি আছে। চুন-সুরকির পাকা গাঁথুনিতো নয়, 'মাটির কেল্লা'। রোজ নিকোনো-চুকনো হলে ঠিকই থাকে।'

'রোজ ওই নিকনোটা কে করে?

'করে ওই বুড়ি গয়লা বৌ। তিন প্রজন্মে এ বাড়ির কাজকরুনি।'

'প্রদীপ দেওয়া হয়?'

'হয় বৈকি। ওইতো দেখোনো মাঝখানের খুপরিতে কাত হয়ে পড়ে আছে পুড়ে কালো হয়ে। এটাও—ওই গয়লা বৌ মেজে চকচকে করে রেখে যাবে।'

'আর প্রদীপটা দেবে কে?'

বিধু হা হা করে হেসে নিজের বুকে হাত ঠেকিয়ে বলে, 'কে আর? এই এ বাড়ির ছোট বৌ। বড় বৌ তো দিল্লিওয়ালি। আর মেজবৌ কলকত্তাওয়ালি।'

অকৃতদার বিধু, সংসারের সব মেয়েলি কাজের ঠাটবাট বজায় রেখে চলে বলে, নিজেকে বাড়ির ছোট বৌ বলে।

পাড়ার গিন্নীরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ। হ্যাঁ, ছেলে বটে আমাদের বিধু। কুলের করণ-কারণ, লক্ষ্মী পুজো, নবান্ন, ভগবতী যাত্রা সব বজায় রেখেছে।

বন্ধু-বান্ধবরা বলে, এত সময় পাস কী করে? তাদের আড়তে হাজরে দেওয়ারতো কমতি নেই। চাকরিটাও তো বজায় রেখে চলেছিস।

চাকরিটা মানে গ্রামের হাইস্কুলের বাংলার মাস্টারি।

বিধু হেসে হেসে বলে, আরে বাবা, অ-সংসারীদের কি আবার সময়ের অভাব হয়? সময়টাকে তো কারোর পাদপদ্মে উৎসর্গ করে বসিনি। সবটা নিজের।'

ভারি মজার মানুষ এই বিধু।

দেখতে অবশ্য আদৌ সুচারু সুছাঁদ নয়।

তাতে কী, ওই অট্টহাস্যেই মেরে দিয়েছে।

সুষমা বলে, 'আপনার কাজের সঙ্গে স্বভাবটার মিল নেই। আমার তো ধারণা, স্কুল মাস্টার মানেই হাঁড়িমুখো নয়তো দাঁত খিঁচোনো।'

বিধু হাসে, 'ধারণাটা তাহলে পাল্টে গেল? জীবনের কতো ধারণাই পাল্টায় বৌমা। যতো দিন যাবে ততো টের পাবে। এই যে তোমার ধারণা ছিলো কলকাতা শহর ছাড়া মানুষ থাকতে পারে না কি? বাঁচে না কি?—ক্রমশ মনে হবে বাবাঃ, কলকাতার বদ্ধ বাতাসে টেকা যায় নাকি।'

যদিও শিমুরালিকে এখন কেউ গ্রাম বলে না। রীতিমতো একখানা টাউনই। তবু একদা তো গ্রামই ছিলো। সুমনের পিতামহীর আমলে।

তখন 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়, ছোটো ছোটো গ্রামগুলি' দিয়ে রচিত ছিলো জননী জন্মভূমি।

তথাপি তখনো শিমুরালির ধার দিয়ে ছিলো রেললাইন, ছিলো রীতিমতো রেল স্টেশন। সুমনের পিতামহ ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করতেন। রীতিমতো সরকারি চাকুরে। গন্তব্যস্থল রাইটার্স। সেই চিরন্তন লালবাড়ি।

না, ঘাটে গিয়ে স্নান করতে গা ধুতে কাপড় কাচতে হয় না সুষমাকে। ঘরে ঘরেই জলের কল। মিউনিসিপ্যালিটির। নেহাৎ যাদের নেই, তাদের অন্তত টিপকল আছে।

সুমনের অংশটিকে বিধু বরাবরই সুরক্ষিত রেখে এসেছে। পোড়োবাড়ির মূর্তি নিয়ে পড়ে নেই। তবে জলের লাইন আনিয়ে রাখেনি 'ট্যাকসো' বাড়বে বলে।

'এখন আনিয়ে নিবি।' বলে সুমনকে।

সুমন বললো, 'তোরা তো পুকুরে চান করিস।'

'আমরা আর কে? আপনি আর কোপনি। হ্যাঁ শখ হয় তাই করি। তবে চান করে এসে আবার টিউবওয়েলে সাবান মেখে ফ্রেশ হয়ে নিই।'

'তুই আছিস বেশ।'

'চেঁচিয়ে বলিস না। বৌমা শুনতে পেলে মান অভিমানের ঠ্যালা।'

'আচ্ছা খুড়ো, বিয়েতো করিসনি। তবু এতোসব জানলি কী করে?'

'ওরে ভাইপো, জানিস না, অভিজ্ঞতার পথ দুই প্রকার। কেউ ঠেকে শেখে, কেউ দেখে শেখে।'

এসব গল্প কখন হয়? সন্ধ্যার পর বেশ রাত করেই।

সুমন ফেরে ছটা পঞ্চাশের লোকালে। তারপর ফ্রেশ হওয়া, চা জলখাবার খাওয়া। অতঃপর বাড়ি সংলগ্ন রাধামাধবের মন্দিরের নাট মন্দিরে।

মন্দির জীর্ণ হয়ে এসেছে। তবু ভারি সুন্দর জায়গাটি।

কুলায় ফেরার মুখে পাখিদের বিশেষ বিশেষ সুর। মন্দিরের বিগ্রহের ঘন্টাধ্বনির সুর। এ সময় আর কাঁসর বাজেনা। শঙ্খধ্বনিও একটিবার—ফোকলা বুড়ো ঠাকুরমশাইয়ের ভাঙা গাল ফুলিয়ে কণ্ঠে ফুঁ দেওয়ার ফসল তিনটিবার কম্পিত ধ্বনি।...

কিন্তু তবুও ধ্বনি কি থেমে যায়?

সে ধ্বনি প্রকৃতির প্রধান সন্তানদের।

রাজ্যে 'বন নিধন' কার্যের কামাই নেই। 'বনসৃজন'-এর ছেলেমানুষী খেলার অন্তরালে অবাধে চলেছে সেই নিধনযজ্ঞ। তবু এখনো গ্রামাঞ্চলে, মফঃস্বলে কোথাও কোথাও গাছেরা আছে। গেরস্থ বাড়ির আনাচে-কানাচে। কুয়োর পাড়ের ধারে পাশে। মজে যাওয়া পুকুরকে ঘিরে। সেই সব গাছ-পালারা যেন রাতে জেগে ওঠে। আর যেন নিজেদের মধ্যে চুপিচুপি কথা কয়। কখনো ফিসফিস কথা চাপাহাসির শব্দ, কখনো বা ঝোড়ো হাওয়ার উত্তাল মাতামাতিতে, হা হা হাসি। আবার কখনো বা মাথা লুটিয়ে আর্তনাদ, হাহাকারের আওয়াজ তুলে। বলে ওঠে, 'আমরাই পৃথিবীর আদিম প্রাণী। আমরা জীবন্ত কিন্তু চলন্ত নই। তাই নীরবে শুধু তোমাদের কার্যকলাপ দেখে যাই। আমরা কখনো কখনো মাথা উঁচিয়ে ডালপালা দুলিয়ে তোমাদের গভীর রাত্রির অনন্ত বর্ণ গন্ধময় রূপরস সমৃদ্ধ লীলা অবলোকন করি। কখনো কোনো বিরহীর নিঃসঙ্গ শয্যার দিকে দৃষ্টি ফেলে তার বেদনায় সমবেদনায় ম্লান হই। আবার মিলন রাত্রির আকুল আবেগ আতিশয্য দেখে মনে মনে হেসে কুটি কুটি হই। আমরা জানি। 'অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা।' আমরা যে বাড়ির উঠোনে পুঁতে বসে থাকা চারাগাছটি থেকে বড় হতে দেখি। এদের সদ্যোজাত শিশুগুলোকেও বড় হতে হতে বুড়ো হয়ে যেতে দেখি। কতো পরিবর্তন কতো বিবর্তন। আমরা তো শুধু শীতে বসন্তে শুকনোপাতা ঝরাই। এরা এদের মানসিকতার ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আগুন ঝরায়, অশ্রু ঝরায়, ঝড় তোলে, বন্যা বহায়।'

এখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে।

ভাঙাচোরা মন্দিরটার মধ্যে সন্ধ্যারতি নামক নিত্য নিয়মের ধ্বনিটিও স্তব্ধ হয়ে গেছে। এখন শুধু ওই গাছেরা।

বোধহয় শুক্লপক্ষের মাঝামাঝি কোনো তিথি। আবছা চাঁদের আলোয়. দুই সমবয়সী প্রৌঢ় ভাঙা মন্দিরের নাটমন্দিরের সিঁড়িতে বসে প্রায় নীরবে আলাপচারিতা চালিয়ে যাচ্ছে।

একজনের ঘরের ঘরণী রাত অবধি নিজস্ব পুজোপাঠে নিমগ্ন। অতঃপর উঠে রান্নাঘরের তদারকিতে যাবেন এবং কোনো একসময় এসে ডাক দেবেন, 'আর কতোক্ষণ আড্ডা চলবে? খাওয়া দাওয়া হবে না?'

তিনি সেই 'ডাকটি পর্যন্ত' নিশ্চিন্ত। আর অপর জনের তো ঘরে ঘরণীর বালাই-ই নেই, কাজেই নিশ্চিন্ততার ঘাটতি মাত্র নেই। তিনি এ যাবত নিজেই নিজের ব্যবস্থা করে এসেছেন। রাত্রে 'রান্নাবান্নার' পাট থাকতোই না। সকালে যা পারা যায় সেরে রাখতেন। সেটা খাদ্যযোগ্য না থাকলে টিনেভরা মুড়ি চিড়ে তো থাকেই।

সেসবও তেমন অপছন্দ হলে, পাড়ার ননী ময়রার দোকানটা তো খোলা থাকে রাত নটা-দশটা অবধি। দোকান ঘরের পিছনেই ননীর ঘরসংসার। কাজেই দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করার তাড়া নেই।

তার কাছে গিয়ে বললেই হলো, 'কী ননী? কী আছে তোমার স্টকে?'

এখন অবশ্য বিধু খুড়ো সুমন ভাইপোর সংসারের একজন হয়ে গেছে। সুষমা ছাড়েনি। তবে একটা শর্তে রাজি হয়েছেন খুড়ো। গেস্ট হবেন। তবে পেয়িং গেস্ট। নচেৎ নয়।

অতএব তাতেই রাজি হতে হয়েছে।

সংসার না করেও ঝানু সংসারী বিধু খুড়ো বলেছেন 'দ্যাখ সুমনা, তুই··· চিরকেলে একটা আলাভোলা। তুই আমার প্রস্তাবে অভিমান করছিস, আহত হচ্ছিস, কিন্তু, তোর মতে চললে, শেষ রক্ষে হবে নারে। তখন মনে হবে, খুড়ো বেশ মওকায় আছে।'

'আমায় তুই তেমনি ভাবিস?'

ভাবি না। তবু ভবিষ্যতে কী হয় না হয় কে বলতে পারে? তুই না ভাবতে পারিস, তোর বৌ মানে বৌমা ভাবতে পারেন।'

'ও কী তেমনি মেয়ে? তাই মনে হচ্ছে তোর?'

ওরে এখন হচ্ছে না। তবে এই বেড়ালই বনে গেলে বনবেড়াল হয় বুঝলি?'

অতএব ওই শর্তে রাজি হতে হয়েছে। সুমনের মনের সেই অভিমানের খোঁচাটা ঘুচে যাওয়ায়, দুই বন্ধুর বড় সুখেই দিন যাচ্ছে।

বসে থাকতে থাকতে সুমন বলে উঠলো, 'খুড়ো দেখেছিস নারকেল গাছ-

গ্লোর মাথা লোটাল্টি। যেন কাকে কুর্ণিশ করে চলেছে। এই হেলে পড়ে মাথা নিচু করছে। এই আবার সোজা হয়ে উঠছে।'

'আরে ব্বাস। তুই যে দেখছি, এখানে এসে কবি হয়ে উঠলি? আমার তো এতশত মনে হয় না।'

'কি জানি, দেখে দেখে আমার তাই মনে হচ্ছে। শুনলে হাসবি, মনে হচ্ছে গাছেদেরও যেন একটা নিজস্ব জগৎ আছে। তারা হাসে, কাঁদে, মানুষজনেরা ঘুমিয়ে পড়লে কথাবলাবলি করে।'

'ওরে বাবারে। এতো রীতিমত কাব্যি ভূত ঘাড়ে চাপার লক্ষণ রে ভাইপো। সামাল দে। বুড়ো বয়সে কি শেষে কোথাও ফেঁসে বসবি?' বলে হা হা করে করে হেসে উঠে।

'নারে খুড়ো। আমার মনে হচ্ছে, এই রকম শহর ছাড়া জায়গায়, পাড়া গাঁয়ে-টায়ে এখনো প্রকৃতির রাজ্যটার কিছু কিছু আছে।...মানুষ তার বশ হযে থাকে। মানুষের মধ্যে একটা নরম ভাব থাকে।'

'ঘোড়ার ডিম থাকে। তাহলে আর শরৎবাবুকে 'পল্লীসমাজ' লিখতে হতো না।'

বিধু খুড়ো গলা ঝেড়ে বলে, 'রবিবাবুর সেই 'বুকভরা মধু বঙ্গের বধুরা'ও আর নেইরে ভাইপো। নেই মানুষে একতা ভালোবাসা।'

বলেই হঠাৎ বলে ওঠে, 'আচ্ছা তোর কী মনে হয়রে সুমনো? জিনিসটা কী ছিলো কোনদিন?'

সুমন চমকে উঠে বলে, 'কোন জিনিসটা?'

'ওই যে "ভালোবাসা" নামের জিনিসটা। সত্যিকার নিছক ভালোবাসা।'

'ছিলো না?'

মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়। মনে হয় ব্যাপারটা হয়তো কবি বন্দনাই।'

'তোর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে খুড়ো। একা একা থেকে এই সব কুটকচালে চিন্তায় মাথাটা ঝুনো হয়ে গেছে।'

'তাই মনে হচ্ছে তোর? তাহলে বল, সুজয় তোর সঙ্গে এরকম ব্যবহার করলে কী করে? ছেলেবেলার সেই ছেলেটাকে যখনই ভাবতে কিছু হিসেব মেলাতে পারি না। তুই পারছিস? সেই দাদা অন্ত প্রাণ। দাদা' বলতে অজ্ঞান, দাদা' যেন ভগবান'। এমন দেবদূতের মতন ছেলেটা। সেই ক্ষুদে জয়। একে রাগাবার জন্যে বলতাম, 'ওঃ! ভারি একেবারে দাদা দাদা দাদা। তোর দাদাটাতো একটা হাঁদা ভোঁদা গাধা। ব্যস, সে কী রাগ। আমায় আঁচড়ে কামড়ে মেরে ধরে, হাঁপাতে হাঁপাতে 'তুমি! তুমি। তুমিই ওইসব বিচ্ছিরি! তুমি হাঁদা ভোঁদা গাধা নাক খাঁদা, পেট গোদা। আবার কখনো যখন বলতাম, দূর বোকা ওসবতো তোকে রাগাবার জন্যে বলছি। তোর দাদার

মতন ভালো ছেলে পৃথিবীতে হয় না।' তখন আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলতো, 'বিধুকাকা। তুমি খুব সুন্দর ছেলে। নক্‌খি ছেলে।' তা সত্যি বলতে বড়ো হয়ে পর্যন্তই প্রায় সেই রকমইতো ছিলো! ওর বিয়ের সময় গিয়েও তো দেখেছি। সর্বদা দাদা। দাদা। দাদাকে চক্ষে হারাচ্ছে। আর কারোর কোনো কথা শুনবে না। বলবে, দাদা যা বলবে তাই হবে। হঠাৎ কখন কোন ফাঁকে পাশার দান উল্টে গেলো। গুটিগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে যা নয় তাই হয়ে গেলো।'

শুনতে শুনতে সুমনেরও বুকটা টনটন করে ওঠে। সত্যিইতো ছেলেবেলায় কেউ যদি ওর হাতে একটা টফি কি লজেন্স দিতো, মুঠোর মধ্যে রেখে দিতো। যতোক্ষণ না দাদার সঙ্গে দেখা হতো। হলে জিগ্যেস করতো 'দাদা' খাবো?

দাদা তো অবাক।

'খাবি না কেন?'

'তোকে না বলে খাবো নাকি?'

'কী পাগলারে তুই! কেন খাবি না? খা খা।'

'তুই তা'লে একটু খা।'

নেহাৎ পিঠোপিঠি নয়, সাত-আট বছরের ছোট বড়। তবু তুইটাই রপ্ত ছিলো।

আঃ কী সেই দিনগুলো ছিলো।

অন্যমনা হয়ে যায় সুমন।

খুড়ো বলে, 'ধ্যেৎ জয়টার কথাটা তুলে তোর মনটা খারাপ করে দিলাম। বেশ কাব্যি করছিলি।'

সুমন মলিন হাসে। বলে, 'তুই আর নতুন করে কী করবি? নিজেইতো মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই। মানুষ এতো বদলে যায় কী করে?'

বিধু হঠাৎ বলে ওঠে, আসল পাপী হচ্ছে মেয়েমানুষ। বুঝলি? ওদের কলকাঠিতে এইসব বুদ্ধু বেটাছেলেগুলো - '

থেমে যায়।

সুষমার ডাক শোনা যায়। ওর রান্নাঘরের একদিকের কোণের একটা জানলা খুললে, বাগানের এই অংশটার কিছুটা চোখে পড়ে। আর ওখান থেকে মুখ বাড়িয়ে এবং গলা তুলে ডাক দিলে এখানে এসে পৌঁছয়। 'কী আজ আর খাওয়া দাওয়া হবে না? কাল থেকে যেন খুড়ো ভাইপো আড্ডা দিতে বসবার সময় হাতে ঘড়িটা বেঁধে বসা হয়।'

বিধু খুড়ো বললেন, 'ওই। দেখলি তো? বৌমাটি এত ভালো মেয়ে' তবু এই হিংসেটুকু আছে।'

'হিংসে?'

'তা হিংসে ভিন্ন আর কী ? আসলে দুটো বেটাছেলে মগ্ন হয়ে একটু মন প্রাণের কথা কইছে, দেখলে, মেয়েছেলেদের প্রাণে সয়না, চোখ টাটায়। তা সে লোকদুটো বাপ-ছেলেই হোক, কি খুড়ো ভাইপো, মামা-ভাগ্নে, কি ভাই-ভাইই হোক। আর বন্ধু হলেতো কথাই নেই। ফেটে মরবে।

সুমন হেসে ফেলে বলে, 'তা দুটো পুরুষ মশগুল হয়ে মন প্রাণের কথা বলতে বসলে, সময়ের জ্ঞান হারিয়ে বসে যে। মেয়েদের মতো তো 'সংসার' এর পিছুটান নেই। তো সময়ের জ্ঞান হারানো আড্ডার মাঝখানে মাঝে মাঝে হাতুড়ি ঠুকতে হয় বৈকি। তুলনা করলে শুনতে খারাপ, কিন্তু আমার মনে হয়, পুরুষ জাতটা যেন শুধু একটা তেলভরা গাড়ি। চলনশক্তি আছে। কিন্তু একটা চালক থাকা দরকার। এখানে চালক মানে 'চালিকা'। তার হাতে স্টিয়ারিংটি থাকবে। তার ইচ্ছে মতো পথে চালাবে। তো সেই চালিকাটি যার ভাগ্যে যেমন জোটে।'

খুড়ো বললো, 'তুই এতো কথা ভাবিস ? ভাবতে জানিস ?'

'আগে জানতাম না এখন দেখছি—ভাবতে শিখছি।'

এইসময় জানলার কপাটে একটা ঘটি বাটি কিছু ঠোকার শব্দ হলো। অর্থাৎ তাড়া দেওয়ার এক অভিনবপন্থা।

রাতের খাওয়ার কোনো বালাই ছিলো না বিধুর। আর এখন সেটাই জব্বর। কারণ সুষমার বাতিক। বলে, 'বিকেলে জলখাবার খাওয়ার পাট নেই। রাতে একটু ভালমন্দ না খেলে শরীর টিকবে কী করে ?'

বিধু গম্ভীর ভাবে বলে ও কথা সুমনের ব্যাপারে বলতে পারো বৌমা। এই খুড়শ্বশুরটির ব্যাপারে নয়। সে এখনো এই শরীরখানি রেখেছে কেবলমাত্র নিজের ক্যাপাসিটিতে।'

'আপনার খুব অহঙ্কার।'

'তা অহঙ্কারের উপযুক্ত বিষয় থাকলে আসবেই অহঙ্কার। মা নেই স্মরণ কালের মধ্যে। পিসির হাতে মানুষ। তো তাঁর ধারণা ছিলো, ছেলেটার পেটের মধ্যে যতো বেশি মাল চালান করাতে পারা যাবে, ততই কর্তব্য, ততই পাগল. ছেলেটার বাড়বাড়ন্ত। কতো কষ্টে তাঁর হাত থেকে পালিয়ে পালিয়ে কোনোমতে হাতি হয়ে ওঠার থেকে বেঁচেছি।'

অতএব হাস্যরোল।

আর সুমনের মনে হয়, আহা! কী সুখেই আছি। খুব মোক্ষম ডিসিসানটা নেওয়া হয়েছে। দেশে চলে আসা। যদি কলকাতার সেই বাড়িতে দুই ভাই মুখ দেখাদেখি বন্ধ করে, দিন কাটিয়ে চলতে হতো ? উঃ।—

শহরের আরাম নেই সত্যি, তবে শান্তি আছে। ভাঙা বাড়ি, হাড় পাঁজরা বার করা দেয়াল, মাথার ওপর ঝুলে পড়তে আসা ছাত। তবু শান্তি।

তবে সুষমার জন্যে মন খারাপ লাগে। বেচারি! কতো সব সুবিধের জিনিস ছিলো ওর। গ্যাস-এর উনুন, ইলেকট্রিক স্টোভ, হিটার, টোস্টার, ফ্রিজ, বাটনাবাটার পর্যন্ত যন্তর। আর সর্বোপরি ইলেকট্রিক পাখার অভাব। সুষমা যখন গরমে ঘেমে তালপাতার পাখাখানা নেড়ে নেড়ে বাতাস খায়, সুমনের প্রাণটা করকর করে ওঠে।

আর তখনি ভাবতে বসে জীবনযাত্রার ভঙ্গিটার হঠাৎ বদল ঘটে বসলে পুরুষের থেকে মেয়েদেরই কষ্ট বেশি হয়।

মায়া আসে। নিজেকে স্বার্থপর মনে করে কষ্ট হয়। খুড়োকে বোঝাতে হবে এই কষ্ট হওয়ার নামই হচ্ছে 'ভালোবাসা'।…

রাতে সুষমা বলে 'খুড়ো ভাইপোর এত কী আড্ডা হচ্ছিলো?'

'আবোল তাবোল। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, মেয়েদের ওপর ওর দারুণ বিদ্বেষ।'

সুষমা হেসে বলে, 'তাহলে ধরে নিতে হয়, কখনো কোনো মেয়ের কাছে দাগা খাওয়ার ফলেই ওনার এই সংসার বৈরাগ্য। গ্রামসেবা, জনসেবা ওসব পরবর্তী কথা।

'দূর! ওটা চিরকাল কাঠখোট্টা।'

'তা তুমি যাই বলো, আমার তো মনে হয় -তাই জন্যেই বিয়ে শাদিতে মন হয়নি—'

'দূর। ওসব কিচ্ছু না। ওটা চিরকালই কাটখোট্টা রসকষহীন।'

'বাইরে থেকে কী সব কিছু বোঝা যায়? তা ছাড়া মানুষের কত বদল হয়।'

তা বদল যে হয়, সে প্রমাণ তো হাতে হাতে পেয়েই এসেছে সুমন তবু আরো বেশ কিছু পাবার বাকি ছিলো।

সেই বাকিটা এল একখানা ডাকের খাম বাহিত হয়ে। পিয়নের হাতে।

খামের ওপর অতি পরিচিত একটি হাতের লেখায় নিজের নামটা দেখেই বুকটা ছলকে উঠলো সুমনের।…

তাহলে নিশ্চয়ই এর মধ্যে ভরা আছে একটি অপরাধী অনুতপ্তের কাতর আবেদন 'দাদা ফিরে এসো। দাদা আমরা টিকতে পারছি না। দাদা আমি ভুল করেছিলাম।'

কাঁপা কাঁপা হাতে ছিঁড়লো চিঠিখানা আর তারপরই বসে পড়লো সবটা না পড়েই।

হাতের লেখাটা চিরপরিচিত। কিন্তু ভাষাটা?

শুধুই কি অপরিচিত? অভাবিত, অপ্রত্যাশিত নয়?

বড় বেশি আশা করে চিঠিটা খুলে ছিলো বলেই বোধহয় বুকের ওপর এমন একখানা বিশাল হাতুড়ির ঘা পড়লো।

মন্ত্রের মধ্যে কি কালসর্পের বিষ নিঃশ্বাস ছিল ?

হাতের লেখাটা সত্যিই মন্ত্রের মতো। কারণ সুমনের ওইটার ওপর খুব ঝোঁক ছিলো। ছেলেবেলায় কেবলই টিটকিরি করতো, হাতের লেখাটায় ভালো করে মন দিস জয়। ওর জন্যেও ভালো নম্বর পাওয়া যায় জানিস ? যাঁরা খাতা দেখে তাদের মন ভালো হয়ে যায় পরিষ্কার লেখা দেখলে।'

সেই হস্তাক্ষরে লেখা চিঠিটা—

না কোনো সম্বোধন নেই। বিনা সম্বোধনের চিঠি।

'বাঃ। বেড়ে। চমৎকার। ওঃ। এতদিনে চেনা গেলো। বোঝা গেলো ভালোমানুষী ছদ্মবেশে মানুষ কতো শয়তান হতে পারে। স্রেফ ভিজে বেড়ালটি। ভাঙ্গা মাছ উল্টে খেতে জানে না।···তবে ভেবোনা তোমার এই শত্রুতায় আমি দমে যাবো। ব্যাটা বাড়িওয়ালাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তুমি বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে দেশের বাড়িতে বসবাস করতে যাচ্ছো।··· কেমন !···অথচ ভালই জানো ভাড়াটে হিসেবে নামটি হচ্ছে সুমন ব্যানার্জি'র।'

'অতএব ?'

'অতএব সুজয় ব্যানার্জি হচ্ছে জবরদখলকারী। বাড়িওলা তার নামে কেস ঠুকে পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে রাস্তায় বার করে দিতে পারে।'

'কেমন ? এইতো ? তবে শালা সুজয় ব্যানার্জি কেঁচো নয়। সে কাল কেউটে। তাকে ঘাটাতে গিয়ে পার পাবে না সেই হারামজাদা বদমাশ বাড়িওলা-ব্যাটা। শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে যেতে হয় তাও যাবে সুজয় ব্যানার্জি। তবে সুমন ব্যানার্জি'র কায়দায় প্যাঁচে পড়ে সুড়সুড় করে বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে পথে নামবে।' আরো কত কথা। চারপাতা জোড়া।

এতটা পর্যন্ত কি ভালো করে পড়তে পেরেছিলো সুমন ? সুমনের কী চেতনা ছিলো শেষ পর্যন্ত ?

চেতনা থাকলে তো টের পেতো বাড়িতে ভিড় জমে উঠেছে। ডাক্তার এসেছে স্টেথস্কোপ গলায় ঝুলিয়ে।

না কিছুই টের পায়নি সুমন ব্যানার্জি।

চিরদিনের প্রবাসী বাঙালি সেই বাড়িওয়ালা সুজয়কে সুমনের বাড়ি ছেড়ে দেবার খবর দেওয়া চিঠিটির জেরক্সকপির সঙ্গে নিজের চিঠিতে জানিয়ে ছিলেন, বাড়িটা যখন ক্লিয়ার পাওয়া যাচ্ছে, তখন আশা করি ওটাকে বিক্রি করবার পক্ষে আর কোনোরকম অসুবিধা রইলো না। অতএব তিনি খদ্দের খুঁজছেন।··· এবং আশা রাখছেন নিশ্চয়ই সেটি সমাধা করতে পারবেন।···

চিঠির শেষে ধন্যবাদও জানিয়েছেন সুজয় ব্যানার্জিকে। তাঁদের উদারতার জন্য।···কারণ একালে ভাড়াটেরা বাড়িওলাকে যে পরিমাণ হ্যারাস করে, তা তাঁর শোনা আছে।

চিঠিটা দেখে এলা বলে উঠেছিল, 'দেখলে তো? মানুষ চিনলে তো? দাদা। দাদা। কোনো অন্যায় কাজ করতেই পারেন না। দাদা মহাপুরুষ। দাদা ভগবান!...নিজে ইচ্ছেমতো দুটো রাঁধবো বাড়বো, স্বামী সন্তানদের খাওয়াবো, এই সাধটুকু মেটাবার স্বপ্ন আমার। তুমি একেবারে মরমে মরে গেলে। দাদাকে আর মুখ দেখাতে পারলে না। এখন টের পেলেতো কেমন চিজটি তিনি? ছোট ভাইটা বৌ-ছেলের হাত ধরে পুলিশের গলা ধাক্কা খেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে যাক, এই মতলবটি ভেঁজে, তলে তলে বাড়িওলার সঙ্গে সাঁতাত করে এই কর্মটি করা হলো। সুয়ো হলেন তার কাছে। দেখুন মশাই আমি কতটা ভদ্রলোক। যেই আপনি বাড়িটি ছেড়ে দিতে বললেন, সেই ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি।

এলা বলেই চলে আরো অনেক কিছু।

শুনতে শুনতে আগুন হয়ে গর্জে ওঠে সুজয়—কী? পুলিশের গলা-ধাক্কা খেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে যেতে হবে? অ্যাতো সোজা? আইনের ফাঁক-ফোকর নেই? বলে কত রাঘব বোয়াল বেরিয়ে যাচ্ছে সেই ফাঁক দিয়ে আর এতো হতভাগা চুনোপুঁটি সুজয় ব্যানার্জি। দেখছি কোন শালা আমায় এই বাড়ি থেকে ওঠাতে পারে। দরকার হলে সুপ্রিমকোর্ট পর্যন্ত যাবো। মামলায় সর্বস্বান্ত হতে হয়, সেও আচ্ছা। জানো এক একটা বাড়িওলা ভাড়াটের মামলা বিশ বছর চলে। আর তারপর ব্যাটা বাড়িওলাই হেরে গিয়ে ভাড়াটেকে মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে তবে ওঠাতে পারে।'

সুজয় সাপের মতো গজরাতে থাকে।

তারপর ওই পত্রাঘাত।

যা না কি অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের মতোই হলো।

কিন্তু সেই আসাতে সত্যিই মৃত্যু ঘটলো সুমন ব্যানার্জির?

স্টেথিস্কোপ গলায় ঝোলানো পাড়ার হাতুড়ে ডাক্তার রোগীকে দেখে, বিনা বাক্যে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন। আর বাইরে ভিড় করা পড়শীদের দিকে তাকিয়ে ইশারায় বলে গেলেন, 'হয়ে গেছে, করার কিছু নেই।'

হ্যাঁ অ্যাতো সোজা নয়।

এ তো সিনেমা না যে দর্শক দেখবে, বাড়ির কর্তা, এতটুকু অপমানে, কী অভিমানে ক্ষোভে কিম্বা ক্রোধে বাঁ হাত খানা দিয়ে বাঁদিকের বুকটা চেপে ধরলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন।...

তারপর?

তার পরবর্তী দৃশ্যই-তো ছবির পর্দার একধারে চিতার আগুন...গিন্নিরও লুটিয়ে পড়া। এবং অতঃপর বৈধব্য বেশ।

ঘরের দেওয়ালে কর্তার ছবি দোদুল্যমান। গলায় ফুলের মালা।...

নাঃ, এ বাপ্‌ তেমন হলো না। কারণ এটা সিনেমা নয়। কঠিন বাস্তব!

অতএব সুমন ব্যানার্জি ওই পত্রাঘাতে বসে পড়লো বটে, এবং লুটিয়েও পড়লো, তবে পাঁচজনে ধরাধরি করে তাকে শ্মশানঘাটে নিয়ে গেল না। ধরাধরি করে তুলে ঘরের খাটের বিছানায় শুইয়ে দিলো।

তবে আগুন কি আর একেবারেই দেখা গেল না কোথাও?

সে আগুন লোকটার মাথার মধ্যেকার কলকব্জাগুলোকে কিঞ্চিৎ বিকল করে দিয়ে কিছুদিন আচ্ছন্ন করে রাখলো।

যে আচ্ছন্নতার মধ্যে সে এক সুদূর অতীতের প্রেক্ষাপটে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

সেখানে একটা ফুটফুটে ছোট্ট ছেলে হামা টেনে বেড়াচ্ছে···একটা ছোট্ট ফুটফুটে ছেলে খাট ধরে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে হাঁটি হাঁটি পা ফেলছে।

ক্রমশ দামাল হয়ে উঠে ঘরবাড়ি তছনছ করছে··হঠাৎ একটা স্কুলের পড়া তৈরিতে রত বালকের বইখাতার ওপর চড়াও হয়ে থাবড়ে থাবড়ে বইখাতাগুলোকে ময়লা করছে, ছিঁড়ছে, টানছে।···

বিপন্ন বালকটি কাতর আর্তনাদ করে উঠছে পিসিমা।···পিসিমা। তুমি কোথায়? কী করছো? একে একটু ধরোনা! আমি পড়ব না?

পিসিমা নামের এক থানপরা, চুলছাঁটা মহিলা এসে খনখনিয়ে বলে ওঠেন, 'পিসিমার কাজকম্ম নেই? ওকে কোলে করে বসে থাকবে? ওই জন্যেই তো বলি। ঠ্যাঙে একখানা গামছার কোণ বেঁধে খাটের পায়ার সঙ্গে বেঁধে রাখ। তা ও তো প্রাণে সয়না বাবা তোমার।'

ছেলেটা ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'কী? ওকে পায়ে দড়ি বেঁধে আটকে রাখতে হবে গরু ছাগলের মতো?'

'তা না রাখিস তো লেখাপড়া ঘুচিয়ে তাই কোলে নিয়ে বসে থাক। আমার মরবার ফুরসত আছে?'

আবার কখনো বা নিজের একখানা ভিজে গামছা কোমরে জড়িয়ে (বোধ হয় শুচিতা বাঁচাতে) চলে আসেন। দস্যি দামালটাকে নড়া ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলে যান, 'এতো করে বলছি তোদের বাপকে আর একটা 'বে' কর। নইলে কে এই সংসারখানা দেখবে? কে এই দামালকে মানুষ করবে? আমার গুরুগঙ্গা ইষ্ট এসব নেই? তো কান দিচ্ছে সে কথায়?'

আচ্ছন্ন মস্তিষ্ক লোকটা দেখতে পাচ্ছে সেই স্কুলে পড়া বালক ছেলেটাকে পিসির কাছ থেকে টেনে নিয়ে সগর্জনে বলে উঠছে, 'কী? বাবা আবার বিয়ে করবেন? একটা সৎমা আসবে আমাদের? যাও যাও, তুমি নিজের কাজ করোগে। নিতে হবে না ওকে। আমি ইস্কুলে যাব না—ব্যস।···'

তারপর দেখতে পাচ্ছে একটা নাবালক ভৃত্য এসেছে সেই দুষ্টু দস্যি দামাল বাচ্চাটাকে সামলাতে। তা সামলাতো প্রাণপণে।

আর স্কুলের ছেলেটা ?

সে অহরহ পাখি পড়ার মতো শেখায় তাকে, খবরদার একে একলা ফেলে কোথাও যাবি না। সিঁড়ির দরজা সব সময় বন্ধ রাখবি।···ওর হাতের কাছে কিচ্ছুটি রাখবি না। আমার বইখাতা আমি তুলে রেখে যাবো, কিন্তু আরো তো কত কী আছে।·· বঁটি, কাটারি, ছুরি, হামানদিস্তের ডাঁট, শিলনোড়া··· সব জিনিস থেকে ওকে দূরে দূরে রাখবি।

ছায়াছবির কাহিনী অগ্রসর হতে থাকে।

এখন দেখা যায় সেই ছোট্টো দামালটাকে আর সামাল সামাল করতে হচ্ছে না। সে দস্তুরমতো স্কুল ইউনিফর্ম পরে, জলের বোতল হাতে ঝুলিয়ে আর কাঁধে বইয়ের ব্যাগ ঝুলিয়ে স্কুল বাসে চড়তে যাচ্ছে, আর তার কিশোর বয়স্ক দাদা, হাস্যোজ্জ্বল মুখে তাকে বাসে চড়িয়ে দিয়ে, 'টা টা' করে নিজে স্কুলের পথে এগোচ্ছে নিজস্ব ইউনিফর্মে সেজে।

তারপর ?

তারপরও তো সেই সিরিজেরই ছবি। শুধু ওই দুটো ছেলের বয়েসের একটু পরিবর্তন।·· আর অতঃপর বড়টির স্কুল ইউনিফর্ম ত্যাগ।

এ দৃশ্যে স্কুলের গণ্ডি ডিঙিয়েছে সে।···

তারপর ?

প্রায় রোজই একটি ক্ষুব্ধ অভিমানাহত বালকের আক্ষেপ অভিমানের স্বর আছড়ে আছড়ে পড়ে। 'দাদা! দাদা! রোজ রোজ কেন দেরি করো তুমি ?··· কলেজ বুঝি রাত্তির পর্যন্ত চলে ? তুমি না এলে আমার বুঝি ভালো লাগে ? আমার বুঝি ভয় করে না ?···আমার বুঝি রাগ হয় না ? ··তাইতো আমি সন্ধেবেলা দুধ খাই না, পড়তে বসি না। পিসিকে জ্বালাতন করি। মাস্টার-মশাই এলে ভীষণ পেটব্যথা করছে বলে শুয়ে থাকি, পড়তে যাই না।···আর যখন বুঝতে পারি মাস্টারমশাই ভেগে গেছেন, তখন উঠে যত ইচ্ছে লাফাই খেলি।···ছাতে গিয়ে লাফাই।

দেরি করে কলেজ ফেরত ছেলেটা বলে ওঠে, 'অ্যাঁ! এই করিস তুই ? মাস্টার-মশাইকে মিছে কথা বলে ভাগিয়ে দিস ? জয়। তুই কী পাগলা-ছাগলা ? ছিঃ।'

'ইঃ। ছিঃ। দেখো রোজ ওই রকম করবো। কেন তুমি রোজ রোজ কলেজ থেকে আসতে দেরি করবে ? পিসি বলে। আড্ডা মারতে যায় তোর দাদা।' 'আড্ডা' কী ? কাকে মারতে যাও ?'

দাদা অবশ্য শুনে হাত ফাটাতো। অতঃপর বলতো, 'দূর বোকা। 'আড্ডা' মারা মানে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করা, মারাটারা নয়।'

'তা গল্প করতেই বা যাও কেন? দেরি করলে আমার খারাপ লাগে জানো না? ওই পাজি বন্ধুগুলো কোনোদিন এলে আমি ওদের এমন মারব না। দেখিয়ে দেবো মজা রোজ রোজ তোমার দেরি করিয়ে দেয়।'

ছোট্ট ছেলেটাকে আর কী করে বোঝাবে তার সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ দাদাটি, বন্ধুরা তার দেরির কারণ নয়। দেরির কারণ অন্য।

সেই বয়সেই ওর সুমন নামের ছেলেটা ছোটো খাটো দু'টিনটে টিউশানি ধরেছিল। অর্থাৎ ধরতে হয়েছিলো তাকে। কারণ 'জয়' নামের ছোট্ট ভাইটা যে তার সব আবেগ আকাঙ্খা আবদার দাদার কাছেই পেশ করে।

'দাদা! দাদা। জানো, আমাদের ক্লাশের কত ছেলে হাতে ঘড়ি পরে আসে।'

'সেকি রে? ধ্যাৎ। এতটুকু ছেলেরা হাতে ঘড়ি পরে?'

'না! পরে না বৈকি! দেখবে চলো না! পার্থ, সন্দীপ, দীপঙ্কর, কৌশিক-সব্বাই। দেখে না যা রাগ হয় আমার।'

'দাদা! আমার বন্ধুদের সব্বাই অ্যাতো অ্যাতো পকেটমানি পায়। ওরা তাই যা ইচ্ছে খরচ করতে পারে। জানো? বাড়ি থেকে নিয়ে আসা টিফিন ফেলে দিয়ে, টিফিনের সময় চুপিচুপি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ফুচকাওলা আমসত্ত্বওলা অবাক জলপানওলা কেকওলাদের কাছ থেকে যা ইচ্ছে কেনে।'

'আমার না যা রাগ হয়।· আমাকে রোজ রোজ সেই পচা পচা লুচি আলুর তরকারি আর সন্দেশ খেতে হয়।'

'···দাদা। জানো আমাদের ক্লাসের অনিন্দ্যর ছোটকা তাকে এমন ফাইন একটা ক্যারাম বোর্ড কিনে দিয়েছে, সে না কী একদম অপূর্ব।· দাদা ওদের সব্বাইয়ের ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট আছে···দাদা···আমার ক্লাসের সব্বাই নাইলনের মোজা পরে। আমার মোজা দেখে হাসে। গুটিয়ে ঝুলে পড়ে তো··· ···দাদা! তুমি কলেজ যাওয়ার সময় রুমাল নাও না? এ মা!···আর আমার ক্লাশের ছেলেরা দুটো করে রুমাল নিয়ে আসে। আমায় বলে, "তুই রুমাল আনিস না" আমি মিছিমিছি করে বলি 'আমিতো আজ ভুলে গেছি।' বলি পকেট থেকে পড়ে হারিয়ে গেছে। দাদা! দাদা! আমার বন্ধুদের না সব্বাই একগাদা করে ডটপেন নিয়ে আসে। আর 'গন্ধ' রবার। ···দাদা জানো— ক্লাশে আন্টি বলে দিয়েছেন, এবার থেকে ছবি আঁকার জন্যে ক্লাশ থেকে খাতা, রং তুলি সব কিনতে হবে। অনেক টাকা লাগবে।'···

তা এসবের কিছুটা প্রতিকার করতে হবে না ওই ছেলেটার দাদার? ··

শুধু ছোট ছোট টিউশানি দিয়েই কী হয়? নিজের টিফিন খরচাও সেই বাবদ কাজে লাগাতে হয়। বাস ভাড়াটা বাঁচাতে অনেকখানিটা হেঁটে যাওয়া আসা করতে হয়।···

কিন্তু বাবা ছিলো না কি ওদের ?

ছিলো বৈ কি !

তবে সে একরকম আদর্শবাদী বাবা। তাঁর মতে—পাঠ্যাবস্থায় বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দিতে নেই। তাহলে তিনি তাঁর ছোট ছেলেটাকে হঠাৎ অমন একটা নামী দামী স্কুলে ভর্তি করে বসেছিলেন কেন ?

তার কারণ আলাদা।

ওই অঞ্চলে মাতৃহারা ছেলেটার ওপর হঠাৎ ওর মামাদের আদর উথলে উঠেছিলো তখন। বলেছিলো, 'জামাইবাবু বড় ছেলেটাকেতো একটা বাজে-মার্কা বাংলা স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে তার পরকাল ঝরঝরে করে রাখলেন। ভবিষ্যতে—কেরানিগিরি ছাড়া আর কিছু জুটবে ওর ? এই ছোটটাকে অন্তত একটু মানুষ করে তোলবার চেষ্টা করুন।'

সেই চেষ্টায় তাঁরাই হাত লাগিয়েছিলেন, সুমন সুজয়দের বাবার ক্ষীণ আপত্তিটুকুকে নস্যাৎ করে দিয়ে।

'মানুষ হবার মতো স্কুলে ছেলে ভর্তি করা তো সোজা কথা নয় ? অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে তবে ভর্তি করা।

তা তে কাঠ খড়টা নাকি তাঁরা নিজেরাই পুড়িয়ে ছিলেন। কারণ এদের নীতি বাগীশ বাবাটি যে 'ঘুষ দেওয়ার ব্যাপারে একদম রাজি হবেন না, এমন কী দিতে হবে অর্থাৎ 'দিতে হয়' এ খবরটুকু জানতে পারলেও মামাদের সাধে বাদ দিয়ে বসবেন এ তাদের জানা।

অতএব বাবার বড ছেলেটিও সাধ্যপক্ষে বাবার কাছে 'জয়' এর আবদারের সংবাদগুলি পেশ করতো না।···

জয় এর স্কুলের বন্ধুরা যে স্কুলে 'সেন্ট' মেখে আসে তা শুনে হতবাক হয়েও সেই জিনিসও সাপ্লাই করেছে তাকে।

যদিও কী সেন্ট, কী নাম, কত দাম, কিছুই জানতো না। তার জানা জগতে একটি মাত্রই নাম ছিল 'অগুরু' কিন্তু সুজয় সেই শুনে হেসে উঠে বলেছিলো, ইস। গুরু 'অগুরু' আবার কী ? ওরা যে বলে 'ফরাসি সেন্ট।'

তা দোকানে জিজ্ঞেস করে অজানা জিনিসটির হদিস জেনেছিলো সুমন, কিন্তু দাম শুনে, বিছে কামড়ানোর মতো শিউরে ছিটকে উঠেছিলো।···

তথাপি সে জিনিসও সংগ্রহ করে ফেলেছিলো ভাইয়ের জন্যে। ভরসা এই এক শিশিতেই কাজ হয়। এক শিশিই চলবে অনেক দিন।

সেন্ট বলে কথা। খাবার জিনিসতো নয়, যে লুকিয়ে চুরিয়ে চালানো যাবে। তাও আবার ফরাসি মার্কা। সেতো আর লুকিয়ে চুরিয়ে মেখে গিলে ফেলা যায় না। বাবা ধরে ফেললো একদিন।

'হ্যাঁরে সুমনো। জয় সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো। কিসের এতো 'খোশবু' ছড়িয়ে গেলো ?'

সুমন থতমত।

'খোশবু ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। এসেন্স এসেন্স গন্ধ পেলাম না ? তুই পাসনি ?'

ও হ্যাঁ। পেয়েছি বটে। তো সে এক ইতিহাস। ক্লাসের কোন বড়লোকের ছেলে তার সেন্টমাখা একখানা রুমাল। জয় বেচারির প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছিলো।

অ। তা প্যান্টটা কাল কাচিয়ে দিতে বলিস।'

যেন প্যান্টে কোনো 'অপকর্ম'ই' করে বসেছে দশ এগারো বছরের সুজয়টা।...

এইভাবেই চলেছিলো কতো দিন।

সেই 'দিন' গুলো একটা আচ্ছন্ন হয়ে থাকা মাথার মধ্যে হিলহিল করে ঘুরপাক খেয়েছে।

তারপরের ছবি ?

সেখানে 'বাবা' নামক কোনো ব্যক্তির অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে না। বাবা নেই।...বাড়িতে থাকতে শুধু পিসি আর সুমন সুজয়। তখন পিসিও বলছে. হ্যাঁরে সুমনো। জয়টার এতো বাহার-বিলাস আসছে কোথা থেকে ? তোদের বাপের অফিসের সেই একসঙ্গে থোক পাওয়া টাকাটার সুদ থেকেই সংসার চলছে না ?

'বাহার-বিলাস আবার কী পিসি ? তো আমিও তো যেমন তেমন একটু আয় করছি —'

'অ্যাঁ। তাই না কী ? চাকরি পেয়েছিস ? কই বলিসনি তো ? তা বলবি কেন ? 'পিসি' আবার কে ? দাসী বাঁদীর একজাত বৈ তো না। তো জানতে পারলে একটু পুজোটুজো দিতুম।' 'কী আশ্চর্য ! চাকরি পেয়েছি কে বলল ? এই একটু ছেলে পড়ানো-টড়ানো করে —'

'তা সেটুকুই বা ভাইয়ের বাহারের পেছনে ঢালা কেন ? নিজের আখের নেই ?'

ওঃ ! কত কষ্টে পিসির আক্রমণ থেকে ছাড়ান পাওয়া।

তবে ছাড়ান পাওয়ার উপায় কী ?

সেই সময়কার পরিবেশে জীবনটাতো ওই 'পিসি'তেই আচ্ছন্ন। 'পিসি' আতঙ্কে আক্রান্ত। সুজয় সুমনের বাবাটি পিসির জীবনের সারসত্য 'দাদা'টিও ফাঁকি দিয়ে চলে যাওয়ায় পিসি জলস্থল আকাশ অন্তরীক্ষ, 'মানুষ, 'ভগবান' সকলের উপর ক্ষিপ্ত। আর সেই ক্ষিপ্রতার ঝড় এসে আছড়ে আছড়ে পড়ে সুমন নামক অসহায় নিরুপায় জীবটির ওপর।

'চাকরি-বাকরি একটা খোঁজ সুমনো? তোর ওই পড়ানো দিয়েই চিরকাল সংসার চলবে? বে থা করতে হবে না? পিসি চিরকাল তোদের সংসারের ঘানি ঘোরাবে?'

ফিলমের 'রিল' ঘুরে চলেছে! দূরদর্শনের পর্দায় নতুন নতুন ছবি।

চাকরি পাওয়ার খবরে পিসির উল্লাস…হরির লুঠ দেওয়া 'সত্যনারায়ণ' মানা কালীঘাটে ছোটো. সে এক হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার।

আর তার পরবর্তী ছবির অবিরত ঘ্যান ঘ্যানানি, 'এবার একটা বে কর। আমি কি চিরকাল তোদের সংসারের খোঁটায় পোঁতা হয়ে পড়ে থাকব? কোন কালে বিধবা হয়ে বসে আছি। একদিনের তরে তীর্থ ধর্ম নেই। গুরু গোবিন্দ নেই, শুধু সংসার ঠেলছি—'

ক্ষণ প্রতিবাদ উঠল অবশ্য··সে কি পিসিমা? 'গুরু'র গোবিন্দ নেই কী গো? তোমার 'গুরু গোবিন্দ গোপাল গোবর গঙ্গাজল' সবই তোমার হাতের মুঠোয়। তাঁদের নিয়েই তো আছো —'আমরা তো তাঁদের প্রজা মাত্র।'

'শুধু তাঁদের নিয়েই আছি? তাই বলবি তো শুধু; তাঁদের নিয়ে থাকলে তোদের সংসারটা কে ঠেলছে? ভূতে?'

রোজই বাক্য বিন্যাস। রোজই আক্ষেপ আর আছড়ানি আর রোজই আবেদন। 'চাকরিটা আর একটু পাকাপোক্ত হতে দাও পিসিমা। বিয়ে তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।'

'বিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে না। তো বলি দিনটা পালিয়ে যাচ্ছে না। বয়েস-কালে বিয়ে না করলে, বৌকে শিক্ষাদীক্ষে তালিম দিয়ে তৈরিটা করে তুলবে কে? এই বুড়ি চিরকাল বাঁচবে?'

এমন কথা শুনতে পেলে সুজয় প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইঃ। তুমি বুড়ি? তুমি এখনো দাঁত দিয়ে আখ ছাড়িয়ে খাও; রাত্তিরে বাটি ভর্তি চালকড়াই ভাজা খাও কড়মড়িয়ে —আর রাতদিন এতো কাজ করো—'

পিসি বলতো, 'এ ছোঁড়া কী কটকটে হয়েছে রে বাবা। একই মায়ের গভ্যে একটি শিব একটি বাঁদর।—তো চিরটাকাল কাজ করে মরবো কেনরে? ঘরে বৌ আসবে না? তোর সাধ হয় না —দাদার বৌ আসুক?'

তখন অবশ্য সুজয় একগাল হেসে বলে উঠেছে, খু-ব। তবে খুব সুন্দর বৌ আনতে হবে কিন্তু পিসি।'

পিসিও কি সেই তালে ছিল না? তলে তলে নানান পুকুরে টোপ ফেলে বেড়াচ্ছিল না? শুধু পুকুরে? খাল বিল ডোবা কোথায় নয়?

অবশেষে লেগে গেল এক জায়গায়।

মেয়ের ফটো দেখে মোহিত হয়ে গেল সুমন নামের নিতান্ত নিস্পৃহ

ছেলেটাও। তথাপি গাঁইগুঁই করে বললো। আর কিছুদিন সবুর করোনা পিসি। সামনেই একটা প্রোমোশনের আশা রয়েছে, সেটা হয়ে গেলে—'

তা বে টা করে ফেললে তোর প্রোমোশন আটকে দেবে? হাড় জ্বালানো কথা কসনে সুমন—। এই মেয়ের পয়েই তোর প্রোমোশন আসছে—'

পিসির সব যুক্তিই অকাট্য। জানা গেল যেদিন ওই মেয়ের বাপ এসেছিল ছবি নিয়ে সেই দিনই নাকি প্রোমোশনের আশ্বাস পাওয়া গিয়েছিল।…তবে?

মেয়ে সুন্দরী! তবে মেয়ের বাপটি যে অতি দীনহীন। তাই একটি 'শুধু কেরানি' পাত্র পেয়েই হামলে পড়েছিলো।

একদিকে তার আনাগোনা, অপরদিকে পিসির দৃপ্ত ঘোষণা, 'এই মেয়েকে যদি তুই টালবাহানা করে হাতছাড়া করিস সুমনো, আমি পরদিনই কাশী যাবার টিকিট কিনবো, তা স্পষ্ট বলে রাখছি।'

পিসি কাশীর টিকিট কিনলে তো চোখের সামনে গভীর অন্ধকার।… অতএব টালবাহানা করা চললো না।

নেহাৎ গেরস্থ ঘরের মেয়ে সুষমা এলো শুধু তার রূপটুকু আর সুষমামণ্ডিত স্বভাবটুকু নিয়ে। বাপ এসে জামাইয়ের পিসির কাছে হাত জোড় করে বললেন 'আমি অভাগা অধম। মাতৃহীন মেয়েটাকে কিছুই দিতে পারলুম না। তবে ভবিষ্যতে দেখবেন একটি রত্ন দিয়ে গেলুম আপনার ঘরে!'

তা দেখা গেছলো। এখনো যাচ্ছে। একটি রত্নই বটে।

সুমন মোহিত।

সুজয় বিগলিত।

পিসি অহঙ্কৃত। (সেই রত্ন আবিষ্কারের মহিমায়)

নামের এমন সার্থকতা কটা ক্ষেত্রে দেখা যায়?

সেই মেয়ে পিসির এমন সুনজরে পড়ে গেলো যে, পিসি তার ইহকাল পরকালটির মাথা খেয়ে ছাড়লেন। তাকে নিজ মন্ত্রে দীক্ষিত করে, একেবারে আপন করে নিলেন।

অতঃপর বেশ কিছুদিন পর্যন্তই দাপটে কাটিয়ে গেছলেন পিসি। একদা যে সর্বদা ঘোষণা করতেন একটা বউ ঘরে এলেই তিনি 'মুক্ত পুরুষ' হয়ে 'গয়া কাশী বৃন্দাবন' করতে বেরিয়ে পড়বেন, সেকথাটি বেমালুম ভুলে গিয়ে যেমন শেকড় গেড়ে বসেছিলেন তাই রইলেন।

আহা? কী অনির্বাচনীয় সুখস্বাদময় ছিলো সেই দিনগুলো।

আচ্ছন্নের ঘোরে শুনতে পায় সুমন, দেখছিস তো সুমনো, কী জিনিস ঘরে এনেছি। দেখছিস তো সুমনো। বৌয়ের আয় পয় আছে কী না? এবার আমি নিশ্চিন্দি হয়ে মরতে পারবো।'

মরতে কে বলেছে বলো তো পিসি। এখনই তো নিশ্চিন্দি হয়ে বেঁচেছো।'

এই সময় আবার একটা ক্ষুব্ধ অভিযোগ অবিরত ধাক্কা মেরে চলতো, রোজ রোজ তুমি অফিস থেকে ফিরতে দেরী করবে কেন ? আমার বুঝি ভাল লাগে !

আমার বুঝি একা বাড়িতে ভয় করে না ? অফিস ছুটি তো পাঁচটায়। এতোক্ষণ দেরী হয় বাড়ি ফিরতে ?'

না এ কণ্ঠস্বর সেই সুজয় নামের ছেলেটার নয়। সে তো আর তখন 'ছেলেটা' মাত্র নয়। রীতিমত নায়ক। সে তো নিজেই আড্ডা মেরে বাড়ি ফেরে রাত দশটায়। তবে যদি দৈবাৎ কোনোদিন একটু সকাল সকাল ফেরে তাহলে বলে ওঠে, 'সত্যি দাদা। ভেরি ব্যাড। বৌদির কথাটা তোমার একটু ভাবা উচিত।…'বস' এর মনোরঞ্জন করতে অকারণ গাধা-খাটুনি খেটে রাত নটায় বাড়ি ফেরা—কোনো মানে হয়না। তোমার মনে পড়ে না এখন পিসি নেই, বাড়িতে বৌদি একা।'

তখনই কী বলতে পেরেছে সুমন নামের মুখচোরা লোকটা, 'বসের মনোরঞ্জনে আমার দায় পরেছে। ওভারটাইমটি না খাটলে সংসারটা বেশ ভালভাবে ম্যানেজ করা যায় না।'

…না সেকথাটা বলতে পারে না।

তাই প্রসঙ্গ পাল্টে বলে 'তা তুইও তো একটু সকাল সকাল বাড়ি ফিরলে পারিস বাপু।'

'আমি ? বাঃ চমৎকার।'

এর বেশি আর কোনো প্রতিবাদের ভাষা অবশ্য তার মাথায় আসে না তবে ওই টুকুইতো যথেষ্ট।…

সুষমা বলে বসে। 'তাহলে আমিও এবার পিসির মতো জেদ ধরি একটা দোসর আমায় এনে দিতে হবে তোমায় জয়। নিজে যখন আড্ডা কমিয়ে সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরতে পারবে না তোমার দাদাও অফিস ঘরের কার্পেট ঝেড়ে ঘর ঝাড়ু দিয়ে সাফ করে দিয়ে আসা পর্যন্ত না করে ফিরতে পারবেন না, তখন আমি ভূতের ভয়ে মরবো না কী ? জানো·· যখন তখন দেখতে পাই যেন পিসিমা ঘুরছেন। একটা সাদা থানের আঁচল চোখের সামনে দুলে ওঠে।…

ছবি এগোচ্ছে—

হঠাৎ এঠাৎ এক একসময় আচ্ছন্ন হয়ে থাকা রোগীটা চেঁচিয়ে বলে ওঠে, 'মামারা ঠিক বলেছিলো—'

সুষমা অধীর আগ্রহে মুখ ঝুঁকিয়ে বলে, 'কী গো মামারা কী বলেছিলেন গো ?'

আর চেঁচিয়ে ওঠা নয়। একটু বিড়বিড় করে 'ওই যে ইংলিশ মিডিয়াম…।'

তাইতো বটে। মামাদের সেই কাঠখড় পোড়ানোর গল্প শুনেছিলো সুষমা

বৌ হয়ে এসে।…আর পরে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলো, ওই 'ইংলিশ মিডিয়ামের' গুণ আছে।…

সুজয় একটা ভাল কোম্পানির বেশ একখানা কেষ্টবিষ্টু অফিসার হয়েছে। সুজয়ের অতএব বিয়েও হয়ে গেলো গড়পারের বেশ একখানা সমৃদ্ধ পরিবারে।… সুজয়ের বৌ, রূপটা তেমন নিয়ে আসতে না পারুক, রুপোটা বেশ ভালমতো নিয়ে এসেছিলো।…

কিন্তু শুধু ওই অকস্মাৎ হার্ট অ্যাটাকে, নিঃঝুম হয়ে থাকা মানুষটার আচ্ছন্ন মাথাটার মধ্যেই ছবির মিছিল চলে?

সুষমা নামের জলজ্যান্ত স্টিলের মানুষটাও যখন দিনান্তের, কর্ম অন্তে— একটু ঘুমিয়ে পড়ে, তার তন্দ্রার ঘোরের মধ্যে ওই অতীতের ছবির মিছিলটা ঘোরাঘুরি করে না?

সেও শুনতে পায়না, 'দিদি! আপনার হাতের রান্না কী চমৎকার। এই সামান্য ডাল তরকারি তাও খেতে এতো ভাল লাগে। আমাদের ওখানে যে কাজের মেয়েটা রান্না করে, রাবিশ। এই সব আজে-বাজেগুলো তো খাওয়াই যায় না। নেহাৎ মাছটা কি ডিমটা, খাদ্য যোগ্য না হলেও খেতে হয়। মা তো কেবলমাত্র ছুটির দিন দু-একটা কিছু রাঁধেন। তবে মুরগিটা কী মাংস-টাংস এগুলো ওকে রাঁধতে দেননা। এই যা সুবিধে।'

সুষমা নামের মেয়েটা কী সে সময় একদিন বোকার মতো বলে ফেলেছিলো, 'মুরগি তোমাদের রান্না ঘরে ঢোকে?'

সেই ফুলো ফুলো গাল শ্যামলা মেয়েটা তখন খুব হেসে উঠেছিল না? বলেছিলো, 'ওমা! রান্না ঘরে না ঢুকলে কী শূন্যে রান্না হবে?'

তারপরেও তো 'দিদি। দিদি।'

'দিদি। এই নিন বাবা এই তোয়ালের পুঁটলিটাকে ধরুন। এতোটুকু বাচ্চাকে আমি ধরতে পারিনা বাবা। মা যে কী করে ধরতো। বাবাঃ। চান-টান অবিশ্যি আয়াটাই করাতো, তবে খাওয়ানো মা ওর হাতে ছাড়তো না। বলে পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে ওদের কোনো জ্ঞান নেই। নার্সিংহোমের ট্রেনড নার্সদের কথা আলাদা। তো আয়াটাকেও কত খোশামোদ করা হলো, আমার সঙ্গে আসতে, কিছুতেই রাজি হলো না নিজের পাড়া ছেড়ে এতোদূর আসতে। এখানে আয়া পাওয়া যাবে তো? অন্তত রাতটার জন্যে—'

সুষমা শুনতে পাচ্ছে, একটা হাসি হাসি গলা, 'খুব পাওয়া যাবে। একদম মজুত। দিনরাত সব সময়ের জন্যে। এইতো তোর সামনেই। দ্যাখ পছন্দ হয়?'

এ স্বর কার?

সুষমার নিজেরই না?

'দিদি দিদি। আপনি পারেনও বা। সারাদিন এতো খাটা-খাটুনির পর আবার সারারাত জাগা। রাতটা না হয় এঘরেই থাকুক—'

'এ ঘরে থেকে কী হবে? তোর কাছে 'দুধের ব্যবস্থা মজুত আছে?···তো সে ব্যাপারে তো কাঠখড়। তো যখন ওখানেও বোতল, আমার এখানেও বোতল তাহলে আর শুধু শুধু তোদের ঘুমটা নষ্ট করি। আমার দেবরটি তো আবার যা ঘুম কাতুরে। একটু ডিসটার্ব হলেই খেপে যায়। রাতে লোডশেডিং হয়ে পাখা বন্ধ হয়ে গেলে,বিদ্যুৎ মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে অ্যায়সা গালমন্দ করতে থাকে। লোকটা বাসায় পড়ে মরেই থাকে! হি হি হি'···

'দিদি! রইলো এই দস্যুটা। আমরা একটু সিনেমা যাচ্ছি।·· দিদি। রইলো এই শয়তানটা আমরা একটু মার্কেটিং করতে যাচ্ছি।· দিদি চশমাটা কেমন গড়বড় করছে, চোখ দেখাতে ডাক্তার বাড়ি যাচ্ছি, পাজিটা থাকলো!·· দিদি! আপনার দ্যাওরের এক বন্ধুর ম্যারেজ অ্যানি—ইয়ে বিবাহবার্ষিকীতে —বন্ধুদের সব সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ। তো 'সপুত্র কন্যে' তো বলেনি, বদমাশটা রইলো আপনাকে জ্বালাতন করতে।···দিদি। দিদি।'

নীপুর কতো পরে নার্সিংহোম থেকে ফিরলো আরও একটা তোয়ালে মোড়া বাচ্চা নিয়ে। তবু তাকে ধরতে পারে না তার মা। অতটুকু বাচ্চাকে ধরতে তার 'গা শিরশির' করে।···

আহা! সুষমার কাছে যেন শাপে বর।

তৃষিত তাপিত হৃদয়খানা যেন জুড়িয়ে যায়, একপক্ষের এই অপারগতায়।

কী মধুর ছিলো সেই দিনগুলি!

আহা, কবে থেকে সেই মাধুর্যময় দিনগুলোতে হঠাৎ নিমপাতার রসের ছিটে লাগলো?

অন্ধকারে বিনিদ্র রাতেই তো যতো আবোল তাবোল ভাবনা এসে জোটে। ধারাবাহিক থাকে না। তবু যেন স্পষ্ট জীবন্ত সদ্য ছবি হয়ে এসে দাঁড়ায়!

তলায় তলায় তিল তিল করে কোথায় কী জমছিলো কে জানে! হয়তো বা ঈষৎ ইশারা জানিয়ে যাচ্ছিলো ও। তবু বিস্ফোরণটা ঘটলো একদিন নেহাৎই তুচ্ছ কারণে। একটা অবোধ শিশুর অতি অবোধ প্রাণে। 'আচ্ছা জেঠুমা।· বাড়িতে তো কেউ কিছুই রাগী নয়, তুমি নয় জ্যেঠু নয়, বাপী নয়, আমি নয় বুবাই নয়, তবে মামনি অ্যাতো রাগী কেন?'

'এই সেরেছে। কে বললো তোদের মা মনি অ্যাতো অ্যাতো রাগী?'

'কে আবার বলবে? আমি বুঝি দেখতে পাই না? সবসময়ই চোখ গোল করেই আছে? কেন গো?'

হ্যাঁ, সেই অবোধ শিশুর অতি অবোধ প্রশ্নে হাসির মাধ্যমে একটি অসতর্ক উত্তর দেওয়া হয়ে গিয়েছিলো। কে ভেবেছিলো সেই হেসে ওঠা উত্তরটা

বারুদের স্তূপে একটি জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি ফেলার তুল্য হবে।···তাই উত্তরটা উচ্চারিত হয়েছিলো, 'কেন জানিস? আমরা আর সব্বাই 'সু" শুধু তোদের মা-মনি বাদে।'

'সবাই সু' মানে?'

'মানে হচ্ছে এই দ্যাখ তোর বাপী সুজয়, জেঠু সুমন, তুই সুকান্ত, বোনটি সুলগ্না, আমি সুষমা, শুধু তোর মা-মনি 'এলা।' একা।'

'সু মানে বুঝি না রাগী?'

'তাইতো। সু মানে ভাল সুন্দর নয়নী না রাগী। আর 'এ' তো? হি হি একা গাড়ি খুব ছুটেছে - '

ব্যস! ঘটে গেল এক মহা অনর্থ কাণ্ড।

কে জানতো অলক্ষ্যে কোথায় কান পাতা আছে।

বটে? বটে?

সেই কানের অধিকারী হাতের কাছে যা পেলো আছড়ে আছড়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো। বই-কাগজ, ফুলদানি, কাচের গ্লাস বাচ্চাদের খেলনা পুতুল, তারপর একখানা পাটভাঙা শাড়িকে পরিপাটি করে পরে চটি জোড়াটা পায়ে গলিয়ে ছোট একটা ব্যাগ হাতে নিয়ে গটগট করে বেরিয়ে গিয়ে বাস স্ট্যান্ড পেঁছে গেলো। ক্রন্দনরত দুটো শিশুর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে বলে গেলো 'কান্না কিসের? থাকো না সব 'সু' এরা একসঙ্গে। সুখে আহ্লাদে। 'কু'টা বিদেয় হয়ে যাক।'

'ও এলা। ও এলা। হাসি ঠাট্টার কথায় একী রে? দোহাই তোর। আয় ভাই। হাতজোড় করে মাপ চাইছি। আমার অন্যায় হয়েছে। লক্ষ্মী দিদি আমার—'

পিছনের এই কাতর মিনতির প্রতি কর্ণপাত মাত্র না করে সে এগিয়েও গেলো। পিছু পিছু ছুটে গেলো গঙ্গার মা-ও। 'ও ছোট বৌদি। রাগের মাথায় এই চৈত্র মাস বিষ্যুদবার ভর সন্ধ্যাবেলা, এমন করে ঘর থেকে বেরিওনি গো।···যা করবার রাতে ছোড়দাবাবু এলে করো।'

কিন্তু কে শুনছে তার কথা?

সেই এক বিভীষিকাময়ী সন্ধ্যা গেছে!

বাড়ির পুরুষ যুগল অফিস থেকে ফিরে এসে, একটা পাথরের পুতুলের কাছ থেকে কোনো কথা আদায় করতে না পেরে, এবং 'মা-মনি চলে গেলো, মা-মনি চলে গেলো' বলে তারস্বরে ক্রন্দনরত শিশুর কাছে কোনো হদিশ না পেয়ে অতি কষ্টে গঙ্গার মার কাছে কিছুটা তথ্য আদায় করতে পারলেও, সেই 'সু' এবং 'কু'র তথ্য তো তার জানার কথা নয়। বড়বৌদিদির কোনো কথাতেই যে রেগেমেগে চলে গেছে, এইটুকু বলতে পারলো সে।

দিশেহারা সুজয় তক্ষণাৎ গড়পারে ছুটলো ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে। এবং ট্যাক্সি চলাকালীন নীপুর কাছ থেকে এই 'সু' 'কু'র কাহিনীটা ভাঙাচোরা ভাবে শুনলো। কিন্তু শিশু হলেও সেও কিছু আর চালাক কম নয়, প্রসঙ্গটা যে কেন উঠলো, সেকথা সে মোটেই ফাঁস করলো না।

অতএব অন্ধকারে থাকা সুজয়ের মুখে নেমে এলো ঘন অন্ধকার।

তাহলে—এলা যা বলে তা ভুল নয়। তলে তলে উনি ছেলেমেয়ে দুটোকে কুশিক্ষা দিয়ে মায়ের বিরুদ্ধ পক্ষ করে তুলেছেন। উঃ। কতোই ইনোসেন্ট ভাব দেখানো হয়।...

বিষগাছের চারা পোঁতা হলো সেইদিন।

তা বলে এলা কী গড়পারেই রয়ে গেল।

তা অবশ্যই নয়। ছেলের স্কুলের পরীক্ষা এসে যাওয়ায় তাকে আসতেই হলো। আর সেই ছেলেটাকে আনতে যাবার ছুতোয় ...সুমন গিয়ে পড়ে বললে 'ও বৌমা! তুমি বাড়ি নেই, এরা বাড়ি নেই, টেকা যাচ্ছে না যে বাড়িতে। একা নীপু যাবে কেন বাবা? তিনজনেই চলো। তোমার এই শুচিবাই দিদিটির হাতের চা পেতে তো বেলা আটটা বেজে যাচ্ছে—'

এটা সম্পূর্ণই বানানো।

সকালের চা কোনোদিনই এলার দায়িত্বে নেই। তা হোক। খোশামোদ তো করতে হবে।

কী জানি কী ভেবে অতঃপর সেদিন ছেলেমেয়ে দুটোকেই নিয়ে ভাসুরের সঙ্গে ফিরে এসেছিলো এলা। তারপর কালক্রমে সবই হালকা হয়ে আসে! তাছাড়া—একপক্ষ যদি অবিরত নতি স্বীকার করে চলে অপরাধীর ভূমিকায় চলে, অনুতাপ প্রকাশ করে চলে, অপরপক্ষের অনমনীয়তাটা কিঞ্চিৎ বাজেই।

তবে কাচের বাসন।

ভাঙলে কী করে জোড়ে? যতই শক্তিশালী আঠা লাগাও, ফাটার দাগটা কী মিলোয়?

তদবধি সেই ফাটার দাগটা নিয়েই মানিয়ে চলা হচ্ছিল, তারপর সেই একদিন 'দাদা।' বলে ফেটে পড়া।

রক্তাক্ত সেইদিনটা চোখের সামনে যেন ছুটোছুটি করতে থাকে সুষমার বন্ধ চোখের সামনে।

কিন্তু সে তো রাতে। সেখানে দুটো দেবশিশু সুষমা নামের মেয়েটাকে ভাঙচুর করতে থাকে।

যাদের মধ্যে একটাকে সুষমা 'আহ্লাদী পুতুল' বলে ডাকতো, আর অপরটাকে 'টাট্টু ঘোড়া'।

ওদের ছেড়ে এতদিন থাকতে পারলাম আমি। আমি কী পাষাণী।...আমার

তো কোনো মান অভিমান ছিল না। আমি কেন ওই নির্বোধ লোকটার কথায় ভুলে এই 'শিমুরালিতে' চলে আসতে রাজি হলাম সেদিন···ওখানে থাকলে তবু তো তাদের একআধবার চোখের দেখাও দেখতে পেতাম। আর এখন?

এখনই বা কোন অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে চলেছি?···চিরকাল শহরে থাকা —গঙ্গার দেশে থাকা মানুষটাকে কী আমি এই অন্ধকার দেশে— এই পাড়াগাঁয়ে · ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে সুষমার।···

কিন্তু সে তো রাতের সুষমা।

দিনের সুষমা?

সে নেহাৎ স্বাভাবিক। ধীর স্থির সেবাপরায়ণা এক নারী। অথচ ভেঙে পড়া নয়। সে অনায়াসে বলে, 'আপনি এমন ভেঙে পড়েছেন কেন খুড়ো-মশাই? ডাক্তার তো বলছেন ক্রমেই উন্নতি হচ্ছে।···'

বিধু খুড়ো কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে ভাঙা গলায় বলেন, ডাক্তাররা অমন মিথ্যে স্তোক দেয়।

কিন্তু ক্রমেই দেখা গেলো, খুড়োর আশঙ্কা অমূলক। ডাক্তারের কথাই সত্যি হতে চলেছে! ক্রমেই উন্নতির দিকে চলতে চলতে হঠাৎই রীতিমত চটপট সেরে উঠতে লাগলো সুমন। এবং বললে লোকের চোখ ট্যারা হয়ে যাবে, ক্রমেই একদিন দেখা গেলো সুমন ব্যানার্জি আবার একদিন ডেলি প্যাসেঞ্জারদের দলে ছ'টা বাহান্নর ট্রেনটা ধরতে যাচ্ছে।

উদাহরণও দেয় অনেকগুলো।

কে দুটো ঠ্যাঙ ভেঙে যাওয়ার পরও ক্রাচ নিয়ে অফিস যাওয়া-আসা করছে। পেটে ক্যানসার ধরা পড়ার পরও অফিস যাচ্ছে। কে এক আজন্মের হাঁপানি রুগী চিরকাল অফিস চালিয়ে এলো।·· এইসব।···

সঙ্গে যারা থাকে। একটু নজর রাখে। বিধু খুড়োর একান্ত অনুরোধ।··· অতএব সুমন নামের লোকটা ভাবে। কে বলে পৃথিবী বড় নিষ্ঠুর হয়ে গেছে, সেখানে আর ভালবাসা নেই।

এই যে এরা নিজেরা কষ্ট করে দাঁড়িয়ে থেকেও সুমনকে বসবার জন্যে একটু জায়গা করে দেয়, এই যে ট্রেন থেকে ওঠা নামার সময়, নিজেদের শত ব্যস্ততার মধ্যেও সুমনের পিঠটায় একটু হাত রাখে, এর কোনো তুলনা আছে?···

বাড়িতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে দিন কাটিয়ে চললে কী সুমন জানতে পারতো পৃথিবী এখনো ফুরিয়ে যায়নি।···

তাছাড়া পথে বেরিয়ে যেন আত্মবিশ্বাস ফিরে আসছে। মনে হচ্ছে, কোনো একটা শনিবারে অফিস ফেরৎ আর শিমুরালি ফিরে না এসে, শহর কলকাতার সেই চিরপরিচিত পথটার বাসে উঠে পড়লেই বা কী হয়?··· আহা কতো উল্লসিত হবে বাচ্চা দুটো।···

কেউ তাকে ডেকে হেঁকে খবর দিয়ে যায়নি কারণ বিধু খুড়োর বারণ, ভাইপো জানতে পারলে রেগে যেতে পারে। তবু লোক পরম্পরায় সুজয়ের কানে এসেছিল খবরটা।

আর শুনলে অবিশ্বাস্য। শুনে সে একটা হিংস্র আনন্দ অনুভব করেছিলো।

কবে হয়েছিল অ্যাটাকটা।

ঠিক সেই পত্রপ্রাপ্তির দিনটায় না?…

ঠিক হয়েছে। ওই পত্রাঘাতটাই যে বজ্রাঘাত তুল্য হয়ে জলজ্যান্ত একটা লোককে ফিনিশ করে দিলো, সেটা বুঝুক। চিঠি টা যে ডিক্টেট্ করেছিলো।

আসলে ডিক্টেটও নয়। খসড়া হিসেবে নিয়েই দিয়েছিলো সে। সুজয় সেটা কপি করে পাঠিয়ে দিয়েছিলো।…

কিন্তু দেওয়ার পর?

আত্মগ্লানির জ্বালায়, ক্রমাগতই 'দাদা' আর 'বৌদি' নামের দুটো ব্যক্তিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে চলেছিলো।

কেন করেছি লিখেছি।

তোমরাই কী ধোয়া তুলসীপাতা, তোমরাও তলে তলে দেশের বাড়ি ঘর জমিজমা সব একা দখল করবার তাল করে প্যাঁচ কষে, চলে এলে। আর এমন একখানি কলকাঠি নেড়ে এলে যে আমি বিপদে পড়ি। আমিই বা তবে তোমাদের মান মর্যাদা রাখবো কেন?

তবু—

যেই শুনলো দাদার হার্ট' অ্যাটাক, সেই মনে হলো, বুঝুক এলা তার কৃতকর্মের ফল। হে ভগবান, দাদা যেন সুজয়ের মুখ রাখে। দাদা যেন এই অ্যাটাকে শেষ হয়ে যায়। তখন সুজয় তার ঘরের ঘরণী টির দিকে আঙুল তুলে তুলে বলতে পারবে, 'এই তুমি। তুমিই আমার দাদার মৃত্যুর কারণ। …যে দাদা নিজে না খেয়ে আমায় খাইয়েছে। নিজে ছেঁড়া জুতোয় তাপ্পি মেরে মেরে আর গায়ে ফাটা শার্ট রিপু করে করে চালিয়ে আমার বাহারের খরচ জুগিয়েছে। যে দাদা অকালে মাতৃহীন শিশুটাকে মায়ের স্নেহ দিয়ে আগলেছে, নিজে বালক মাত্র হয়েও—'

রাশি রাশি কথা জমতে থাকে সুজয়ের মনে। অলক্ষে একবার একবার সেই কাঠগড়ার আসামীটার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে, আর ভেবেছে, কেমন হয়ে উঠবে তোমার মুখটি, তাই দেখবো আমি। শুধু এবার মৃত্যু সংবাদটা এলেই হলো।

কিন্তু হায়!

সেই প্রার্থিত সংবাদটা আর কোনোদিনই এল না। ভীষণ বিরক্ত হয়ে উঠলো সঞ্জয় তার সেই নির্লজ্জ দাদাটার ওপর।

মরতেই পারলে যদি, তো শেষ পর্যন্ত গৌরবের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ মরলে না কেন? কেন রগড়ে রগড়ে আধমরা হয়ে বিছানায় পড়ে থাকবে?

শেষ সংবাদটা শুনলে যেভাবে উন্মাদের মতো ছুটে গিয়ে 'দাদা'! বলে আছড়ে পড়া যেতো, এতো দিন পরে আর এখন ওভাবে শুধু একবার দেখতে যাওয়া যায়? যায় না।

দাদা তার মুখ রাখলো না।

'এলা' নামের ওই দুর্বিনীত রমণীটির মুখের ওপর একখানা রাম থাপ্পড় বসাতে দিলো না দাদা সঞ্জয়কে। ছিঃ।

আর তারপর?

যখন শুনতে পেল, দাদা নাকি আবার ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে অফিসে আসছে, তখন মনের ঘেন্নায় ঠিক করলো ওই দাদাটি সত্যি কখনো কোনো দিন মারা গেলেও খবর শুনে ছুটে যাবে না সঞ্জয়।

বলবে, 'কে তিনি? আমার দাদা? আমার তো কোনো দাদা ছিলো না কোনোদিন।'

ওঃ। এলা যদি শুনতে পায়, দাদা আবার অফিসে জয়েন করেছে।

কী লজ্জা! কী লজ্জা!

যদি শোনে সর্বদা ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে সঞ্জয় নামের লোকটা। অবশ্য চট করে শোনবার কোনো পথ নেই তার। খবর পাওয়ার প্রধান সোর্স তো সঞ্জয়ই। 'দেশের' দিক থেকে যদি কেউ কোনো খবর সরবরাহ করে তো সে সঞ্জয়ের অফিসেই। তারাও অফিসে আসে, অফিস পাড়ার ঠিকানাগুলো বা ফোন নম্বরগুলোই জেনে রাখে। কেউ কারুর বাড়ি খুঁজে কোনো খবর দিতে আসে না,…নিজের অফিস কামাই করে। অথবা ছুটির দিনে আবার রেলগাড়ি চেপে কলকাতায় এসে।

অতএব ভয়ের কারণ নেই। তবু ভয়ে কাঁটা।

আশ্চর্য! এলাকে তার এতো ভয় কেন?

ভেবে দেখতে চেষ্টা করে দেখেছে সঞ্জয়। এলাকে ভয় নয়, এলার কাছে 'খেলো' হয়ে যাবার ভয়। এলার কাছে তার নিজস্ব আপনজনদের ভাবমূর্তিটা নষ্ট হয়ে যাবার ভয়। সঞ্জয়ের দাদার এলার কাছে খেলো হয়ে যাবার ভয়। যদি শুনতে পেয়ে বলে ওঠে, 'এঃ বাবা। এক্ষুনি দিব্যি ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে অফিস করছেন। আর তুমি একেবারে ভাবনায় মরে যাচ্ছিলে। তার মানে তেমন কিছুই হয়নি।'

…অতএব এলার কানে যেন খবরটা না আসে—

এমত অবস্থায়, হঠাৎ একদিন এলা একখানা খামের চিঠি হাতে নিয়ে আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে এসে দাঁড়ালো। 'দারুণ একটা সুখবর আছে জানো?'

সুজয় হাতের খবরের কাগজখানা নামিয়ে তাকিয়ে দেখলো। খামটার মুখ খোলা। সুখবরটি নিজে গ্রহণের পরই ছুটে এসেছে, এমন আহ্লাদে ভাসা মুখে।

সুজয় আন্দাজ করতে চেষ্টা করলো সুখবরটা কী জাতীয় হতে পারে। ...অবশ্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না।

জানো বড় জামাইবাবুকে বছরখানেকের জন্যে কলকাতায় বদলি করে দিয়েছে। চলে আসছেন— ওর সেই কালাহাণ্ডী থেকে। তো বড়দি লিখেছে, 'অফিস তো বদলি করেই খালাস, কোথায় গিয়ে থাকবে লোকটা তা ভাবে না। কলকাতা শহরে চট করে একটা বাড়ি পাওয়া যায়। তাও সাতদিনের নোটিশে। তো বড়দি লিখেছে—গড়পাড়ে বাড়ির অবস্থা তো এখন জানিস? বাবার ওই অবস্থা, মারও শরীর খুব খারাপ। জলের কষ্ট, 'কাজের লোক' পাওয়া যায় না। সেখানে গিয়ে ওঠা যায় না তোদের চিঠিতে তো সবই জেনেছি। তোদের বাড়িটা তো এখন অগাধ ফাঁকা। নীচের তলাটা খালি পড়ে আছে, ওটাই একবছরের জন্যে আমাদের 'সাবলেট' করে ওখানেই প্রতিষ্ঠা কর। দুই বোন খুব মজায় কাটানো যাবে।'

সুজয়ের দিকে চিঠিটা এগিয়ে ধরে এলা।

সুজয় নিস্পৃহ ভাবে বলে, 'সবটাই তো শুনলাম আর পড়ার কী আছে? কিন্তু কথা হচ্ছে—এখন তো বাড়িওলার সঙ্গে মামলা চলছে। অন্য কাউকে সাবলেট করা ন্যায্য হবে?'

শুনে এলার চোখজোড়া কপালের ওপর উঠে যায়।

'এমা! বড়দি ওটা মজা করে লিখেছে বলেই তুমি সেটা সত্যি ভাবলে? সত্যি আমরা বড়দির কাছে ভাড়া নেবো? নীচের তলাটা ফাঁকা পড়ে আছে। দেখে দেখে হাঁপিয়ে মরছি। নিচে নামতে গা ছমছম করে। কেউ এসে ওখানে থাকলে তো বেঁচে যাবো। সত্যি। তুমি যে কী একখানা। দিব্যি ভাবলে, ভাড়াটে বসানোর কথা হচ্ছে?... বলি মামলা চলছে বলে, তার বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন বেড়াতে আসতে পারে না। এসে দু-দশ দিন থাকতে পারবে না। আমায় আর তুমি আইন দেখাতে এসো না। আর যতোদিনে তোমার মামলার ফয়সালা হবে ততোদিনে জামাইবাবুর ওই এক বছর শেষ হয়েও রিটায়ার করার সময় হয়ে যাবে।...সল্টলেকে তো জমি কেনা রয়েছে বড়দির, ফ্ল্যাট আরম্ভ করবে। বরং এই একবছরেরর জন্যে বদলি হয়ে আসায় মস্ত সুবিধেই হলো ওদের।... দেখাশুনো করে ফ্ল্যাটটার পত্তন করে রেখে যেতে পারবে।'

বড়দি জামাইবাবুর সুবিধের প্রসঙ্গে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে এলা।

অথচ 'পত্নীপ্রেমহীন' সুজয় ?

তার রাগে মাথা জ্বালা করতে থাকে।

ওঃ, ওদের সুবিধে হবে তো আমি একেবারে কৃতার্থ হয়ে যাব। আমার অসুবিধেটা একেবারে ভেবে দেখছ না ? আমি শালা যে একেবারে 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হয়ে যাব। তার কী ? জানিতো তোমার বড়দিদিটিকে ? দুর্দান্ত জাঁহাবাজ মহিলা। তুমি তো তাঁকে 'গুরুদেবী' তুল্য করে, তাঁর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে বাচ্চা মেয়েটির ভূমিকায় থাকবে। আর তোমার সেই নাক উঁচু মস্ত অফিসার জামাইবাবুটি ? যাঁকে দেখলেই আমার হাড় জ্বলে যায়, আর চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনে গায়ে বিষ ছড়ায়. স্রেফ তাঁর প্রজা বনে গিয়ে পড়ে থাকতে হবে আমায়। হবেই। জানি তো তোমায়। তুমি তোমার বড় জামাইবাবুর মহিমায় বিগলিত. কই তোমার মেজদি মেজ জামাইবাবুর নামটিতো তোমার মুখে একবারও শুনি না। তারা মেদিনীপুরে পড়ে থাকে বলে ? হোমরা চোমরা অফিসার নয় বলে ? বড় জামাইবাবু—তাঁর যা কায়দা কানুন। ওঃ। দুটো মাত্র ছেলেমেয়ে। তাদের বোর্ডিংয়ে হোস্টেলে রেখে মানুষ করছেন। আর স্কুলের গন্ডি পার করলেই না কী তাদের শিক্ষাদীক্ষার জন্যে ফরেনে পাঠিয়ে দেবেন। এইসব কথা শুনে রাগে আমার রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

আর তুমি ? তাতেই মোহিত।

সেই বিরক্তিকর দৃশ্যের মধ্যে একটা বছর কাটাতে হবে আমায় ? ওঃ।

এলা বলে ওঠে, 'কী অতো ভাবছো ? তোমায় দেখে মনে হচ্ছে যেন দারুণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলে।…আমার আপনজন বলে, কেমন ? ওঃ ! আমি আহ্লাদে মরে যাচ্ছি, আর তুমি মুখখানা হাঁড়ি করে বসে থাকলে। ওদের সামনে, যেন এরকম অসভ্যতা না কর তা বলে রাখছি। যাও, এখন ওঠো দিকিনি। চটপট একবার বাজারটা ঘুরে এসো দিকিনি।'

সুজয় চমকে উঠে বলে, কেন ! আজই আসছেন না কী ? 'সামনের সপ্তাহে' না কি যেন বললে ?'

'আজ নয়। কাল।' সামনের সপ্তাহে লিখেছেন ঠিকই, কিন্তু চিঠির তারিখটা দেখেছো ? আমাদের করিৎকর্মা ডাক বিভাগের কর্ম তৎপরতায় চিঠিটা পেঁছুলো আজ। অথচ রয়েছে 'আর্জেন্ট'। যাক বেশি কিছু নয়, আজ গোটা কয়েক ডিম, আর একটা বড় দেখে, না না দুটো ছোট ছোট চিকেন নিয়ে এসো। আর যাহোক কিছু মাছ। বড়দি সব রকম মাছই ভালবাসে… আলুটালু অন্য সব আমি গঙ্গার মাকে দিয়ে আনিয়ে নেবো…যাই বাবা নীপুর স্কুলের বাস এসে যাবার সময় হয়ে গেলো।…আর বুবাইটার ফেরবার

সময়ও হয়ে এলো। শনিবারে তো নটায় ছুটি। পুরো ছুটি দিলেই পারে। তা দেবে না। সেই ভোর ছটায় হৈ হৈ করে যাওয়াটি চাই।'

চলে গেলো নিজের কাজে।

আর সুজয় দাঁতে দাঁতে দিয়ে বসে ভাবতে লাগলো অতঃপর তার জীবনটা কী মহানিশা হয়ে উঠবে।

এলা একপাক ঘুরে এসে আবার বলে, 'আচ্ছা, নিচের তলাটা বলেছেন বলেই কি বড়দি বড় জামাইবাবুকে নিচের তলায় শুতে দেওয়া যায়? আর সেখানে শোবেনই বা কিসে? এক বছরের জন্যে বদলি হয়ে আসলে তো আর খাট-পালঙ্ক নিয়ে আসবেন না। দোতলায় আমাদের ঘরটা ওঁদের জন্যে ছেড়ে দিয়ে, আমরা তো দিদির ঘরটায় শুতে পারি।'

'দিদির' মানে অবশ্য সুজয়ের দাদার বউ। 'দাদার ঘর' শব্দটা সাহস করে উচ্চারণ করলো না।

সুজয় কড়া চোখে তাকিয়ে গাঢ় গলায় বললো 'ও ঘরে তো খাট নেই, তক্তপোষ। শোবে কী করে?'

'বাঃ। তাতে কী? চৌকি তক্তপোষে বুঝি শোয়া যায় না?...আজকাল তো শুনি সেটাই হাইজিনিক স্পন্ডিলাইটিসের ভয় থাকে না।'

'আর নীপু, বুবাই?'

'তোমার কেবল কথা কাটানো। ওদের তো আলাদা আলাদা সরু খাটে শোয়াই। সে দুটো ঘরে নিয়ে যাবে না?'

'নিয়ে যাওয়া যেতে পারে, ধরানো যাবে কী? ও ঘরটাতো ছোটো।'

'এমন কিছু ছোটো না।...না হয় তুমিই ছেলেমেয়ে নিয়ে বড় চৌকিতে শুয়ো। ড্যাম গ্ল্যাড হয়ে যাবে ওরা। আমি ওদের একটা সরু খাটে শোবো।'

'পা গুটিয়ে?'

'তো তাই। দায়টা যখন আমারই।'

চলে যায় রাগ দেখিয়ে।

কিন্তু তার তো এখন রাগ দেখানো চলবে না, তাই আবার ঘুরে এসে বলে, 'কী হলো বাজারে গেলে না?'

'ভাবছি—অফিসে বেরোবার সময়ই—তোমার গঙ্গার মার নাতিটাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ওর হাতে পাঠিয়ে দিয়ে চলে যাব।...ছেলেটাতো দিদিমার সঙ্গে ঘুরঘুর করছে দেখছি।'

'করবে না কেন? 'ব্রেকফাস্টটি' পায়তো দিব্যি। চারপিস পাউরুটি, তার ওপর যতোগুলো বাসিরুটি থাকে সব। থাকতো পাঁচ-সাতখানা।...

সুজয় হঠাৎ একটা বেমক্কা কথা বলে বসে, 'তাই বা থাকে কেন? এমন বেআন্দাজী করাই বা হয় কেন?'

চমৎকার। আটা মাখার ভারটা গঙ্গার মায়ের না? আমি কী রোজ দাঁড়িপাল্লা নিয়ে মেপে মেপে আটা বার করে দিতে বসবো? সে তোমার বৌদির দ্বারা হতে পারে আমার দ্বারা হয় না হবে না।'

'বৌদি জন্মেও গঙ্গার মায়ের হাতের মাখা আটা নিতো?'

'তা আর নেবেন কী করে? বিচার আবার লাটে উঠবে না তা হলে? সব সময় আমায় ডাউন করাই যেন এখন তোমার পেশা হয়েছে।'

কাঁদো কাঁদো হয়ে যায় এলার মুখটা 'বড়দি জামাইবাবু এলে যে আমার কী অবস্থা হবে তা বুঝতে পারছি। হৃতমান্য অপদস্থ হয়েই থাকতে হবে।'

কেঁদেই ফেলে।

যেটা এলার স্বভাবে সহজে আসে না।

অতএব সরে পড়তে হয় সুজয়কে।

'কইরে? এই ছেলেটা? তোর নামটা যেন কী? আমার সঙ্গে চলতো একবার বাজারে, দুটো থলে নিয়ে।'

এলা ভারাক্রান্ত গলায় বলে, 'দুটো নিয়ে গিয়ে আর কী হবে? একটা বড় দেখে নিলেই হবে।'

'এই যে মুরগি-ফুরগি বললে? কপি মটরশুঁটি আরো কী যেন—'

'তা এখন আর আলাদা করার কী আছে? আমার তো অতো শুচিবাই নেই।...যা পঞ্চু, ওই বড় থলিটা নিয়ে ছুটে সঙ্গে সঙ্গে যা।'

শিমুরালির বাঁড়ুয্যেরবাড়িতে আবার আজ একটা ভিড়।

সুষমার 'সর্বজয়ার ব্রত' উদ্‌যাপন। ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ নির্বিশেষে এয়ো মহিলারা নিমন্ত্রিত। সঙ্গে অবশ্যই কুচোকাঁচার দল।

আগে বা চ্ছাদের বসিয়ে দিয়ে সুষমা আড়ালে গিয়ে চোখ মোছে। যারা 'প্রধান' হবার কথা তারাই অনুপস্থিত। চার বছর আগে যখন ব্রতটা ধরেছিলো তখন কী ভেবেছিলো 'উদযাপনের' দিনের চেহারাটা এমন হবে! কলকাতা ভর্তি তাদের আত্মীয়-স্বজন। কতো বাচ্চাকাচ্চা। মনে মনে একটা সমারোহর দৃশ্য আঁকা ছিল।

ব্রত নেবার সময়—

সুমন হেসে বলেছিলো, 'নতুন করে আর 'সর্বজয়া' কী হবে? এমনিতেই তো, 'সর্বজয়া'।'

'বাঃ। তাই বলে ব্রতয় বাগড়া দিতে চাইছো বুঝি? এসব চলবে না। ইচ্ছে ছিলো 'সাবিত্রী চতুর্দশীর' তো—ভেবে—দেখলাম চোদ্দ বছর ধরে টানা—কখন কী পরিস্থিতি হয়। তাই এই চার বছরটা নিচ্ছি।'

হায়। তখন কী ভেবেছিল চার বছরেও এহেন পরিস্থিতি ঘটতে পারে। আকাশ-পাতাল ওলট-পালট।

আজ আর অফিস যায়নি সুমন। তবে ডাক হাঁক কাজ কর্মে নেই। সে ভার বিধু খুড়োর ওপর ন্যস্ত। একদিকে পাঁচ ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন অপরদিকে বালক ভোজন, আসল ক্ষেত্রে মহিলা ভোজন। ব্যবস্থাতো কম নয়।

সুষমা চোখ মুছতে মুছতে একসময় সুমনের কাছে এসে বলে, আমরাও কম পাষাণ নই।'

সুমন চমকাল না।

আস্তে বলল, 'তাই ভাবছি।'

সুষমা একটু থেমে বলল, 'আমরাওতো কই একবার ছুটে গেলাম না, এই প্রায় দেড়টা বছরের মধ্যে।···গিয়ে বললাম নাতো ওরে তোদের না দেখে থাকতে পারছি না।'

সুমন চুপ করে থাকে।

সে যে মনে মনে ঠিক করে রেখেছে একদিন একটা শনিবারে অফিস ফেরত আর শেয়ালদায় এসে ট্রেনে না চেপে, সোজা বিডন স্ট্রিটে চলে যাবে সে কথা অবশ্য বলে না।

সুষমা হঠাৎ ডুকরে উঠে বলে, 'এই এখন এই ব্রত সারার ছুতোতেই যদি যেতাম। তাহলেই তো হয়ে যেতো! গেলে কী করতো? কথা কইতো না? না কইয়ে ছাড়তাম আমি? ওগো তুমিই বা বললে না কেন আমায়?'

বিধু এসে তাড়া লাগাল, 'কই বৌমা কোথায়? ব্রাহ্মণদের কী দক্ষিণার বরাদ্দ হয়েছে?'

সুষমা তাড়াতাড়ি চলে যায়।

বিধু সুমনের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কী হলো? কান্নাকাটির পালা চলছিল মনে হচ্ছে?'

'হুঁ!'

'কেন খরচ খরচ করে বকাবকি করেছিস না কী?'

'বকাবকি? আমি? পাগল না কী···মন কেমন করছে। এখন অনুতাপ হচ্ছে। এই ছুতোয় ওদের কাছে গিয়ে বললেন না কেন?'

বিধু চকিতে হেসে বলে, 'গেলে শুধু ওদের কাছেই যেতে হতো না। কিছু 'মাল' আছেন সে বাড়িতে।'

'তার মানে?'

'মানে এখন কর্তার শ্যালিকা, ভায়রাভাই ইত্যাদি প্রভৃতি ওখানে বসবাস করছেন।'

'শালি, ভায়রাভাই?'

'হ্যাঁ ওড়িষ্যায় না কোথায় ছিল, বদলি হয়ে কলকাতায় এসে, বাড়ি না পেয়ে তোদের ওখানে বসবাস করছে।'

'তোর কাছে কে এতো খবর সাপ্লাই করে?'

'আছে লোক। শুনছি—না কী বৌমার বাপের অসুখ আর মায়ের শরীর ভাল নেই বলে তাঁদেরও এনে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ভাই ভাজ অযত্ন অবহেলা করে। এখানে যখন দুই মেয়ে একত্রে। খুব যত্নআত্তি করতে পারবে।'

সুমনের চোখের সামনে একটা অন্ধকারের পর্দা ঝুলে পড়ে। সেই একখানা মনোরম শানবারের স্বপ্নটি তাহলে মুছে গেলো।

ব্রত সারার পর সুষমা বলে ওঠে, 'কালই আমি প্রসাদ নিয়ে চলে যাবো তোমার সঙ্গে সকালে। তুমি অফিস যাবার আগে আগে আমায় পেঁছে দিয়ে তবে যাবে বুঝলে? আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে।'

সুমন আস্তে বলে. 'কোথায় পেঁছে দেবো?'

'কোথায় আবার? বোকা সাজছো কেন? আমাদের বাড়িতে?'

'বাড়িটা আর আমাদের নেই সুষমা। 'গড়পার কোম্পানির' দখলে চলে গেছে।'

অসুস্থ, জরাগ্রস্ত (এবং ছেলে বৌয়ের কাছে অবহেলিত) মা বাবাকে নিজেদের কাছে নিয়ে এসে, দুই বোন যেন শান্তির পাথারে ভাসছে। সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে যত্ন করতেও পারছে। এবং দুই বোনে গলা খুলে ভাই-ভাজের নিন্দেও করতে পারছে। একী কম সুখ?

সেখানে তো শুধু চোখে চোখে একটু যা কিছু অনুচ্চ নিন্দা বাক্য। এখানে? আহা! দুটো পুরুষ যেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, কী অবাধ পরিবেশ।

দুটো বাধা আছে বটে। তা তাদেরও স্কুল আছে। আর বাচ্চাদের কান বাঁচাতে কার দায়?

বাড়িতে স্থান সংকুলান?

সে একরকম করে হয়েই গেছে। আপন জনেদের নিজেদের জন্যে স্বার্থ সুবিধে আর আরামটুকু ছাড়তে পারলে, সবই হয়। কথাতেই আছে না, 'যদি হয় সুজন, তো তেঁতুল পাতায় ন'জন।'

তা দেখা যাচ্ছে এরা সকলেই সুজন।

তবে 'ন জনের' একজন, যে নাকি নেহাতই কোন ঠেকায় পড়ে আছে, তার মনের মধ্যে সর্বদা যে ঝোড়ো বাতাস বইতে থাকে, সে বাতাস আর যাই হোক সুবাতাস নয়।

তবু সুজন জনোচিত সৌজন্য বজায় রেখে চলতে হয়। ছুটির দিন সকালে চায়ের টেবিলের জমজমাটি আসরে এসে বসে যোগ দিতে হয়।

আসরটা নীচের তলাতেই বসে, কারণ গড়পাড়ের বৃদ্ধ দম্পতিকে, তাঁদেরই সুবিধের জন্যে নীচের তলায় থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁরা যদি কোনোদিন 'মরে মরে' একটু বা রাস্তায় বেরোতে পারেন, তবে সিঁড়ি ভাঙতে পারেন না বলেই সেটা পারছিলেন না নিজের বাড়িতে। সেখানে নীচের তলায় থাকার সুবিধে ছিল না। দোকান সব ভাড়া দেওয়া।

তো সেই জমজমাটি আসরেই একদিন এলার জামাইবাবু পাইপ মুখে ঝুলিয়ে মুখে চিবিয়ে বলেন, 'তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছিলো সুজয় তোমার দাদা বুঝি বেড়ে, শুনে অবাক হলাম তিনি রীতিমতো অফিস করছেন ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে। স্ট্রেঞ্জ!

সুজয়ের মুখটা সাদা হয়ে যায়।

যাঃ। হয়ে গেলো ফাঁস। হাটে হাঁড়ি ভেঙে গেল।

তবু অবাকের ভঙ্গীতে বলে উঠলো 'তার মানে? এমন অদ্ভুত খবরটা আপনাকে দিল কে? কোন বাজে মার্কা লোক?'

জামাইবাবু তেমনি পাইপে ঝুলনো মুখে তাচ্ছিল্যের গলায় বলেন, 'খবরটা বাজেমার্কা না হে! একেবারে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ! ওই তো তোমাদের মেড সার্ভেন্টটি, কিসের যেন মা, তার একটা জামাই না কে তো তোমার দাদার অফিসে বেয়ারার কাজ করে। তিনিই করিয়ে দিয়েছিলেন না কি চাকরিটা।... তো লোকটা বলে ফেলে, আবার বলেছিল, তিনি না কি ওকে নিষেধ করে রেখেছিলেন খবরটা না জানাতে, হঠাৎ অসতর্কে বলে ফেলে। হাত কচলাচ্ছে। 'বাবু যেন টের না পান, আমি বলে ফেলেছি।' তা এতো লুকোচুরির কী আছে তাও তো বুঝছি না।'

শ্বশুর ঠাকুর বলে ওঠেন, 'তা সত্যিই তো সুজয়, ভালো আছেন, অফিস করছেন, এতো আনন্দেরই কথা। রাখ ঢাকের কী আছে?'

বড়দি তাঁর তৃতীয় পেয়ালা চায়ে চিনি গুলতে গুলতে বলেন, 'বুঝছো না কী আছে? এদেরকে অপরাধী করে রাখা। তিনি এতো অসুস্থ জেনেও ওরা দেখতে যেতে পারেনি তো। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে বাড়ি বন্ধ করে যাওয়া এতো সোজা?'

সুজয় নীরব।

সুজয় বোবা কালা।

সুজয়ের দাদার ওপর আবারও রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে যায়। হ্যাংলার মতো কেনই বা এখনি অফিসে জয়েন করতে আসা? বেশি কামাই হলে না হয় বড়জোর 'উইদাউট পে'তে ছুটি মিলবে। চাকরিতো আর যাবে না? আর যায়ই যদি—চিরকালই কী চাকরি করবে। রিটায়ারের দিন ঘনিয়ে আসছে না ভাবতে গিয়ে একটু থমকায়। দাদা তার থেকে কত বড়? আট-ন

বছরের না? সুজয়ের এখন বয়েস কতো? সবে তো চল্লিশ পার করলো। আশ্চর্য! দাদাকে চিরকালই কতো বড় বলে মনে হয়। এখন মনে হতে শুরু করেছে কতো 'বুড়ো'। তা নাই হোক। অসুখ যখন, তখন সাত তাড়াতাড়ি অফিসে আসার দরকারটা কী ছিলো? লোক হাসাতে, আর সুজয়ের মুখ হাসাতে বৈ তো নয়।

উঃ! ওরা বসে রইল বুকের ওপর জাঁতা হয়ে। আর সুজয়

জামাই বাবুর চিবোনো কণ্ঠস্বর আবার ধ্বনিত হয়, 'তোমার দাদার কথা যা শুনতাম, তাতে আমার তো ধারণা ছিলো একটু বোকা-সোকা ভালোমানুষ গোছের। এখন যা বুঝছি, তাতে তো ধারণাটা পাল্টাতে হচ্ছে।'

রাগে বিড়বিড় করা মনে বরফের শীতলতা এনে সুজয় বলে 'পাল্টাবার কারণটা কী?'

'এই তো চোখের সামনেই ভাসছে। দেশের বাড়ি গিয়ে বাস করিগে—' হুজুগ করে, সেখানে শেকড় গেড়ে বসলেন। তলে তলে যা কিছু বিষয় সম্পত্তি ওঁরই দখলে চলে যাবে।'

'ওঃ। আপনার বুঝি ধারণা সেখানে আমাদের অনেক বিষয় সম্পত্তি? আমিতো জানি এখনো ভাঙা বাড়ি, একটা ডোবা মতো পুকুর আর বিঘে কতক জঙ্গুলে জমি ছাড়া আর কিছুই নেই। পিসিও একবার থাকব বলে গেছল, চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল। থাকতে পারেনি।'

'বিঘে-ক-য়ে-ক!'

বড়দি বলে ওঠেন, 'ওরে বাবা সে কী কম না কী?…ওইতো এদের ওই গঙ্গার মা না কে, বলছিলো, তার কে জানা লোক আছে ওখানে। বলেছে ওখানেও এখন জমির দর সোনার দর। আগেকার বিঘের দরে এখন আধকাঠা হয় কি না। তার মানে লাখ-দু-লাখ সহজেই হাতে এসে যাবে।'

সুজয় কী হাতের সামনের ওই চায়ের কাপগুলো, যা টেবিলে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে তুলে নিয়ে লোকটার মুখের ওপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারবে? যাতে ওই পাইপ ঝোলানো মুখটা বেঁকে ঝুলে পড়বে।

ইস! সময় সময় যদি ইচ্ছেটা কাজে লাগিয়ে ফেলা যেত।

যায় না। শুধু ভিতরের দুরন্ত গর্জনকে শীতলতার আবরণ দিয়ে বলতে পারা যায় 'তা সেটা কী আমার সই-টই ছাড়াই হওয়া সম্ভব? মানে জমি টমি যারা কেনে তারা, দেখে না এর আর কোনো ভাগীদার আছে কিনা। পরে ঝামেলায় পড়বে কিনা। এটাইতো আইনি নিয়ম।'

'হ্যাঁ তা অবশ্য। তবে কি না হে ব্রাদার! জগতে যেমন 'আইন' আছে, তেমনি তার ফাঁকও আছে। চতুর ব্যক্তিরা, আটঘাট বেঁধে কত কী বেআইনী কাজ করে নেয় জানো তো সব?'

'জানবো না কেন ? খবরের কাগজের দৌলতে তো, সর্বদাই জানছি তবে আপনি আর ওই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে দামী মাথাটা খাটাবেন না দাদা। আমার দাদাকে আপনি যতটা চতুর ভাবছেন, তিনি ততটা বোধহয় নন।'

অ্যাঁ। এ কী!

ঘরের মধ্যে বোমা পড়লো ? এলার পরম মাননীয় বড় জামাইবাবুর এই অবমাননা ? যার ধাক্কায় তাঁর মুখ থেকে পাইপটা খসে মাটিতে পড়ে গেল। তিনি অসহায় ভাবে নিচু হয়ে হাতড়াতে থাকলেন।

অতঃপর তিনি ঘোষণা করলেন, আজ বোধহয় অফিস থেকে ফিরে আর এখানে আসবেন না। আসা যাওয়ার অসুবিধে বোধ হচ্ছে। তিনি কোনো হোটেলে ব্যবস্থা করে নেবেন।

তারপর ?

তারপর তাঁর ছোট শালীর হাউ হাউ করে কান্না, পায়ে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি, বরকে যথেচ্ছ কটু ভাষণ। মা, বাবা, বড়দি সবাইকে জনে জনে ধরে পায়ে পড়াপড়ি—জামাইবাবুর মত বদলাতে।

তা শেষ পর্যন্ত অবশ্য নেহাৎ ছোট শালীটার কেঁদে মরা চেহারাটার দিকে তাকিয়ে, ক্ষ্যামা ঘেন্না করে মতটা পালটালেন জামাইবাবু। তবে 'বীণাখানিতে' যে সুরটি বাঁধা হয়েছিল, আর অহরহ হৃদয় জুড়িয়ে ঝংকৃত হচ্ছিলো তাতে একটু ছেদ পড়ল। তেমন সুরটি আর বাজতে দেখা গেল না।

'শনি। শনি, ওই লোকটাই আমার ভাগ্যের শনি।' মায়ের কাছে আছড়ে পড়ে এলা। 'ওই দাদা। ভেতরে ভেতরে মনপ্রাণ সর্বখানি সেই তার কাছেই বাঁধা। ছেলে, মেয়ে, আমি অন্য আর সব আত্মীয়-স্বজন সবাই ফালতু'।

মা বিষণ্ণ, গম্ভীর।

বাবাই শুধু বলেন, 'তা, সুজয় তো ন্যায্য কথাই বলেছে। ওর সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পারিবারিক ব্যাপারে নির্মলের নাক গলাতে যাবার কী দরকার ছিলো ?'

'কার কোথায় কী সেন্টিমেন্ট থাকে।'

কিন্তু এ বাড়ির ছোট্ট ছেলে মেয়ে দুটো ?

তারা যেন হঠাৎ পরিণত, বিজ্ঞ একটা 'ব্যক্তি' বনে গিয়েছে। তাদের হাঁটা চলা নিঃশব্দে, তাদের কথা মৃদু সংক্ষিপ্ত। তাদের পড়া লেখা সম্পর্কে দায়িত্ব বোধ দেখবার মতো। বাড়িতে যে দুটো শিশু আছে, তা যেন টেরই পাওয়া যায় না।

এখন রান্না ঘরের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন তাদের মামনিটি। এবং মায়ের গাইড হিসেবে বড় মাসি। মুহুর্মুহুই রান্নাঘরের মধ্যে কলোচ্ছ্বাস আর আনন্দ ধ্বনিত হতে দেখা যেতো। এবং প্রায় রোজই অতি নতুন নতুন রান্নার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় খাবার পাত্র ঝলমল করতো, অকস্মাৎ সবই কেমন মিইয়ে

গেলো, চুপসে গেলো। ছেলে মেয়ে দুটোর টিফিন কোটোয় আবার সেই গতানুগতিক ডিম পাউরুটি কলার অবস্থান। · মোগলাই, চাইনিজ, রাশিয়ান ফ্রেন্সোসিয়ান এর দেখা মিলছে না। ওরা বাদ প্রতিবাদ করে না। বলে ওঠে না 'ও মামনি রোজ রোজ একই জিনিস? ভালো লাগে বুঝি?'

তথাপি, কোনো এক সময় ছেলে মেয়েকে একা পেলে, তাদের মামনি চাপা গলায় হিস হিস করে আঙুল তুলে তুলে বলে, 'ওই তোদের বাবা। চিরকাল এই করেছে। আমায় কখনো সুখ করতে দেয়নি। দ্যাখ, কী আহ্লাদে কাটাচ্ছিলাম। তোরাও কতো সুখে ছিলি। দুম করে তোদের বড় মেসোর মুখের ওপর একটা কড়া কথা বলে বসে, সব ঘুচিয়ে দিল। গুরুজনকে যে একটু মান্য করে কথা বলতে হয় এ জ্ঞান নেই।'

নীপু চোখ ভুরু কুঁচকে চুপ করে শোনে, উত্তর দেয় না। শুধু বুবাই-ই হঠাৎ বলে ওঠে, 'বড় মেসো বুঝি বাবার গুরুজন?'

'তা গুরুজন নয়? বড়দি আমার থেকে কতো বড়ো, তাঁর বর।'

'ও!'

বলে বুবাই জুতোর ফিতের ফাঁসটা টাইট দিতে থাকে। মুখে সহানুভূতির কোনো ছাপ দেখা যায় না।

বেচারী এলা।

কী কষ্ট তার। 'আপন' বলতে কে আছে তার? স্বামী নয়, সন্তানেরা নয়। যারা তাকে আপন ভাবে তারা এ বাড়িতে অতিথি বৈ তো নয়· তাদের মান সম্মান বজায় রাখবার চেষ্টায়, জান নিকলে যাচ্ছে এলার। অথচ বর যদি একটু বশংবদ হতো।

সে দিন থেকে বরের সঙ্গে কথা বন্ধ।

তবে মা বাবা দিদিকে আবার 'নির্জন' করে ফেলতে পেরে উঠেছিল এলা ক্রমশ ক্রমাগত তাঁদের কাছে কেঁদে কেঁদে, আর আপন ভাগ্যের দোষ দিয়ে দিয়ে। এবং দুঃখ জানিয়ে জানিয়ে।

জামাইবাবু?

তিনি অবশ্য হোটেলে চলে যাননি, থেকেই গেছেন, তবে তুষ্ণী ভাব।···তবু আশা কী ছেড়েছে এলা জামাইবাবুর কাছে কৃতার্থ মন্যের ভাব দেখিয়ে দেখিয়ে আর পোষা বিড়ালীর মতো আদর বাড়িয়ে বাড়িয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান দেখিয়ে দেখিয়ে, কিছুটা কায়দায় এনে ফেলেছে মনে হচ্ছে।

সেই ছেলেবেলার মতো গলা ধরে ঝুলতে পারলে আর গালে গাল ঘষতে পারলে, বোধহয়, শেষ জন্মটা চেয়ে নেওয়া যেতো। তো সেটা তো আর এখন সম্ভব হবে না। তবে—তার চিরকালের হিরো। বড়জামাইবাবুকে সে তো আর বরের নির্বুদ্ধিতায় চিরতরে হাতছাড়া করে ফেলতে পারে না। যেন তেন

ভাবে হাতে রাখতেই হবে। তার জন্যে আবারও যদি সেই 'খুকুমণির' ভূমিকাতে অভিনয় করতে হয়, করতেই হবে।...তাতে তো আর তার 'চরিত্তির খারাপ' হয়ে যাবে না।

বিধুখুড়ো হতভম্ব হয়ে বলে, 'এটা আবার কী হচ্ছে ভাইপো? হঠাৎ উইল করতে বসছিস যে? আশি পার করে ফেলেছিস নাকি? আর কী এতো বিষয় সম্পত্তি? যে উইল?'

ভাইপো হেসে বলে, 'আরে খুড়ো সেই যে কথায় আছে, গরীবের 'রাংই সোনা' এ তাই। বিষয় সম্পত্তি না থাকুক পিতৃপুরুষের দরুন দু-চার ছটাক মাটিতো আছে? তো সেইটেই তাঁদের বংশধরের হাতে তুলে দিয়ে যেতে ইচ্ছে। আমায় তো ভগবান, সে ভাগ্য দেননি, যে তাঁদের বংশধারা রক্ষা করে যাবার ভার নেবো। ভগবানের ইচ্ছেয় জয়ের ছেলেটাইতো এই বাঁড়ুয্যে বংশের বংশধর। তাই আমার ভাগটুকু তার নামে দানপত্র করে দিতে চাইছি। বয়েসের কথা বলছিস? মরার কী কোনো বয়েস আছে রে? এইতো— ওয়ার্নিং বেল এসেছিল একবার।'

'আরে বাবা তুই সরে গেলে তো আইনত ওরাই পাবে। এখনই বা দানপত্রের তাড়া কিসের?'

'দ্যাখো খুড়ো দেখছো তো পৃথিবীটাকে? চারদিকে জ্ঞাতি শত্তুর লোভে লকলক করছে। এই নিঃসন্তান লোকটা হঠাৎ মরে বসলে কোথা থেকে কী হয়ে যাবে কে জানে? হয়তো আইনত যারা পাবার তারা দেখবে, 'এঃ! ব্যাটার দেখছি কানাকড়িটুকুই ছিল সম্বল।'

'আর এখন থেকে দানপত্তর করে বসলে, যদি তোকে আর তোর বৌকে উচ্ছেদ করে বসে?'

'যদির কথা নদীতে যাক। জয়কে তুই এতো নীচ ভাবিস খুড়ো?'

'ওরে বাবা। ভাবিনা আমি কাউকে কিছুই। আসলে—এই নীচ সংসারে এমন কতো কীই তো হয়। তাই সব দিক দিয়ে ভাবতে হয়।'

সুমন তার দানপত্রের খসড়াখানা ভাঁজ খুলে মেলে ধরে বলে, সবটা পড়ে দ্যাখ ভালো করে। বাড়ির যে অংশটুকু তুই আমাদের জন্যে সারিয়ে টরিয়ে ঠিক রেখেছিলি, আমরা বসবাস করছি— রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘর, লক্ষ্মীর ঘর, আর ছোট একখানা শোবার ঘর, সেই অংশটুকুতে আমাদের দুজনের যাবজ্জীবনের বসবাসের অধিকার' রাখছি। তার থেকে তো উচ্ছেদ করতে পারবে না।'

'তা তোর পুকুরটা থেকেও তো কিছু আয় ছিলো, মেছোদের জমা ধরিয়ে দেওয়ার ফলে, বাগানের কলাটা, মুলোটা কুমড়োওতো কাজে লাগতো। দানপত্র করে দেবার পর কী আর তুই তার এক ইঞ্চি ভোগ করবি? যা ন্যায়বাগীশ। হয়তো সেই সব পাঠাতে থাকবি কলকাতায়।'

'তা ওটা পাকাপাকি হয়ে গেলে তো পাঠাতেই হবে। এমনিই তো না পাঠানো খুব অন্যায় হচ্ছে। নয় নয় করে গাছের নারকেলই তো কতো। সেখানে একটা নারকেল পাঁচটাকা দিয়ে কিনে খেতে হয়। একটা কাঁচা আম আশি পয়সা, একটাকা।'

'ওঃ তাহলে তো তোর আর একটা কাজ বাড়লো। রোজ বাজার সাপ্লাই।'

'রোজ আর কী জুটছে? ওই মাঝে মাঝে আর কী। যে কদিন পারবো।'

'কিন্তু তুইতো রিটায়ার করবি? তখন তোদের চলবে কি করে?'

'কী যে বলো খুড়ো? আমাদের দুটো বুড়োবুড়ির আবার 'চলা'। কতো খাই? কতো পরি? পেন্সনটা যে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না? আর আমি মরে গেলে? তোর বৌমার বিধবা ভাতাটাও তো থাকবে। সাধে বলে লোকে--সরকারি চাকরি। যেমন তেমনই হোক আমরণ ভাত কাপড়।' সে থাক, তুই এইটা রেজিস্ট্রি করে দেবার ভারটা নে বাবা। আর এর একটা 'জেরক্স কপি' করিয়ে ওদের কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করিস। এটা হয়ে গেলে আমি মরে শান্তি পাবো।'

বিধু রেগে বলে, 'আবার হঠাৎ মরার কথা উঠছে কেন? বেশ তো আছিস।'

'আছি। আবার হঠাৎ 'বেশ' না থাকতেও পারি। মাঝে মাঝে যেন 'ঘণ্টাধ্বনি' শুনতে পাই।'

বিধু খুড়ো খুড়ো হলেও ভাইপোর ভক্ত হনুমান। অতএব ভাইপোর কথা মত কাজটা করে তুললেন। দানপত্রের জেরক্স কপিটা এদের কলকাতার বাড়িতে এসে গেলো।

গেলো কখন?'

না যখন সুজয় নামের লোকটা বাড়িওলার সঙ্গে সেই মামলায় হেরে গিয়ে হাইকোর্টে আপিল করেছে।

এই তুচ্ছ বস্তুটার দিকে তাকিয়ে দেখবার সময় ছিল না তার। কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করালেন তার শাশুড়ি ঠাকরুন। তিনি ভারী মুখে বললেন, 'দ্যাখো বাবা, নির্মল আর বেলা তো আর তোমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে আসবে না তবে বেলা আড়ালে আমার কাছে বলছিল, বড়জামাই না কী বলেছেন, এও তোমার দাদার একটা প্যাঁচ। বলতে নেই যদি তোমার দাদার হঠাৎ ভালোমন্দ কিছু হয়ে যায়। তুমিই সবটার মালিক হবে। ইচ্ছে মতন বেচাবেচি করতে পারবে।...ওই সব বেচে, কলকাতায় মাথা গোঁজবার মতো, ছোট্ট একটু ফ্ল্যাট কিনে ফেলতে পারতে। ওখানেও যখন এখন জমির দাম অতো। কিন্তু এই যা হলো, তোমার দাদার ভাগটি, আর তোমার হবেনা। 'নাবালকের সম্পত্তি' হয়ে যাবে। তোমার অধিকার থাকবে না বিক্রি করবার।'

হঠাৎ সুজয়ের আবার মাথায় রক্তটা চড়ে যায়। সত্যিইতো। কথাটাতো

ঠিক। তাহলে তো দাদার মধ্যে প্যাঁচ আছে। খামোকা, দিব্যি বেঁচে থাকতে থাকতে খোশ মেজাজে অফিস করতে করতে হঠাৎ ভাই থাকতে নাবালক ভাইপোটাকে নিজের অংশটা 'দানপত্র' করতে বসলেন কেন? আমাকে টপকে, আমার ছেলে? তার মানে? আমার হাত পা খানিকটা বেঁধে দেওয়া।··· ছেলেটাকেই প্রতিপক্ষ বলে মনে হতে থাকে। তবু—শাশুড়ির কথায় বলে, 'দাদার কিছু' হলে সবটার মালিক আমিই বা হতে যাবো কেন? বৌদি? বৌদির তো হবার কথা।

শাশুড়ির অনাবিল হাস্যে বলেন, 'হ্যাঁ, তা ঠিক। তুমি তোমার উপযুক্ত সরল সাদাসিধে মহৎ কথাই বলছো। তবে কী জানো বাবা? নির্মল বলছিলো, তোমার বৌদিকে—নগদ কিছু মোটা টাকা ধরে দিয়ে, আর দুটো ভাল কথা বলে ওই দানপত্রেই তাঁরও সই করিয়ে নেওয়া যায়। ব্যবস্থা তো নেহাৎ কাঁচা করেন নি তোমার দাদা? নিজের এবং নিজের স্ত্রীর যাবজ্জীবন 'বসবাস' করার অধিকারটি রেখেছেন। তবে? তাঁর তো—মানে তোমার বৌদির তো এতে সুবিধেই হবে। একটা বিধবার একবেলার দুটো হবিষ্যির কতই বা খরচ?··· নগদ টাকাটা পেলে তীর্থ ধর্ম করতে পারবেন।'

'একটা বিধবার।' 'একবেলার দুটো হবিষ্যির।'

সুজয় হঠাৎ বাঘের মতো গর্জন করে ওঠে, 'কী বলছেন যা তা? যা মুখে আসবে, বললেই হলো?'

কিন্তু খানিক পরে, এই রাগটা থিতিয়ে গিয়ে, পুরনো রাগ রাগ ভাবটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো।

আপাতত মামলায় হার। এখন আবার হাইকোর্টে ছুটতে হবে। সেখানেও হার হলে? সবটাই দাদার জন্যে। দাদা মহানুভবতা করে বাড়িটা ছেড়ে না দিয়ে গেলে, কার সাধ্য ছিল সুজয়কে হটাবার? সুজয় যে ফালতু হয়ে গেছে, জবরদখলকারী বনে গেছে, সে তো সেই দাদার জন্যেই। আবারও এখন। মহত্ব দেখানোর ভানে এই প্যাঁচ।

নাঃ। আর ছেড়ে কথা নয়। আর চিঠিপত্রেও না। যাচ্ছি একদিন নিজে। মুখোমুখি গিয়ে সকলের সামনে মুখোশটা খুলে ধরব।

কোথায় যাবো? অফিসে?

নাঃ। সেটা ঠিক হবে না। তাতে নিজেরই হয়তো হামলাকারীর ভূমিকার দায়ে পড়ে যেতে হবে। সেই দেশের বাড়িতেই যেতে হবে। জন্মাবধি যার নাম শুনে এসেছি। জন্মেও যাইনি একবারও। সেই শিমুরালি। শেয়ালদা থেকে ঘণ্টা দেড় দুইয়ের রাস্তা।

হ্যাঁ। যাবে। পাড়ার, পাঁচ জনের সামনে দাদার স্বরূপটি প্রকাশ করে দিয়ে হ্যানস্থার একশেষ করে ছাড়বে।

কিন্তু 'যাব যাব' করেও, হয়ে উঠছে কই ? আবার হাইকোর্ট করতে নতুন নতুন উকিল ধরতে হচ্ছে। তাঁদেরও কতো প্যাঁচ। দুজনের কথা একরকম নয়। কেউ অগাধ আশ্বাস দিয়ে বলছেন, তুড়ি মেরে জিতিয়ে দেবেন। তবে হ্যাঁ কাঠখড়টা পোড়াতে হবে কিছু বেশি।...আর অপর কেউ কতো ধানে কতো চাল তা বোঝাতে বসে। বহুবিধ ফ্যাকড়া বার করে পাক দিয়ে সুতো লম্বা করছেন।

তবে মামলাটা যে বেশ দীর্ঘস্থায়ী বন্দোবস্তই চলবে, তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য চলাকালীন, সেই ব্যাটা বাড়িওলা তাকে উচ্ছেদ করতে পারবে না। কিন্তু যদি এতেও হার হয় ? তার মানে ধনে প্রাণে মারা যাওয়া।

অথচ তার আগে যদি সুজয় একখানা মাথা গোঁজার মতো আশ্রয় করে নিতে পারতো।...মুখের মত হতো। মামলা তুলে নিতো। বাড়িখানাকে কষে জখম করে...ছেড়ে দিয়ে চলে আসতো।

ইস। যদি গোড়াতেই মামলা না ঠুকে আপোসে আসতো। যদি বলতো 'আমায় কিছু ক্ষতি পূরণ দিয়ে আপনার জিনিস আপনি নিন মশাই।'

দূর। তাই বা কী করে হবে ? সেটা করতে পারতো সুমন ব্যানার্জি। সুজয় ব্যানার্জি নয়।

অতএব আবার গায়ে খাবিড়াবিছের কামড়ের জ্বলুনি। আঃ! কবে যে একবার সুবিধে করে চলে যেতে পারবো।...

মুশকিল হচ্ছে... এই যাওয়াটা কাউকে জানাজানি করে করার ইচ্ছে নেই। এলাকেও না।

এলা তো এখন 'অশোকবনে সীতার' মতো চেড়ি পরিবেষ্টিতা। উঃ! নিজে হাতে কী খাল কেটে কুমির এনে ঢুকিয়েছে, এলা ?

কী শান্তিতেই ছিলো কটা দিন।

দাদা বৌদি চলে যাবার পর, মনে একটা ভারমুক্ত হালকা ভাব এসে গিয়েছিলো। সর্বদা নিজেকে 'চোর চোর' মনে হচ্ছিল না। অবাধ গতিতে চলা ফেরা করে বাঁচছিলো।

বিবেকের কামড়টাকে প্রশমিত করা যাচ্ছিলো, অপর পক্ষের ওপর দোষারোপের ভার চাপিয়ে চাপিয়ে। কিন্তু তা আর কটা দিন ? কোথাথেকে এইসব আপদ বালাই এসে জুটল।

মনের অগোচর তো কথা নেই।

এলার পরম ভালোবাসার জনেদের সুজয় মনে মনে সর্বদা আপদ বালাইতো ভাবে। তা এই আপদ বালাইদের চোখ কান বাঁচিয়ে, কী করে একদিন বেরিয়ে পড়া যায় ?

কী করে ?

'অফিসের কাজে ট্যুরে যেতে হবে' বলবে। কিন্তু কোথায় সেই ট্যুর? যে সকালে গিয়ে সন্ধ্যায় ফেরা যায়? তাইতো ফিরতে হবে। সেখানে গিয়েতো আর খাবে শোবে না?

সেই থোভেল লোকটাকে একবার যাচ্ছেতাই করে, গালাগালি করে বেরিয়ে আসা বৈ তো নয়। না জলস্পর্শও করবে না।

কিন্তু ওই যাওয়াটাই করা যাবে কী ভাবে? কোনো একটা রবিবারই বেস্ট। না হলে সেই কালপ্রিটটিকে পাবে কী করে সঞ্জয়? তিনি তো অফিস ঠেলছেন।

তা চার্শারতে সঞ্জয়ও কম গেল না।

সামনের রবিবারে সঞ্জয়ের অফিসের এক সহকর্মীর ছেলের পৈতে। সেই উপলক্ষে অফিসের ক'জনকে যেতে বলেছে। অতএব সঞ্জয়কে ভোর ভোর বেরিয়ে পড়তে হবে বনহুগলীর ট্রেন ধরতে।

এলা ভুরু কোঁচকায় 'বনহুগলিটা কোথায়?'

'কি জানি, হবে কোথাও। তবে বলেছে তো সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরে আসা যাবে।'

'তা' জায়গাটাই জানো না, যাবে কী করে?'

আশ্চর্য! সঞ্জয় কী একা যাবে? আরো পাঁচ সাত জন যাচ্ছে না? তারা হাওড়া স্টেশনে হাজির হবে পোনে ছটার মধ্যে। ছটা কুড়ি না কতোয় যেন ট্রেন।

ওঃ সে বন্ধুর নিজেদের পুকুরের মাছে যজ্ঞি হবে।

নিজেদের গরুর দুধের দই। আলু বাদে তরিতরকারি শাকসবজি সব নিজেদের বাগানের। বাড়িতেই যাবে সঞ্জয় তার বন্ধুর ঐশ্বর্য।

এলা বলে, 'বেশ আছো বাপু তোমরা।

"অফিস' বলে একদম নিজস্ব একটা জায়গা আছে। নিজস্ব জগৎ।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত শোনার আগেই তো সঞ্জয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

এলা একটু অপেক্ষা একটু ঠ্যালা মেরে বলে, 'হ্যাঁ গো, তো উপহারের জিনিস কিছু কেনোনি? সকাল বেলাই বেরোবে বললে?'

সঞ্জয় ঘুম জড়ানো গলায় বলে, 'উপহার আবার কিসের?'

কেন? ওই পৈতের ছেলের। পেন সেট কিংবা কোনো ভালো ভালো কিছু বই বা

আঃ। ও কী আর আলাদা আলাদা দিতে হয়। উপহার ফান্ডে চাঁদা দিয়েছি, সবাই মিলে যা ঠিক করে।'

'হ্যাঁগো, কতো করে চাঁদা দিতে হয়েছে? ও বাবা এক্ষুনি এতো ঘুমিয়ে পড়লে? বলছি যে সাত আটজন তো যাচ্ছো, সবাই সমান চাঁদা দিয়েছ?'

'কী মুশকিল ? তা দেব না ?'

'বড়ো করে দিলে ?'

ওঃ। অসহ্য। মেয়ে জাতটার যে কেন এতো কৌতূহল।

সুজয় পাশ ফিরে বলে, 'ইয়ে —পঞ্চাশ টাকা করে।'

'আঁ তাহলে তো আলাদা আলাদা দেওয়ার বেশিই পড়ে গেল। আমি ভাবছিলাম, সুবিধে করতেই বুঝি—। তা চারশো টাকায়তো একটা ঘড়িই দেওয়া যাবে ভালো মতো।'

'যেতে পারে। ওরা কী ব্যবস্থা করেছে জানি না। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। কাল ভোরে উঠতে হবে। ঘড়িটায় অ্যালার্ম দিয়ে রেখোতো। ইয়ে সাড়ে পাঁচ না পাঁচটা দশে অ্যালার্ম না দেওয়া থাকলে বিপদে পড়ব।'

'তোমার আবার এখন বিপদ।'

এলা হাসে, 'বাবা তো রাত চারটে থেকে উঠে কাশতে শুরু করেন। ঘুম কোথায় ছুট মারে।'

কথাটা সত্যি। এই অবস্থাতেই কাটছে এখন বাড়িসুদ্ধ সকলের। কিন্তু সেটা এলার কাছে বিরক্তিকর নয়। হাস্যকর মাত্র।

মিথ্যে ঘুমের ঘোরের মধ্যেও সুজয় ভাবে, এই জন্যেই বুঝি বলে 'নারী বিচিত্ররূপিণী।'

আগের রাতে সুষমাকে বলে রেখেছে সুমন 'কাল আর ভোর রাত্তিরে উঠে ভাত রাঁধতে বোসো না। কাল আর ভাতটা খাব না'

'কেন গো কী হলো ?'

তেমন কিছু না। খুব সর্দি কামড়েছে। দুটো মুড়িটুড়ি খেলেই হবে।'

'মুড়ি। হুঃ। দাঁতের কী জোর বাবুর। কেন গরম গরম দুখানা রুটি আর একটু আলুচচ্চড়ি করে দেব।'

'সেই করাই চাই ?'

'না চাই না ? তো সবথেকে ভালো হতো চায়ের সঙ্গে বেশি করে দুখানা টোস্ট খেয়ে নিলে। তা যেমন না তোমাদের এখানের পাউরুটির ছিরি। তাও টোস্টারের বদলে কয়লার উনুনে চাটুতে সেঁকা। ছিঃ। তোমার দেশে এসে গাঁইয়া বনে গেলুম। কলকাতায় কখনো ভেবেছি—চাটুতে সেঁকে টোস্ট হয় ?' হি হি হি।

সুমন একটু হেসে বলে, আমার ঠাকুমা দিদিমারা পাউরুটিরই ব্যবহার জানতেন না। জানতেন ওটা 'অখাদ্য' মেলেচ্ছদের ছোঁয়া, ছুঁয়ে ফেললে চান করতে হয়। 'জানার কী কোনো স্ট্যান্ডার্ড' আছে সুষমা ? আরে বাবা—হরবকত রুটিই জানতেন না। ভাত খাওতো খাও। নচেৎ মুড়ি, চিড়ে, খই

খাও। তাঁদেরওতো জীবন কেটেছে। বরং আজকের থেকে অনেক সুখে আনন্দেই কেটেছে।'

সুষমা একটা হাই তুলে হাতপাখাখানা নাড়তে নাড়তে বলে, 'তোমার দিনদিন যা মতিগতি দেখছি, শেষ পর্যন্ত না খুনো রামনাথের চ্যালা বনে যাও।'

'সেটাই বোধহয় সত্যি সুখের অবস্থা সুষমা।'

'তাই দেখছি। শেষ পর্যন্ত না দাড়ি কামানো বন্ধ করে ফেলে দাড়ি রাখতে শুরু করো।'

সুমন হেসে ফেলে। সুষমার মাথায় একটু মেরে বলে, 'ওইটিই বোধহয় পারব না। দাড়ি দাড়ি মুখ দেখলেই নিজেকে কেমন অসামাজিক মতো লাগে। তার আবার এখন দাড়িতে পাক ধরেছে

সুষমা স্বামীর হাতখানা টেনে নিয়ে নিজের গালে একটু বুলিয়ে নেয়। আর তখনই একটু যেন চমকে উঠে বলে, 'হাতটা যেন ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে মনে হলো।'

'আরে দূর। না না, সর্দি হলে অমন হয়।'

খুড়ো বলেন, নিয়মিত 'চ্যবনপ্রাশ' খেলে কখনো সর্দিকাশি ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারে না।'

'তবে আর কী। হাড় বুড়োদের মতো, রোজ চ্যবনপ্রাশ খেতে বসি। খুড়োর কথা বাদ দাও। খুড়ো নিজে খায়?'

'তা তো জানি।'

'না না কিছু হবে না। ওর শুধু মাতব্বরি, আর অন্যের ওপর ডাক্তারি ফলানো।'

'তা তুমি তো তোমার নিজস্ব দুটো হোমিওপ্যাথিগুলিও খেতে পারতে বাপু।'

'ছাড়োতো।'

'শরীর তেমন খারাপ লাগলে নাহয় অফিস নাই গেলে।'

'নাঃ। তোমায় একটা কথা বলে ফেলে দেখছি দারুণ বিপদে পড়ে গেলাম। ভোর বেলা উঠে দুদিকে দুটো উনুন জেবলে তুমি পঞ্চব্যঞ্জন ভাতই রেঁধ মহাশয়। কষে পেটে ঠেলে নেব।'

হেসে ওঠে।

এই। এইগুণেই সুষমা তার সারা জীবনের সমস্ত অভ্যাসের বিপরীতে, হাস্যমুখে চালিয়ে যাচ্ছে। যে মানুষ দুচার ঘণ্টা লোডশেডিঙে 'বাপরে মারে' করতো, সেই মানুষ এই বিদ্যুৎবিহীন জীবনযাত্রায় মানিয়ে ফেলেছে। এটাই যেন সব চেয়ে কষ্ট লাগে। নিজের জন্যে অতোটা নয়, যতোটা পরের জন্যে। সারাদিনের পর তেতে পুড়ে এসে দাঁড়ানো মানুষটার হাতে এক গ্লাস ঠান্ডা জল

ধরে দিতে পারে না। মাটির কলসি কু'জোয় জল ভরে তার গায়ে সারাদিন ভিজে গামছা জড়িয়ে রেখেও কতটুকু ঠাণ্ডা হয়? ফ্রিজের মতো? আর এই রাতের ঘাম। নিজে বাতাস খাবার হলে সুষমা যতোই পাখা নেড়ে মরে এক এসময় কখন যেন হাত থেকে পাখাখানা খসে যায়।

আর মাঝ রাত্তিরে বিছানায় হাত বুলিয়ে দেখে বিছানার চাদর ভিজে সপসপ করছে। ভারী ঘামের ধাত সুমনের।

এই কষ্টগুলো সইতে হচ্ছে তাকে। অথচ—কিছু খরচা করলেই বিদ্যুৎ আনা যায়। রাস্তায় আছে। তবে কৃষ্ণপক্ষে জ্বলে, শুক্লপক্ষে নয়। তা হোক—বাড়িতে নিয়ে আসা বেশি কিছু শক্ত নয়।

কিন্তু সুমনের যুক্তি, পাড়ায় আরো দশজন তো বিনা বিদ্যুৎতেই চালাচ্ছে। আমরাই বা কী এমন তালেবর যে পারবো না চালাতে। তার ধারণায় ওই আয়াশটুকু আহরণের ফলে, তারা পড়শিদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, দূরত্ব রচিত হবে। তারা এদেরকে 'কলকাত্তাই' ভাববে। 'শহুরেবাবু' ভাববে।

সব বাড়ির পুরুষরাতো প্রায় সকলেই সারাদিন বাইরেই কাটায়, অফিসে পাখাতো বটেই কেউ কেউ এয়ারকুলার ঘরেই দিন কাটায়। তারাওতো বাড়িতে এসে হরিকেনের আলোয় লেখে, পড়ে, কাজ চালায়। মাটির কলসির জলেই পরিতৃপ্ত হয়।

সুষমা এতো যুক্তির সঙ্গে পেরে ওঠে না।

সুষমা কেবলই তাদের সেই বিডন স্ট্রিটের বাড়িখানার দুখানা পাখাওলা ঘরের ছবিটা দেখে।

সুষমা তার পুজোর ঘরের ছোট্ট পাখাখানা দেখতে পায়। সুষমা মনে মনে ফ্রিজের ঠাণ্ডা জল খায় ঢকঢক করে। সুষমার রাত্রে বই পড়ার দুর্দান্ত নেশাটা কেটে গেছে।…বই যা পড়ে দুপুর বেলা।

অবশ্য দুপুরটা অনন্ত। সুমন ভোরবেলা বেরিয়ে যাবার পর, আর রাত্রে ফেরা পর্যন্ত—সবটাই তো দুপুর।…অনন্ত অবসর।…কতো বই পড়বে? পাবেই বা কতো?…

বিধু খুড়ো স্থানীয় লাইব্রেরির সেক্রেটারি বলে, একসঙ্গে দু-তিনখানা বইও তো নিয়ে আসতে পারেন।

তবু—সুষমার মনে হয় এখানে যেন জীবনটা থেমে বসে যাবর কাটে। কলকাতায় থাকতে কী সুষমা, ইচ্ছে মতো রাস্তায় বেরোতো? কদাচ না। এখানে তো বরং হুটহাট বেরিয়ে পড়া হয়।

বামুন গিন্নীরা বামুন বাড়িতে যখন তখনই যাচ্ছে। পুজো নিয়ে গাছের ফল-পাকুড় নিয়ে, পঞ্জিকায় দিনক্ষণ দেখতে।

যখন তখন যায় সরকারদের বাড়িও। তাদের বিরাট একান্ন পরিবার, অনেক

ছেলেপুলে, বাড়ি সর্বদা জমজমাট।…কর্তারা কেউ অফিস কাছারির ধার ধারে না। কিসের যেন ব্যবসা। ভোরবেলার ট্রেনে মালচালান দিতে যায় একজন। নচেৎ বৈঠকখানা ঘরে বসে, তাস, পাশা দাবা পড়া নিয়ে মশগুল।…

সুষমা অবশ্য সেই সদর দিয়ে যায় না। খিড়কি দিয়ে যায়, অন্যপথ ঘুরে। কিন্তু গিয়ে প্রাণ জুড়োয়। কতোগুলো যে ছোট ছেলে মেয়ে। তারা কেউ দুলে দুলে পড়া মুখস্থ করছে। কেউ শ্লেট পেন্সিল নিয়ে অঙ্ক কষছে, কেউ বা উঠোনে দাগ কেটে এক্কাদোক্কা খেলছে। কোনো কোনো মেয়ে আবার পুতুলের সংসার নিয়ে ব্যস্ত। পুতুলের বিয়ে, মুখে ভাত সাধ ষষ্ঠিপুজো। কী নয়।

আহা। এ পৃথিবীও আছে এখনো।

তবু রোজ রোজ তো আর যাওয়া যায় না। আর গেলেও, বিভোর হয়ে বসে থাকা যায় না। ভালো দেখাবে কেন?

বাড়ি ফিরে এলেই প্রাণটা খাঁ খাঁ করে ওঠে।

প্রাক সন্ধ্যেবেলায় মন্দিরে আরতি দেখতেও তো যায়। তবু যেন মনে হয়, এখানে দিনগুলো যেন থমকে বসে থাকে। জীবনটা যেন অনড় হয়ে পড়ে থাকে।

তবু সব কষ্ট দূর হয়, সুমন নামের লোকটা ঘরে ফিরলে। কী আশ্চর্য মানুষ। 'অসুবিধে'-এ যেন ওর ধারেকাছেও স্পর্শ করতে পারে না। এতো প্রাণশক্তি ওর মধ্যে কে যোগান দেয়? তাই জ্বর আসা শরীরেও বলে উঠতে পারে. 'বেশ বাপু ভোরে উঠে পঞ্চব্যঞ্জন ভাত রেঁধ। পেটে ঠেসে নেবো।'

ও কী সুষমাকে সান্ত্বনা দিতেই. এমন শক্তি সঞ্চয় করে?

ঘুম থেকে উঠে সুষমা দেখলো, মানুষটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। গলায় ঘাম. কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। না, হলে জ্বরটর হয়নি। তবু সুষমার মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি জাগল। রোসো, আজ ওর অফিস কামাই করিয়ে ছাড়ছি। ডাকবো না। অনেক বেলা হয়ে গেলে আর প্রস্তুত হয়ে, টাইমের ট্রেনটা ধরতে পারবে না। নিত্যদিনের সঙ্গীরাও হাতছাড়া হয়ে যাবে, বেশ হবে। অতোটা শরীর খারাপের পরই, সাত তাড়াতাড়ি অফিসে জয়েন করল। একদম ছেদহীন। কামাইয়ের নাম নেই। একটা দিন বিশ্রাম নিক। তাছাড়া আজতো শনিবারের অফিস।

কামাইয়ে অতো ক্ষতি হবে না। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। স্নান সেরে চলে এলো রান্না ঘরে। নাঃ, আজ আর ভাতটা রাঁধবে না। রুটিই করবে দুখানা। যথারীতি বালতির তোলা উনুনটায় আঁচ দিয়ে জনতা জেবলে তরকারি বাঁধতে বসলো সুষমা। পরিপাটি করে বেগুন ভাজা, পটল ভাজা, আলু চচ্চড়ি, এবং সুমনের প্রিয়, আস্ত পটলের ডালনা রাঁধে। উনুনটা ধরলে,

ছোলার ডাল চড়িয়ে দেয়। এসবতো করতেই হয়। বিধুখুড়োওতো তাদের রান্নাঘরের খদ্দের।

খুন্তি নাড়তে না ড়তে হঠাৎ রান্না ঘরের কোণের দিকের জানলাটায় চোখ পড়তেই সুষমা যেন চমকে উঠলো? এটা কখন হলো? কালও তো কই চোখ পড়েনি? কৃষ্ণচূড়া গাছটা কালওতো ন্যাড়া বোঁচা হয়ে পড়েছিলো। কাল কী পরশু হয় তো। চোখে পড়েনি। আজ দেখছে রাতারাতি গাছটা যেন লালে লাল হয়ে গেছে। কখন ঘটলো এমন অপূর্ব ঘটনাটি? আহা এই জন্যেই কবি লিখে গেছেন, 'ফুল যে আসে দিনে দিনে। বিনা রেখায় পথটি চিনে।' এক মহিমময় মূর্তি হয়েছে গাছটার রাতারাতি।

ডালটায় একটু জল ঢেলে মাখা ময়দাটা বাটি চাপা দিয়ে চলে এলো ঘরে। সুমনকে ডাকতেও বটে, এবং এই অপূর্ব দৃশ্যটি দেখাতেও বটে। দেখে কী সেও এমনি চমকে যাবে? না কী বলবে, 'আরে ওতো কালই দেখেছি।'

কখন যে কে কী দেখছে। দুটো কথা বলারও সময় নেই। অথচ, সংসার বলতেও তো কিছু নেই। 'সময়' বলতে তো ছুটির দিন। তো ছুটির দিনটি হলো কী পাড়াসুদ্ধ লোক একে একে জুটতে লাগল। ঘরের মধ্যে একটা মানুষ যে আনচান করতে থাকে, দুটো কথা বলার জন্যে, সে আর কার খেয়াল থাকে। ...রাতে কোনো সময় এই নিয়ে অনুযোগ করলে, স্বামীটি অপ্রতিভ ভাবে বলেও, 'কী করবো বলো? মানুষজন এসে পড়লে তো আর বেজার ভাব দেখাতে পারা যায় না!'

তা সেটা যে যায়না, তা কী আর সুষমার জানা নেই? হয়তো কুটনো কুটতে বসেছে, সুমন সেখানে এসে একটা টুল পেতে জাঁকিয়ে বসে। একটু গল্প করতে শুরু করেছে, ব্যস। অমনি কেউ না কেউ সুষমার কাছে এসে হাজির। হয় বামুন মাসি নয়, গোয়ালা, কে? নয় হাজারির মা। এইতো গেলো রবিবারেই, সুমন সেই রকম এসে বসে হেসে হেসে বলছিলো, 'এতো সজনে ডাঁটার পাহাড়! কতো চিবোবে? ছাড়াতেও তো কম সময় লাগবে না!'

'আহা! চিবোবার জন্যেই যেন। দিয়ে গেল একবোঝা সরকারবাড়ি থেকে।'

সুমন মৃদু হেসে বলে, 'সরকারবাড়ির সঙ্গে শুনি তোমার খুব আঁতাত। কার সঙ্গে? গিন্নির সঙ্গে? না—' হাসছিলো কথাটায় ড্যাশ টেনে—

সুষমাও তেমনিভাবে বলে উঠেছে। 'দূর। গিন্নির সঙ্গে আবার আঁতাত, করতে হলে, কর্তার সঙ্গেই করতে হয়। তো শুনছো কোথা থেকে।'

সুমন বলে উঠেছে, শোনাবার লোকের আবার অভাব। শুনি, না কি ঘনঘন ওবাড়ি ছোটো? ইস, এই বুড়োবয়সে আমায় অনাথ করে, অন্যদিকে মন?'

ব্যস, সেই মহামুহূর্তে বামুনমাসির আবির্ভাব। 'অ বৌমা! সেই যে নারায়ণের ঘরে তুলসী দিতে বলেছিলে? তার প্রসাদটুকু ধরো কাল সন্ধ্যেয় আর আসতে পারিনি।'

ব্যস, হয়ে গেল রসভঙ্গ।

হয়তো বা কোন সময় একদিন সুমন দাড়ি কামানোর জন্যে একটু গরম জলের প্রার্থনায় রান্না ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখে বলে উঠেছে, 'আচ্ছা কলকাতায় থাকতে তোমার অতো শুচিবাই ছিলো, যার জন্যে ছোট বৌমার অতো অসন্তোষ অশান্তি। সে কই কোথায় গেলো? কই, এখন তো আর দেখি না তেমন? সর্বদা তসর গরদ পরেও বেড়াও না—'

সুষমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে, 'আহা! এখানে কে মুরগির ডিম সেদ্ধ খেতে টেবিলে মরিচ গুঁড়োর শিশি থেকে মরিচ গুঁড়ো নিচ্ছে? কে বাসি কাপড়ে, কিসের না কিসের হাতে ভাঁড়ারে ঢুকে চিনির কৌটো টানছে? এখানে কে—'

ব্যস, কথা শেষ হয়না। ভীমের গদার মতো ইয়া মোটা একখানা থোড় কাঁধে নিয়ে হরিপদর কোলে ছেলেটা এসে দাঁড়ালো দাঁত বার করে। 'বাবা পেঠিয়ে দেলো।'

ব্যস! সেদিনের মতো, গল্প করার দফারফা।

'এতো বড় থোড় কে খাবে রে আমাদের? অ তারাপদ?'

'তা কী জানি। বাবা বললো, টাটকা থোড়, খেলে শরীরের রক্ত পোষ্কার হয়।'

এমনই তো চলে রোজই।

এখানে তো দরজায় বেল বাজাবার প্রশ্ন নেই। চারিদিকে হাটপাট। অবারিত দ্বার।…মূল সদরটা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে আছে, ভাঙা ইটের স্তূপ হয়ে। আশপাশের যেখান দিয়ে ইচ্ছে ঢোকো। বাগানের পাঁচিল ভাঙা নামমাত্র একটা বেড়ার দরজা আছে, তো সেটা তো বাইরে থেকে খোলবার ব্যবস্থাই করা আছে।

সুষমা এখানে এসে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। তার 'আমি' টাকে আর খুঁজে পায় না। শুধু যখন সুমনের কাছাকাছি সুমনের মুখোমুখি। তখন সুষমা 'সুষমা'।

আজ এখন ওই কৃষ্ণচূড়া গাছের হঠাৎ যৌবনের ঝলমলানি দেখে সুষমা যেন দিশেহারা হয়ে গেলো। ভাবলো রোসো, আজ আর অফিসে যেতে দিচ্ছি না। বলবো, আজকের দিন তুমি আমায় দেবে। আজতো রবিবার নয় যে পাড়া-সুদ্ধ ভদ্দরলোকদের তোমার ওপর প্রেম উথলে উঠবে। তবে ডেকে দিতে হবে। আর না ডেকে দিলে, রাগ করবে। অফিস না যাক, বেলা অবধি বিছানায়, পড়ে থাকা তার ধাতে সয়না। উঠেই পড়তো এতোক্ষণে। ডাকবার তোয়াক্কা রাখতো না। আজ ওঠেনি, নেহাৎ কাল রাত্তিরের গরমের দাপটে ভালো ঘুম

হয়নি বলেই। ঘরে চলে আসতে আসতে আবার উমোনের ভাঙা পাঁচিলের ওপারের কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে তাকালো। আপন মনে মৃদু স্বর করে গেয়ে উঠল, 'ওরে ভাই আগুন লেগেছে বনে বনে—'

ঘরে চলে এসে থমকালো।

এখনো এতো অঘোরে ঘুমোচ্ছে মানুষটা!

কাছে চলে এলো, 'কী গো এখনো ওঠোনি?' সাড়া পেল না। জ্বর বেড়েছে নাকি?

তাকিয়ে দেখলো, গলায় থিকথিক ঘাম। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তাহলে তো জ্বর নেই।

বিচার ত্যাগ করে, কাচা কাপড়েই বিছানা ছুঁয়ে গায়ে হাত দিয়ে দেখলো।… গলায় কপালে ঘাম। অথচ গা আগুন। জ্বরে কাঠ ফাটছে।

এটা কী জ্বর?

ডাক্তার এসে নিরীক্ষণ করে দেখে বললেন, 'আমিতো ঠিক বুঝছি না। আপনি খুড়ো, অন্য বড় ডাক্তার ডাকুন।'

খুড়ো কাতর ভাবে চারিদিক তাকান।

বড় ডাক্তার।

কোথায় সে দুর্লভ বস্তু?

হঠাৎ এক সময় দেখা গেলো রোগী বিড়বিড় করে কী বলে চলেছে। অথচ ডাকলে সাড়া নেই।

বামুন মাসি এসে হুমড়ে পড়লেন।

'এতো দেখছি, ভুল বকছে। কবরেজমশাইকে একটু ডাকলে হয় না?'

কবরেজমশাই?

অতিবৃদ্ধ সেই ভেষকাচার্য নিজেই নড়তে পারে না। তবু নিয়ে আসা হলো তাঁকে সাইকেল রিকশা করে। তিনি দেখে শুনে বললেন, 'এতো দেখছি সান্নিপাতিক বিকার। রক্ত মাথায় চড়েছে। তাই কাঠফাটা জ্বরের সঙ্গে ঘাম। মনে হচ্ছে ভেতরে ভেতরে অনেক দিনধরেই সান্নিপাতিক ধরেছিলো। এখন ওষুধ হচ্ছে ভগবান। তবে মাথায় বরফ দেওয়া দরকার।'

কিন্তু কে আনবে?

পাড়াসুদ্ধ পুরুষ ও ছেলেরাতো ভোরের ট্রেনে শহরে ছুটে গেছে। এমন কী জোয়ান বয়সের আইবুড়ো মেয়েগুলোও। তারাও আজকাল ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে নানা ধান্দায়।

খুড়োই গেলেন সাইকেল রিকশা ছুটিয়ে… স্টেশনের ধারের 'ঠান্ডা বোতলের' দোকানে। সেখানে ভারি ভারি প্যাকিং বাক্সর মধ্যে 'করাতের গুঁড়ো' চাপা দেওয়া বরফের চাঁই মিললো।…

কিন্তু কতোই বা মিললো ! শেষ গতি বালতি বালতি জল মাথায় ঢালা। তবু বিকারের রুগী প্রলাপ বকে চলেছে। সর্বদা বিড়বিড় করে মাঝে মাঝেই চীৎকার করে। কে ? কে এসে দাঁড়ালো ওখানে ? জয় ? · কী রে ? রাগ হয়েছে ? কথা বলবি না ?

ক্ষমা করে দে ভাই। আমি কী জানতাম ? বল আমি কী জানতাম, তুই ফ্ল্যাট ঠিক করিসনি ? ··আমি ভাবলাম তুই—তোরা···আমাদের ফেলে চলে যাবি ··। জয় ! জয় ! আমি ইচ্ছে করে তোর অনিষ্ট করতে পারি ? এই কথা তুই ভাবলি ? বড় বৌ। ওই ছোট্ট ছেলে মেয়ে দুটোকে ওরা আমার কাছে আসতে দিচ্ছে না কেন ? ··বড় বৌ ··ওরা কারা ? আমাদের বাড়িতে ? অচেনা অচেনা সব ? তাহলে কী করে যাবো আমি ?··· বড়বৌ। আজ শনিবার না ? ··আজইতো আমার সেখানে যাবার কথা···। একত্রিশের তিন বিডন স্ট্রিট ···ওঃ। ওদের চলে যেতে বলোনা।···আমি যে যাবো আজ। · যাবো থাকবো। ···বলবো, 'চলে এলাম রে। ··তোদের না দেখে আর থাকতে পারছি না যে।'···

আবার ঝিমিয়ে পড়েছে। বিড়বিড় করছে ।

মুখের কাছে কান নিয়ে গিয়েও বোঝা যাচ্ছে না কী বলছে···

ক্রমে রাতের দিকে লোকে লোকারণ্য ··শিমুরালির বাড়ুয্যে বাড়ির উঠোনে দালানে, ঘরে।···

হাসপাতাল থেকে সেখানের ডাক্তারকেও আনা হলো একবার···তিনি রুগী দেখে মুখভারি করে বললেন, 'এ রকম অবস্থায় আমার ওখানে নেওয়ার কোনো ব্যবস্থা দেখছিনা।···স্ট্রেচার নেই। লোক নেই। তাছাড়া অক্সিজেন সিলিন্ডারওতো নেই। দরকার হলে—হতেই পারে। হবেই অক্সিজেন দিতে পারা যাবে না। হসপিটালের বদনাম হবে।···পাড়ার মস্তানরা তেড়ে গিয়ে ভাঙচুর করবে।···একটা ইনজেকশান দিয়ে যাচ্ছি, ঘুম পাড়িয়ে রাখবে।··· 'ডিসটার্ব'টা' কমবে।' ··

ঘন অন্ধকার চরাচর।

রাত্রে আর সেই কৃষ্ণচূড়ার বাহার দেখা যাচ্ছে না···আর পাঁচটা গাছের মতোই ছায়াছায়া কম্বল মুড়ি দেওয়া বুড়োর মতো বসে আছে যারা এখানে সেখানে তাদের মতো।···

ক্রমেই পাড়ার সবাই একে একে নানান উপদেশবাণী দিয়ে, আর দরকার হলে ডাকবার আদেশ দিয়ে আশ্বাস জানিয়ে বিদায় নিলেন ···

ওষুধের প্রভাবে বেহুঁস রোগীটাকে আগলে বসে থাকলো গোটা তিন-চার মানুষ।

সুষমা, বিধুখুড়ো, বামুন মাসি, আর হরিদের কেলে শুঁটকো ছেলেটা তারাপদ।…সে অবিরত সেই প্যাকিং বাক্স ভর্তি করাতের গুঁড়োগুলো হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে দেখে চলেছে বরফের টুকরো টাকরা আছে কি না একটু।…তখন থেকে খুব ইচ্ছে ছিলো একটুখানি বরফ খেতে।

শনিবারের রাত কাটল।

রোগীর সেই মৃদু ঠোঁট নাড়া বিড় বিড়ানিটা থেমে গেল। নিথর পাথর হয়ে গেলো দেহটা।…আর কপালে 'কাল ঘামের' ফোঁটা নেই। গলায় নেই থিকথিকে ঘাম।…

খুব পরিষ্কার দেখাচ্ছে মানুষটাকে।

কাল থেকে যে সারারাত ভোর বিছানায় পড়ে আছে, অবিরত বিছানার চাদরখানা আঁকড়ে মুঠোয় চেপে চেপে ধরেছে, এখন আর তার চিহ্ন নেই। বিধুখুড়ো তার মাথার বালিশটাই ঠিক করে দিয়েছেন। চাদরখানা হাত ঘষে ঘষে টানটান করে দিয়েছেন।

সকাল হতে বামুন মাসি উঠে গেলেন স্বগতোক্তি করে। 'যাই ঠাকুরের সাধন আরতিটুকুতো সারতেই হবে। কেষ্টকে একটু জানিয়ে আসি।…আবার আসছি বৌমা। পাড়ার পাঁচজনা এসে দাঁড়ালো বলে। কী ভগবানের দয়া। আজ রবিবার।'

পাড়ার পাঁচজনও শতমুখে বলে চলেছেন, ভগবানের কী দয়া, যে আজ রবিবার।'

ওই সুমন বাড়ুয্যে নামের লোকটা মাত্র কিছুদিন দেশে এসে বসবাস করলেও, সকলেই তাকে ভালোচক্ষে দেখেছে ভালোবেসে এসেছে।…তাই তার শেষকৃত্যের সময় নিজেদেরকে কাজে লাগাতে পারবে ভেবে সন্তুষ্ট চিত্তে বলছে, ভগবানের কী দয়া, আজ রবিবার পড়েছে।'

পাড়ার মহিলারাও। তাঁরাও মনে মনে ভগবানকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছেন তাঁর দয়া বাবদ। রবিবার পড়ার দরুণই না, আজ 'সংসার কর্মে' একটু শিথিলতা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।…সাত সকালে টাইমের ভাত রাঁধতে হবে না। ছেলেপুলের স্কুল নেই।…চান করতে যাবার আগেই একবার…মৃতের বাড়িটা ঘুরে আসা যাবে।…যতই গা মেরে হাঁটুন ভীড় ভাট্টার মধ্যে মড়া ছোঁওয়া-ছুঁয়িতো হয়ে যাবেই।…অন্যদিন হলে, এ সুবিধেটা হতো?

কে যেন বললো, 'ভাইকে খবর দেবার কী হবে?'

কে উত্তর দেবে?

একসময় বিধুখুড়োকেই নাড়া দিয়ে প্রশ্নটা করলে কে একজন, 'খুড়ো, ডাক্তারের সার্টিফিকেটটা তো চাই। আর ভাইকে খবর দেবার কী হবে?…'

বিধু হতাশ চোখ তুলে বলেন, বাড়ির ঠিকানা বলে দিলে, কেউ খুঁজে বার করে যেতে পারবে?'

সেটা আবার কে পারবে?

কোনোখান থেকে টেলিফোন করা যায় না?

যেতো। যদি রবিবার না হতো। অফিসেই করা যেতো। আজ সেসব বন্ধ।

অতএব এ ক্ষেত্রে আজ 'রবিবার'টা পড়ায় 'ভগবানের দয়া' বলা চললো না।

আর লোক পাঠালে? একটা মানুষ গিয়ে, পড়ে দেখা হলেও তার চলে আসতে তো সন্ধ্যে হয়ে যাবে। ভাই এসে মুখাগ্নি করতে···বাসি মড়া হয়ে যাবে না?

শেষ নিঃশ্বাসটা পড়েছে কখন? ভোর রাত্রিতে না?

তাহলে তো শেষ কাজ করতে 'বাসিমড়া'তেই দাঁড়ায়।

ঠাকুর মশাইয়ের কাছে গিয়ে একবার বিধান নেওয়া হোক·· কী বিহিত? আর এও জানা হোক, 'দোষ পেয়েছে' কি না—

দোষতো কিছুটা পেয়েইছে। 'শনি বারের মড়া' বলে কথা।

শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় খাটে একটা 'গর্ভমোচা' সঙ্গে দিতে হবে।···না দিলে বিষম দোষ। কথায় আছে 'শনি সাধনের মড়া, সঙ্গী খোঁজে।'

কিন্তু মোচাটা কার বাড়ির গাছ থেকে দেওয়া হবে?

তাতেও আবার কিছু দোষ ঘটবে না তো গেরস্থর?···সেটাও জিগ্যেস করো ঠাকুরমশাইকে। 'ঠাকুরমশাই' অর্থে ওই ভাঙ্গা মন্দিরের বিগ্রহের পুরোহিত।··· অসাক্ষাতে যাকে 'গেঁজেল বুড়ো' বলে অভিহিত করা হয়।···তবু বিপদ কালে, তিনিই ভরসা। তাঁকেই 'পরিত্রাতা' বলে আঁকড়ে ধরতে হচ্ছে।

এই অতি আধুনিক যুগে, যখন এইসব শিক্ষিতজনেরা সামাজিক পারিবারিক, কুলাচার ইত্যাদি যাবতীয় প্রচলিত আচরণকে 'কুসংস্কার' বলে 'ড্যাম ইট' ডোন্ট কেয়ার করে থাকেন, তারাই এখন মাথা ঘামাতে বসেছেন, কার বাড়ির কলাগাছের ঝাড় থেকে মোচাটা নেওয়া চলতে পারে। কাদের বাড়ির ছেলেরা শ্মশানে যাওয়ার উপযুক্ত।···তাদের কারো বৌ অন্তঃসত্বা কি না।

নয় নয় করে, জ্ঞাতিতো আছে কিছু এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তাদের তো আবার মহা ঝামেলা, 'হাঁড়ি ফেলতে হবে,' 'অশৌচ নিতে হবে'। 'কামানো' বন্ধ, চামড়ার জুতো পরা বন্ধ'।

মৃতদেহ বিছানায় একভাবে পড়ে থাকতে থাকতেই এসব চিন্তা মাথায় খেলে যাচ্ছে বিদ্যুৎ গতিতে।···

রবিবারে মৌজ করে খাওয়া হবে বলে কারা যেন কিছু ভাজা মাছ রেখে দিয়েছিল। গতকাল রাত্রেও খায়নি তারা আজ আপসোস করছে।

কাদের এক বুড়ি হাত পা আছড়াচ্ছে, 'আমার মরণ তাই রাতে একরাশ ডাল ভিজিয়ে থুলাম নাতিটা ধোঁকার তরকারি খেতে ভালোবাসে বলে।'

ডাল ভিজের দোষ হয় ?

তা বাটা বাটনার তালগুলো যদি ফেলে দিতে হয় তো, ডাল ভিজে 'নির্দোষ' থাকে কি করে ?

কাদের ঘরে না কী দুদিন বাদেই কোন বাচ্চার 'মুখে ভাত'-এর কথা ছিলো, হবে না। পিছিয়ে যাবে। সাত সম্পর্কের ডালেপালায় নাতি। কলকাতায় মরলে হয়তো টেরই পেতো না কেউ। কিন্তু দেশে ঘরে এসে যখন সকলের বুকের ওপর মরল, তখন তো নিয়ম পালনটা করতেই হবে।

অস্পষ্ট এই সব আলোচনার কোনো কোনো একটা লাইন সুষমার কানেও এসে পেঁাছোচ্ছে বৈ কি। কিন্তু সুষমার মাথায় ঢুকছে কী ?

সে জানে না কী ব্যবস্থা হচ্ছে। তবু সে একবার বিধুর দিকে তাকিয়ে বলে উঠেছিলো 'জয়কে খবর দেবার কী হলো খুড়োমশাই ?'

বিধু ব্যস্তে মাথা হেলিয়ে বলেন, 'হয়েছে। ট্রেনের টিকিটের টাকা আর কিছু মোটা টাকা মজুরি দিয়ে ঠিকানা দিয়ে পাঠানো হয়েছে একজনকে। পেঁৗছে যাবে খানিক পরেই।'

লোকটা কে ?

সেও এক গেঁজেল। গাঁজার দাম আর 'কিছু' হাত খরচা পেলেই সে শ্মশান যাত্রীর সঙ্গী হয়। পাড়ার এমন কোনো মড়ার নাম বলতে পারা যাবে না, শশী গেঁজেল যার সঙ্গে শ্মশানে যায়নি।

তা এরাই তো পরিত্রাতা।

অতি দুঃসময়েই তো যতো গেঁজেল মাতাল, মস্তান আর ঘৃণ্যজীবগুলোকেই পায়ে ধরে ডেকে আনতে হয়।

এই এক মজা।

শশী গেঁজেল না কী জাতে বামুন। তবে মাড়ি পোড়া বামুন।… সত্যনারায়ণ পুজোয় সিন্নি খেতে তাকে কেউ ডাকে না। কেউ ডাকে না শ্রাদ্ধ শান্তিতে—'বামুন ভোজনে' কী 'বামুন বিদেয়ে' কিন্তু এই মহা মোক্ষম কালে তার ডাক পড়বেই।

দুঃসময়ে 'শশী গেঁজেল' অপরিহার্য।

এই শিমুরালি জায়গাটা কী শরৎবাবুর পল্লী সমাজের গ্রামের মতো নেহাৎ গ্রাম ? তা ঠিক বলা যায় না। একে মফস্বল টাউনের মর্যাদাও দেওয়া যেতে পারে। এখন অতি গ্রাম্য এবং অতি শহুরে। অতি প্রাচীন এবং অতি আধুনিকতায় সহাবস্থান।

এর বহিরঙ্গের চেহারার সঙ্গে বাসিন্দাদের মনোভঙ্গির আকাশ পাতাল তফাৎ। ‥ শুধু মাঝে মাঝে বিধুর মতো কী ডাক্তারবাবুর মতো লোক— দুটো কালকে নিজস্ব কায়দায় জুড়ে ফেলে চালিয়ে যাচ্ছেন।

তাই ডাক্তারবাবু ডেথ সার্টিফিকেটটা লিখে দিতে এসে বলেন, 'বৌমাকে একটু চিনি ভিজে কী ডাবের জল গলায় দিতে। দেওয়া হয়েছে?'

উত্তরটা কে দেবে?

জ্ঞাতিদেরই একজন গিন্নী অস্ফুটে বলেন। 'এখন কী মুখে জল দিতে আছে?'

'নেই। তা জানি।...কিন্তু ওনার মুখের চেহারটা দেখতে পাচ্ছেন কেউ? আর একখানা সার্টিফিকেট লিখতে আসতে হবে আমায়?'

একটু যেন বিদ্রূপের হাওয়া বয়ে যায় ঘরে।

এতো আর নয়। মেয়ে মানুষের প্রাণ না?

এই সময় হঠাৎ সেই নিষ্পাপ মুখটি থেকে একটি শব্দ উচ্চারিত হয়, 'দরকার হবে না।'

'দরকার আপনার হবে না বৌমা। আমার হবে। আমি ডাক্তার।'

তবু কে একজন মাধ্যম হয়ে বলে ওঠে, 'উনি বলছেন ওঁর দ্যাওর আসুক, তারপর।' খবর পাঠানো হয়েছে তো।

'ওঃ! দ্যাওর! সেই মহানুভব ব্রাদারটি। তা খবর পাঠানো হয়েছে বলেই যে তিনি এসে পেঁাছবেন, তার কী গ্যারান্টি? খবর দাতার সঙ্গে দেখা হবেই তারই বা গ্যারান্টি কী? রবিবারের ছুটিতে—তিনি শালা সম্বন্ধী নিয়ে চড়ুইভাতি করতে যেতে পারেন। বাল বাচ্চা নিয়ে চিড়িয়াখানায় সাদা বাঘ দেখতে যেতে পারেন। সেটা টের পাওয়া যাবে ওই সংবাদদাতাটি ফিরে এলে। তার মানে সেই সন্ধ্যে। যাক, আপনারা যা ভালো বুঝবেন করবেন। আমার কর্তব্য আমি করে গেলাম। ডাক্তার হওয়ার একটা ঝামেলা আছে বুঝলেন।'

গট গট করে বেরিয়ে যান।

আর তখনি হঠাৎ ঘাড় বাড়িয়ে বলে ওঠেন 'ব্যাপারটা কী হলো?'

বিধু খুড়োও 'কী' হলো সেটা অনুধাবন না করে এগিয়ে যান।

কেমন যেন একটা চাঞ্চল্য ওঠে পরিবেশটায়।

ঘরে যে সব মহিলারা বসেছিলেন তাঁরাও ঘাড় বাড়ান।

শুধু স্থির থাকে সুষমা।

'শিমুরালি' স্টেশনটায় নেমে পড়ে, প্রথমেই টিকিটখানা ছিঁড়ে ফেলল সুজয়। কারণ 'শত্রুর শেষ রাখতে নেই।'

যদি পরে কখনো এলার হাতে পড়ে যায়? তাহলে সুজয়কে এ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে না, 'বন্ধুর ছেলের পৈতের নেমন্তন্ন খেতে বন হুগলি যেতে গিয়ে হঠাৎ এই শিমুরালির টিকিটখানা তোমার হাতে এসে গেলো কী করে।'

ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে, চারদিক তাকিয়ে দেখল। মনে পড়ল না আগে কখনো এখানে এসেছে, কী এ দৃশ্য দেখেছে। অথচ মনের হিসেবের খাতায় লেখা আছে, এসেছিল একবার। অতি শৈশবে। ঠাকুমার 'কাজ'-এর সময়। মনে থাকতে বাধ্য। খতে কলমে লেখা। ঠাকুমার শ্রাদ্ধকার্যটি বাবা দেশের বাড়িতে এসেই করেছিলেন।

তখন স্টেশনের চেহারাটা কেমন ছিল? একেবারে সেই স্মৃতি। কেমন ছিলো তাদের সেই বাড়িটা? যেখানের কোনো একখানে বসে 'ন্যাড়া মাথা বাবা' কতো কী সব জিনিস নিয়ে পুজোটুজো করছিলেন। একটা জিনিস মনে আছে পুজোয় একবারও ঘণ্টা বাজে নি শাঁখ বাজেনি, বাজেনি কাঁসর। বারবার দাদাকে জিগ্যেস করেছিলো, 'কী ঠাকুরের পুজো হচ্ছেরে দাদা? ঠাকুর দেখতে পাচ্ছি না, ঘণ্টা বাজছে না—।'

দাদা কি উত্তর দিয়েছিলো, তা মনে পড়ছে না। তবে এটা মনে আছে, পিসি মাঝে মাঝে কেঁদে উঠছিলো বলে, আরো অবাক হয়েছিলো সঞ্জয়। শাঁখটাক বাজানোর বদলে হঠাৎ হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠতে হয় কোন পুজোয়?··· সঞ্জয় জ্ঞানে কখনো তার ঠাকুমাকে চোখে দেখেনি। দেশের বাড়িতেই থাকতেন তিনি। বাড়িতে কোনো ছবিও নেই। থাকবে আর কোথা থেকে? কবে আবার তিনি ক্যামেরার মুখোমুখি একটু দাঁড়িয়ে পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন?

অথচ বাবা তাঁকে ঠাকুর দেবতার মতো ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন, সেটা পরে বুঝেছে। দাদাও বুঝিয়ে ছিলো সেদিন, 'এ পুজো, ঠিক পুজো নয়। এর নাম 'শ্রাদ্ধ'। ঠাকুমা স্বর্গে চলে গেছেন তো, তাই বাবা এ রকম পুজো করছেন।'

সেই স্মৃতি।

তবে দেশের বাড়ি সম্পর্কে স্পষ্ট স্মৃতি যদি কিছু থাকে, সেটা হচ্ছে, চোখের সামনে একটা গাছে, গাছ ভর্তি পেয়ারা। গাদা গাদা। এমন অভিনব দৃশ্য সঞ্জয় তার জীবনে দেখেনি। এমনও হয়? বড়রা ইচ্ছে করলেই ডিঙি মেরে হাত লম্বা করে বাড়িয়ে, ছিঁড়ে নিতে পারে। এও সম্ভব?

নিজের হাতেই একটা ছিঁড়ে নেবার ইচ্ছে হয়েছিল সঞ্জয়ের। এবং দাদাকে সে কথাটা জানিয়ে ছিলো। দাদা বলেছিলো, 'চুপ এখন পুজো হচ্ছে, ওসব পরে হবে।'

পরে হয়েছিলো কিনা, সে এখন আর মনে পড়ছে না। হয়তো হয়েছিলো, হয়তো হয়নি। বাবাকে দেখে কেমন অচেনা ভয় ভয় লাগছিলো। মাথা ন্যাড়া করলে, মানুষ এমন উল্টোপাল্টা মতো দেখতে হয়ে যায়?···

আচ্ছা সেই পেয়ারা গাছটা আছে?

ভেবে মনে মনে একটু হাসলো সঞ্জয়। বট-অশ্বত্থ হলে কথা ছিলো, আম

কাঁঠাল হলেও হয়তো থাকলেও থাকতে পারে। তাই বলে পেয়ারা গাছ? তার এতো পরমায়ু হবে?

আরে বাবা, আমি হঠাৎ এমন পেয়ারা গাছের চিন্তায় বিভোর হয়ে গেলাম যে! কোন দিকে যেতে হবে এখন আমায়, সেটা দেখি।

স্টেশনে যে সব লোক ট্রেন থেকে নেমে পড়ছে, যে সব লোক প্ল্যাটফর্মে ঘোরাঘুরি করছে, তাদের কাউকেই জিগ্যেস করবার মতো মনে হলো না। চট করে মনে হলো, আরে একটা রিকশা করলেই তো হলো ওরা সব বাড়ি টারি চেনে।

প্লাটফর্মের বাইরেই রিকশা স্ট্যান্ড। ও বাবা এখানেও দেখা যাচ্ছে 'লাইন' পদ্ধতি। যে রিকশাওলা সামনেই তারই অগ্রাধিকার।…সে এগিয়ে গেলে তবে পরবর্তী জন। সঞ্জয় কাছে এসে দেখলো, নেহাৎ ছোকরা। এ কী আর সব পাড়ার খবর জানে? তবু জিজ্ঞেস করলো, 'শিমুরালি বাঁড়ুয্যে বাড়ি চেনোতো?'

সে মাথা নেড়ে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, 'বেশিদিন আসি নাই।'

তবে পরবর্তী জন গলা বাড়িয়ে প্রশ্ন করলো, 'বাঁড়ুয্যে বাড়িতো এখানে একটা নয়, কোনটা চান?…'ইলেকট্রিক অফিসের কাছের নতুন বাঁড়ুয্যেদের? না ডাকঘরের ধারের বাঁড়ুয্যে বাড়ির? নাকী মন্দিরপাড়ার পুরনো বাঁড়ুয্যের ভাঙা ভিটে বাড়ির?'

সঞ্জয় তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বোধহয় ওইটাই হবে। মানে এইখানেই আমার বাড়ি। তবে অনেকদিন আসা হয়নি, তাই—'

'আচ্ছা আমি নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে।'

সামনের রিকশাটা ছাড়তেই, পরেরটায় উঠে বসলো সঞ্জয়। রিকশাওলা তার রিকশায় পায়ের চাপ মেরে লাফিয়ে উঠে বসে হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে বললো, 'সঙ্গে কিছু জিনিস নাই?'

'না। এমনি একবেলার জন্যে দেখা করতে এসেছি। আজই ফিরে যাবো।'

লোকটা দারুণ গায়ে পড়ার মতো। একটু এগিয়েই বলে, বাড়িতে কে আছে, মা?'

'না। ইয়ে দাদা বৌদি।'

'অ! তাই বড় একটা আসতে দেখি নাই। মা থাকলে ঠিক টেনে আনতো 'মা' এমন বস্তু। এই আমি, আজ ক'বছর হলো মাকে হারিয়ে—'

সামনে একটা গরু। হেলেদুলে রাস্তা পার হচ্ছে।

তাড়াতাড়ি ব্রেক কষে লোকটা অস্পষ্ট একটা গালাগালি দিয়ে রাস্তার একটা বাঁক নিল।

সেই সময় রাস্তায় দু'একজন ভদ্রলোককে দেখতে পেলো সুজয়। একটু গলা বাড়িয়ে বললো, পুরনো বাড়ুয্যে বাড়িটা এই দিকে তো ?'

ভদ্রলোক একটু নিরীক্ষণ করে বলেন, 'কোথা থেকে আসছেন ?'

কলকাতা থেকে।'

'কে হন ?

মানে ? কার ?'

'এই যে বললেন পুরনো বাড়ুয্যে বাড়ির ? ওদের ?'

আমি ইয়ে ওই বাড়িরই ছেলে।'

ভদ্রলোক পার্শ্ববর্তী জনের দিকে তাকিয়ে নীচুগলায় কী যেন বলে, এগিয়ে এসে বলেন, 'কোন ট্রেনে এলেন ?'

'এইতো ভোরের ট্রেনে। শিয়ালদা থেকে সাতটা পঞ্চাশে ছেড়ে—'

আশ্চর্য তো !'

কেন এতে আশ্চর্যের কী আছে ?'

'না মানে, ওই বাড়িরই ছেলে বললেন তো ?'

'বললাম তো তাতে কী হলো ?'

'না কিছু না। আচ্ছা আপনি এগোন। আমাদের আবার এক্ষুনি ট্রেন ধরতে হবে।···আমরা গতকাল এখানে হালদার বাড়িতে এসে উঠেছিলাম একটা আত্মীয় বাড়ি আর কী। আজ ফিরে যাচ্ছি। ওই বাড়ুয্যে বাড়ির ঠিক পাশেই। আচ্ছা—'

সুজয় মুখটা বাঁকাল।

ওনাদের ঠিকুজি কুলুজি শুনেও আমার স্বর্গলাভ হলো।

রিকশাওলাটা আর একটু এগিয়েই বলে উঠলো 'এইখানেই আমায় ছেড়ে দিতে হবে বাবু '

'সে কী ? তার মানে ?'

ইয়ে ওই ভাঙা ভিটের সদরখানা পড়ে গিয়ে ইঁট পাটকেলে বোঝাই। রিকশা যাবার পথ নাই।···'

'কী আশ্চর্য। বাড়িটা না দেখে, বাড়ি পর্যন্ত না পেঁছে—'

'কী করবো বলেন। ওই তো নেমে এগিয়ে দেখেন না অবস্থা পাটকেলের স্তূপের পাশ কাটিয়ে পায়ে হেঁটে খিড়কি দে ঢুকতে হবে।'

সুজয় চিন্তিতভাবে বলে, 'তো বাড়িটা ঠিক চিনবো কী করে ?'

'ও কিছু অসুবিধা হবে না। কাউকে কী আর সামনে পাবেন না ? কতো দিন আসেন নাই ? মনে হচ্ছে দীর্ঘদিন।···ওইতো, ওইতো ভাঙা পাঁচিলের ধার দিয়ে কে যেন বেরোলো, এই দিকেই আসছে···ও দাদু। ইনি বাড়ুয্যে বাড়ির মধ্যে ঢুকবেন। কোন দিক দিয়ে সুবিধে হবে বলে দেবেন একটু।··· আমারটা মিটিয়ে ছেড়ে দিন বাবু।'

সুজয় একটা দশ টাকার নোট বার করল—

'ইস ভাঙানি নাই ?'

'দেখি কতো লাগবে ?'

'গোটা ছয়েক দিয়ে দ্যান—'

ভাঙা পাঁচিলের ধার থেকে বেরিয়ে আসা আধবুড়ো লোকটা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে ওঠে 'নতুন লোক দেখে যে গলা কাটতে চাইছিস তারাপদ। ··ইস্টিশন থেকে এটুকু আসতে কবে ছ'টাকা পেয়েছিস ? তাও একটা মাত্র প্যাসেঞ্জার। মোট মাটরি নেই সঙ্গে। তিনটে টাকার বেশি হতেই পারে না—'

'ঠিক আছে। ঠিক আছে। যা দেবার দিয়ে দ্যান। দাঁড়িয়ে তক্ক করার টাইম নেই আমার—'

সুজয় একটা পাঁচ টাকার নোট বাড়িয়ে ধরল। লোকটা ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলো।

এতোক্ষণে লোকটা সুজয়ের দিকে তাকিয়ে বললো, 'নাম কী ?'

'আপনাকে তো ঠিক—'

'চিনতে পারছো না তো ? তা চিনবে কি করে ? কবে আর দেখেছো ? আমিও বাঁড়ুয্যেদেরই. তা এ সময় এসে পড়লে কী করে ? খবরটা পেলে কখন ?'

'খবর ? কিসের খবর ?'

লোকটা অপ্রতিভাবে বলে ওঠে, 'না, মানে ইয়ে—আচ্ছা চল চল ভেতরে চল। সুজয় তো ? না কী ভুল বলছি ? চেহারার আদলেতো—'

'আপনার কথাবার্তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তবে আমার নাম সুজয়ই বটে। সুমন বাড়ুয্যে আছেন তো এখানে ?'

লোকটা একটু উদাস গলায় বলে ওঠে, 'হ্যাঁ ছিলেন বটে। গত বছর খানেক ধরে ছিলেন। আজ ভোর সকালে চলে গেলেন।'

পাগল-ছাগল না কী লোকটা ? এমন নাটুকে কথা বলছে কেন ? সুজয় ভুরুটা কোঁচকায়, বলে, 'কোথায় গেছেন ?'

'সে হদিস আর কে দিতে পারবে বাবা ? গতরাত্তির পর্যন্তও তো দেখেছি, মন্দিরতলায় আরতি দেখছেন। ভোর সকালে শুনলাম চলে গেছেন কী জানি কোন মহাতীর্থে।'

বদ্ধ পাগলই। তবু বললো সুজয়, 'ওঁর স্ত্রী ? তিনিও কী চলে গেছেন না কী ?'

'তিনি ? না বাবা। তা অবশ্য যেতে পারেননি। যতই সাবিত্রীতুল্য হোন, কালটাতো কলি। তিনি আছেন। ভেতরেই আছেন। এই যে—এই খান দিয়ে ওই ভাঙা পাঁচিলের গহ্বর দিয়ে ঢুকে যাও। আমার একটু বিশেষ দরকারে বেরোতে হচ্ছে।'

সুজয় মনে মনে ঠোঁট কামড়ালো।

আশ্চর্য, আজই তাঁর 'তীর্থ যাত্রার' শখ হলো? এসব বাতিক আবার কবে হলো? তাও বৌদিকে রেখে একা?···না, লোকটা স্রেফ পাগল ছাগলই। নাটুকেপনা করে কথা কইতে ভালোবাসে, যাননি কোথাও।

হঠাৎ মনের রাগটাকে একটু টানটান করে নেয় সুজয়। হঠাৎ সুজয়কে দেখে দাদা বৌদি অবশ্যই আহ্লাদে দিশেহারা ভাব দেখাবে 'ভালোবাসায় বিগলিত' হবে। কিন্তু সুজয় সেই অভিনয়ে ভুলবে না। সুজয় আজ মুখোশ খুলে ফেলে দিতে এসেছে। সুজয় জলস্পর্শটিও করবে না এ বাড়িতে। তাহলেই আত্মীয়তা বাড়াবার সুযোগ পেয়ে যাবে। বৌদি হয়ত একটু মনক্ষুণ্ণ হবে, তা কী আর করা যাবে? তিনিও তাঁর পতিদেবতাকে ভালো করে চিনে ফেলুন। অবশ্য একেবারে কী চেনেন না? তবু। ভণ্ড ছদ্মবেশীদের সবটা চেনা শক্ত। সুজয় যখন যাচ্ছেতাই করে কটু-কাটব্য করে দাদার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দেবে, তখন একা বৌদি কেন, সবাই চিনে ফেলবে। কে জানে বাড়িতে কারা সব আছে। একটা পাগলকে তো দেখা গেলো। আর কে?

যাকগে মরুকগে। কে আছে না আছে জানবার দরকারটা কী? দরকার তো তার শুধু একটা মানুষকে।

ভাঙা ইট-পাটকেলের কাদা খোঁচ স্তূপ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকে আসবার সময় মনে মনে একটু ব্যঙ্গ হাসি হাসলো সুজয়। বাঃ। চমৎকার আছেন তো কর্তা-গিন্নি। বিডন স্ট্রিটের সেই বাড়িটার নিচের তলাটাওতো এর পক্ষে 'রাজপ্রাসাদ' ছিলো। হঠাৎ 'দেশের বাড়ির' জন্য প্রাণ কেঁদে উঠলো। তা এসেছেও তো প্রায় বছর খানেক, একটুখানি বাসযোগ্য করে তোলবার ক্যাপাসিটি হয়নি? ওঃ না। তাই বা করবেন কেন? তলে তলে হয়তো বেচে দেবার তাল করছেন। তাই আর একটু সারিয়ে নেবার প্রশ্নও নেই।

নির্মলবাবু—লোকটাকে দু চক্ষের বিষ দেখি বটে, তবে লোকটা পাকা মাথা ঘুঘুতো। সবই বুঝে ফেলে। আইনের প্যাঁচে অনেক বেআইনি কাজ করে নেওয়া যায়।

কিন্তু দাদা? দাদা যে এতো 'ঘুঘু' তা কবে জেনেছে সুজয়? শুধু ঘুঘুও নয়, নির্লজ্জও। চোখের চামড়া থাকলে কী আর এভাবে—

মাথাটা নিচু করে ভাঙা পাঁচিলের গহ্বরটা পার হয়ে ঢুকে এসে সোজা দাঁড়াতেই চোখ দুটো ঝলসে গেলো সুজয়ের। সামনেই উঠোনটা জুড়ে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে যে। চোখ ধাঁধিয়ে গেলো।

পাশ কাটিয়ে সরে এলো আগুনের 'শিখাগুলো' বাতাসে জ্বলছে, নিচু হয়ে নুয়ে পড়ছে, আবার সোজা সতেজ হয়ে উঠছে।

রোদ পড়লে আর বাতাসে দুললে—কৃষ্ণচূড়া ফুলের ঝাড় এমন অগ্নিশিখাতুল্য হয়!

কৃষ্ণচূড়াই তো। এ গাছতো শহরের রাস্তাতেও অনেক দেখা যায়। সুজয়ের অচেনা নয়। তবু সুজয়ের এমন দৃষ্টিভ্রম হলো কেন? মনে হলো যেন সামনে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে।

রোদে আসার জন্যে?···

হঠাৎ···কোথা থেকে কতকগুলো লোক যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এসে হাজির হলো। মেয়ে পুরুষ। নানান বয়সের। নেহাৎ গ্রাম্য চেহারা।

সকলেই কিন্তু একযোগে বলে উঠলো, 'ওইতো এসে গেছে।'

এগিয়ে এলেন এক পাকাসিটে বৃদ্ধ। কাছে এসে সুজয়ের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে উঠলেন 'বাঁচালে বাবা। ভেবে আকুল হচ্ছিলাম, বৌমাকে দিয়ে ওই দুরূহ কাজটা কী করে করাব? অথচ—কিন্তু কখন কী ভাবে কার কাছ থেকে খবরটা পেলে বলোতো? হিসেবে পাচ্ছি না তো—'

সুজয় হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বলে, 'আপনি কে? বিধুকাকা বলে মনে হচ্ছে যেন। কিন্তু আপনাদের ওই 'খবরটা' কী বলুনতো? আরো একজন এই কথা বললো—'

বিধুকাকা স্থির চোখে দাঁড়িয়ে বলেন, 'বলছি—কিন্তু তুমি হঠাৎ এসে গেলে কেন বলো তো?'

'এসে গেলাম। এমনি মহান সুমনবাবুর সঙ্গে—ইয়ে দাদার সঙ্গে একটু জরুরি দরকার ছিলো। কিছু কথা বলার ছিলো—'

বিধু আস্তে বলেন, 'একেই বোধহয় বলে অদৃষ্টচক্র। তোমার সে কথা আর বলা হলো না বাবা। 'দাদা', আজ ভোর রাত্তিরে আমাদের মায়া কাটিয়ে পালিয়ে গেছেন। ওই যে দেখো তাকিয়ে। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করা হচ্ছিল—

ওই দিক।

কোন দিক?

যন্ত্র চালিতের মতো সেদিকে তাকাল সুজয়। কী দেখল?

মাথার ওপর কী সমস্ত আকাশটা ভেঙে পড়লো সুজয়ের? না দুরন্ত বেগে আছড়ে এসে পড়লো, দধিচীর হাড়ে গড়া, ইন্দ্রের বজ্রখানা?

ওধারের ভাঙা-চোরা খোয়া ওঠা দাওয়াখানার ওপর শোয়ানো···সাদা চাদরে ঢাকা, ওই দীর্ঘ দেহখানা কার?

দেহটা এতো দীর্ঘ যে, বাজার চলতি চারপাই থেকে পা দুখানা বেরিয়ে পড়েছে।

তীব্র তীক্ষ্ণ বজ্র গর্জনের মতই একটা আওয়াজ আছড়ে পড়লো সমস্ত পরিবেশটার ওপর।

দাদা !

এ স্বর কী মানুষের ?

না ভয়ঙ্কর একটা জন্তুর ?

তারপর ?

তারপর ওই কণ্ঠ মালিকটির বোধহয় মনে পড়লো সে কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিলো, কাল থেকে অনেক তোড়জোড় করে, অনেক গল্প বানিয়ে, বাড়ির লোককে ভাঁওতা দিয়ে।

হ্যাঁ একটা সংকল্প নিয়েই তো এসেছিলো সে।

ওই দাদা নামের লোকটাকে যাচ্ছেতাই করে কটু-কাটব্য করতে। রেখে ঢেকে, মুখের আগল রেখে বলবে না।

তা সেটাই শুরু করে সে, কী ? পালিয়ে গেছে ? আমার সঙ্গে মুখোমুখি হবার ভয়ে পালিয়ে গেছে ?

এতো ভয় তোমার আমাকে ? ভীরু, কাপুরুষ, কাওয়ার্ড।

আর—আর এতো নিষ্ঠুর তুমি ? এমন হিংস্র প্রতিহিংসাপরায়ণ ? অথচ আমি—নির্বোধ আমি, চিরদিন ভেবে এসেছি, তুমি দয়ার অবতার। করুণার অবতার। মমতার অবতার। তুমি ক্ষমার সমুদ্র।

সেই তুমি - এই ?

ক্ষমাহীন ! দয়াহীন ! মমতাহীন ! সেই মুখ্যু নির্বোধটাকে এইভাবে শাস্তি দিতে ইচ্ছে করলো তোমার ? লজ্জা করলো না ? একছিটে লজ্জা করল না, তোমার ? তার মানে চিরদিন তুমি আমার সঙ্গে ছলনা করে এসেছো ? ভণ্ডামি করে ভাব দেখিয়েছো, তুমি আমায় 'বুঝতে পারো।' বুঝতে পারো আমার অসহায়তা। আমার যন্ত্রণা। আমার গভীর গোপন কষ্ট। কী ভুল ধারণায় চিরদিন আমি তোমায় ভগবানের আসনে বসিয়ে রেখে এসেছি। মনে মনে তোমায় পুজো করে এসেছি।'

মাটিতে লুটোপুটি করতে করতে চেঁচিয়েই চলে। যাকে উদ্দেশ্য করে বলছে, সে যে আর কোনোদিনই কিছু শুনতে পাবে না, এই পৃথিবীর রূপরস গন্ধ স্পর্শ শব্দ, সব তার কাছে নিথর হয়ে গেছে, মিথ্যা হয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে সমস্ত অনুভূতি।

উপস্থিত জনেরা ওই অপরিচিত, সভ্যভব্য মার্জিত চেহারা সম্ভ্রান্ত সাজ পোশাক করা লোকটার এই দুরন্ত শোকের দৃশ্য দেখে হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

এই সেই ভাই।

যার নামে নানা নিন্দে মন্দ। কী আশ্চর্য !

এ যে দেখছি লক্ষ্মণের তুল্য ভাই। আর শোকের অবস্থা দেখো। লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের বিলাপের তুল্য। আচমকা শোকে এমন এলোমেলো হয়ে

পড়েছে আর কী। আহা। কিছু জানে না, আসছিলো দাদার সঙ্গে দুটো দরকারি কথা কইতে। কেউইতো তাকে দুঃসংবাদটা পৌঁছে দিয়ে আসেনি। তবু এমনিই এসে পড়েছে।

একেই বলে 'রক্তের টান' তা নইলে এই এতোদিন রয়েছে দাদাটা এখানে, একদিনের জন্যে দেখা করতে আসতে ইচ্ছে হলো না অথচ হঠাৎ আজই ?

একটা অদৃশ্য শক্তি টেনে নিয়ে এলো আর কী।

তা সে যাই হোক—

কিন্তু অনন্তকাল পড়ে পড়ে বিলাপ করলেতো চলবে না। 'কর্তব্য' বড় কড়া মনিব।

বিধু খুড়ো কাছে এসে গাঢ় স্বরে বললেন, 'কাঁদবার জন্যে সারা জীবন পড়ে আছে বাবা। এখন ওঠো। চলো তোমার কর্তব্য করতে। যার জন্যে ভগবান নিজে তোমায় এখানে টেনে নিয়ে এলেন।'

উঠে বসলো সুজয়।

মুখ তুলে লাল লাল চোখে তাকিয়ে ভাঙা গলায় বলে উঠলো, 'কী ? কী কর্তব্য ?'

'সে আর তোমায় নতুন করে কী বলবো বাবা ? জানো তো সবই, বাঙালি হিন্দু ঘরের ছেলে। তোমার দাদা নিঃসন্তান ছিলেন। 'পুত্রের কাজ' কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দিয়েই হয়। সবই করতে হবে তোমাকে।'

এই সময় মহিলাদের জটলার মধ্যে এক মহিলা কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হলো, 'পুণ্যবান মানুষ ছিলেন। ভাগ্যটিও দেখালেন। 'নারীর হাতের আগুন' পেতে হলো না। আর একটু হলেই তো—তাই হতে যাচ্ছিলো—'

সুজয় চমকে উঠে বললো, 'কী ? আমায় তাহলে এখন দদোর মুখে আগুন দিতে যেতে হবে। না ! না ! না ! কিছুতেই না ! এই জন্যে এসেছিলাম আমি ? বাড়িতে মিছে কথা বানিয়ে বলে—। বিধুকাকা আমায় মাপ করুন।'

বিধুকাকা হেসে বললেন, 'আমি মাপ করবার কে বাবা ? যিনি মাপ করবার, তিনি করলে, তোমায় এখানে টেনে নিয়ে আসতেন না ঘাড় ধরে। শাস্ত্রীয় আচার। মানতেই হবে।'

'মানতেই হবে ? আমি যদি না মানতে চাই ? যদি বলি, এতোবড়ো শাস্তি মাথায় তুলে নিতে পারবো না আমি। হাতজোড় করে বলছি কাকা, আমায় এই কাজটা থেকে রেহাই দিন। সারা জীবনে, দাদার মুখে আমি কখনো কোনো ভালো জিনিস তুলে দিয়েছি বলে মনে পড়ছে না। দাদাই আমায় সেই ছেলেবেলা থেকে, নিজে না খেয়ে—'

নেহাৎ গ্রাম্যের মতো হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে মানুষটা।

একা এসেছে বলেই কী নিজেকে এমন উন্মোচিত করে ফেলতে পারলো সঞ্জয় নামের সদা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকা লোকটা। সে না কী ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে এসেছিলো, তার 'ভণ্ড' দাদাটির 'মুখোশ' খুলে দিতে। তার নিজের আবরণখানা এমন করে খুলে পড়বে, তা কী ভেবেছিলো ?

একটুক্ষণ আর সবাই চুপচাপ হয়ে যায়।

এবং উপস্থিত আবার একবার ভাবে সবাই, কী আশ্চর্য ! মানুষ সম্পর্কে মানুষের কতো ভুল ধারণা থাকে !

বিধু খুড়ো কী ভাবলেন কে জানে। একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'তা নেহাৎ যদি না পারো, যে ব্যবস্থা হতে চলছিলো, তাই হোক। আর বেশিক্ষণ তো ফেলে রাখতে পারা যাবে না। শ্মশানযাত্রীদের ফিরতে রাত হয়ে যাবে। এখন তো আবার কৃষ্ণপক্ষ চলছে। রাস্তায় আলোর বরাদ্দ নেই।'

এতোক্ষণে রোয়াকের ওপরকার ঘরটার ভিতরকার বন্ধ দরজাটা খুলে গেলো। বেরিয়ে এলো একটি নারীমূর্তি। আস্তে সঞ্জয়ের কাছে এসে, আরো আস্তে ডাকলো 'জয়'।

সঞ্জয় কী এতোক্ষণ ঘুমের ঘোরে ছিল ? তার মনে পড়েনি, 'বৌদি' নামের একজনও আছে এখানে ?

তার কথাতো সমানেই ভাবতে ভাবতে আসছিলো। মনকে শক্ত করবার প্রতিজ্ঞাটা দৃঢ় করছিলো, কিছুতেই স্নেহ মায়ার প্রকাশে বিগলিত হবে না। কিন্তু ভাঙা পাঁচিলটার গহবর দিয়ে পার হয়ে এসে এই অচেনা পরিবেশটায় ঢুকে পড়ামাত্রই যে মাথার ওপর হিমালয় পাহাড়টা ভেঙে পড়লো হুড়মুড়িয়ে। ভুলে গেলো সব।

এখন মুখ তুলে তাকাল। স্বরটা কার ? বৌদির না ? বৌদিরই কিন্তু মুখ দেখা যাচ্ছে না। বৌদিকে কখনো মুখ ঢেকে ঘোমটা দিতে দেখেনি জয়।

মুখ দেখা গেল না। একখানা হাত দেখা গেল। এখনো এ হাতে সেই চিরপরিচিত চুড়ি বালা শাঁখা লোহা পলারুলি। সেই হাতটা আস্তে সঞ্জয়ের মাথায় রেখে বলে উঠলো সে, 'জয় ! লক্ষ্মীটি ভাই ! তুমি রাজী না হলে— আমাকেই যেতে হবে। যার ভয়ে তখন থেকে দরজায় খিল বন্ধ করে কাঠ হয়ে বসে রয়েছি।'

সঞ্জয় উঠে দাঁড়াল।

বিধুর দিকে তাকিয়ে আস্তে বলল, 'চলুন কাকা। এই জামাটামাগুলো ছাড়তে হবে ?'

'না না ! এখন এখানে কিছু না। সে সব সেখানে গিয়ে যা করবার করা হবে। বৌমা ! আমায় ক্ষমা করে দিও মা। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই—তা ভগবান

আমার মুখ রাখলেন।' আচ্ছা এখানে আপনারা সব রইলেন, দেখবেন ওঁকে যদুকে বলে যাচ্ছি, দোর টোরগুলো বন্ধ করে সাবধান থাকতে ।

গলার স্বর অকম্পিত। কোন অবস্থাতেই 'হেল দোল' নেই মানুষটার। না আছে কোনো ব্যাপারে আতিশয্য, না কোনো অনুভূতি অভিব্যক্তি !

একটু গলা খাঁকারি দিলেন। যারা চারপাইটা তুলবে বলে, এদিক ওদিক ঘুরছিল অধীর অপেক্ষায়, তারা ওই ইসারাটুকু পাওয়া মাত্রই হুড়মুড়িয়ে এগিয়ে এলো। মুহূর্তে সেটা কে ধাই করে তুলে নিয়ে, সেই একখানি চিরপরিচিত 'ধ্বনি' তুলল।

বিধু খুড়ো বললেন, 'বাবা সকল। এখানে একটু আস্তে।'

তাঁর পাশাপাশি সুজয় চলেছে। পায়ের জুতোটা তো তখনই খুলে ফেলেছিল, এখন গায়ের গেঞ্জিটা জামাটাও খুলে ফেলেছে। খালি গায়ে প্যান্ট পরে এগিয়ে চলেছে আস্তে আস্তে।

শ্মশান ঘাট খুব বেশী দূরে নয়, তবে, গিয়েতো বহু ঝামেলায় পড়তে হবে। তাই বিধু খুড়োর ব্যস্ততা, ফিরতে না বেশি রাত হয়ে যায়।

চলতে চলতে বললেন, এখান থেকে যে লোকটাকে দিয়ে খবর পাঠানো হয়েছিলো, তার অবশ্য এখনো ফিরে আসার সময় হয়নি। তবে যথা সময়ে খবরটা তো জানিয়েছে। ছোট বৌমা কী বুদ্ধি করে তাঁর সঙ্গে চলে আসবেন মনে হয় ?

সুজয় মাথা নাড়া দিয়ে বললো, 'অসম্ভব।'

'এলে ভালো হতো। আবার কে যাবে আনতে। তোমার তো দু'একদিনের মধ্যে বেরোনো সম্ভব হবে না।'

সুজয় শান্ত গলায় বলে 'তাঁকে আনতেই হবে এমন কোনো নিয়ম আছে ?'

'অ্যাঁ কী বললে ? ও হ্যাঁ। তা নিয়ম তো অবশ্যই আছে। সম্পর্কটা ভাবো। ···তাছাড়া তোমার ছেলের বয়েস কতো হলো ?'

'ছেলের ?···ছয় সাড়ে ছয়।'

'ওঃ নেহাৎ শিশু। ওর কিছু করণীয় নেই। মেয়েতো আরো ছোট ? তাই না ?'

'হুঁ।'

তা ওদের তো শুনেছি সেখানে দিদিমা মাসি টাসি রয়েছে। তাঁদের কাছে বাচ্চাদের রেখে চলে আসতেও পারেন।'

'আসবে না। আমি সিওর।'

'তাহলে কী বলছ, একদমই আসবে না ?'

'না এলে ক্ষতিটা কী ? কী এমন মাথা কিনবেন তিনি এসে ?···আসাটা কী একেবারেই 'কম্পালসারি' কাজ ?'

বিধু আস্তে বলেন, 'না না। তা কিছু না। তবে সমাজ, সামাজিক লোকাচার। এই আর কী। জ্ঞাতি-অশৌচটা তো মানতেই হবে। তার বিধি ব্যবস্থা আছে কিছু। তুমি থাকতে, সে আলাদা কথা।'

'ওখানে তাঁর অনেক উপদেষ্টা আছেন, যা বুঝবেন করাবেন তাঁরা। কোন সম্পর্কে কতটা মান্য সম্মান দেখাতে হয়, অথবা না দেখালেও চলে সে তাঁরা শিখিয়ে দেবেন।' কী ভেবে আবার বলে 'আসলে কী জানেন?'

'কী?

মনে মনে বলে, 'আমি একটু শান্তিতে থাকতে চাই। নিজের 'আমি' টাকে খুঁজে পেতে চাই। সর্বদা দারোগার পাহারার সামনে থাকতে চাই না, আর এই আমার পরম দুঃখের সময়। তবে মুখে বলে 'মানে, এলেই তো নানান ঝামেলা। গ্রামে থাকার অভ্যাস নেই। বাচ্চাদের স্কুল কামাই। এলে তাদেরও অসুবিধে, এখানেও অসুবিধে তবে যদি 'না এসে না চলে তাহলে

বিধুকাকা একটু হাসলো। চলা না চলা' বলে সত্যি কোনো কথা নেই বাবা। এই যে তুমি ঈশ্বর প্রেরিত হয়ে হঠাৎ এসে পড়লে, তাই না এলে কী পৃথিবীর দিন রাত্তিরের চলা বন্ধ থাকতো? 'চলা' আর 'বলা' হচ্ছে ব্যক্তিগত। বন্ধ হয় সেই তখনই, যখন তিনি নোটিশ পাঠান।···বাকি সব ঠিক চলে যায়। আসলের অভাবে বিকল্প দিয়ে কাজ চালিয়ে যায় সমাজ। শাস্ত্র, লোকাচার, কুলাচার। যাক এগিয়ে চলো, ও ব্যাটারা জোর পায়ে ছুটছে।'

যারা জোর পায়ে ছুটছে তাদের মধ্যে একজন ছুটতে ছুটতেই অপর একজনকে বলে, 'দ্যাখ কেতো। কাল ঠিক এই সময় বাঁড়ুয্যে জ্যাঠা আর বাবার সঙ্গে জমি মাপামাপি করছিলাম না? বাবার সন্দেহ বোধহয় আমাদের জমির খানিকটা জ্যাঠার জমির মধ্যে ঢুকে গেছে। তো জ্যাঠা অমন কুটকচালে নয়। বরং আমার বাবাটিই—তো দ্যাখ সব সন্দ ধন্দ ফিনিশ করে দিয়ে চলে গেলো মানুষটা। এইতো জীবন মানুষের। এই আছে, এই নেই।'

আর একজন বলে ওঠে, 'যা বলেছিস। এর জন্যেই কতো লাঠালাঠি। ফাটাফাটি। কাটাকাটি। মারামারি। খুনোখুনি। লড়ালড়ি। জাল জোচ্চুরি। দুর্নীতি। ভাইয়ে ভাইয়ে মামলা।' 'ছলনা—' আর একজন খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠে বলে, 'এ শালার শ্মশান বৈরাগ্যখানা যে উথলে উঠলো দেখছি। নে নে, পা চালা। তবে হ্যাঁ জ্যেঠার ভাইতো মনে হলো 'জেনুইন'। যা গড়াগড়ি খাচ্ছিল।'

'ভেতরে অপরাধ বোধ থাকলে, অমন হয়। বড় ভাইকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো—'

'অ্যাই ধ্যেৎ। তাড়িয়ে দিয়েছিলো, একথা কে বললো তোকে? উনি নিজেই চলে এসেছিলেন, শেষ জীবনটা দেশের বাড়িতে থাকবেন বলে··'

'বলেছে তোকে। 'শেষ জীবন।' কতো বয়েস হয়েছিলো ? এখনো তো রিটায়ার করেন—'

খ্যাক খেঁকেটা আবার তেমনি হেসে বলে ওঠে 'তা করে নি বটে। তবে হ্যাঁ, বয়েস না হতেই তো 'জীবনটা' শেষ হয়ে গেলো। না এলে আপসোস থেকে যেতো।'

'মরে গেলে আবার আপসোসটা করছে কে ?'

'কে আর ? আত্মজনেরা। আপসোস ছাড়া জীবন হয় না রে। একশো বছর বাঁচলেও আপসোস থেকে যায়। এটা করলে হতো। ওটা না করলে হতো। ওইটা করবো ভেবেছিলাম, সেইটা করা হয় নাই।'

শ্মশান যাত্রীদের মধ্যে বোধহয় সাময়িক বৈরাগ্য এসে যায়ই। একটা ছেলে উদাস গলায় বলে, 'যা বলেছিস। এই যে আমি নিত্যদিন রাতে শুয়ে ভাবি, কাল সকাল থেকে কাউর সঙ্গে ঝগড়া বিরোধ করব না, গুরুজনদের অমান্যি করবো না, সক্কলের সাথে ভালো ব্যাভার করবো, মিষ্টি কথা কইবো—, অথচ—'

'কী ? তুই সক্কলের সাথে ভালো ব্যাভার করবি ? মিষ্টি কথা কইবি ? হ্যা হ্যা হ্যা—এ জম্মে ? না আসছে জম্মে ? আসলে কী জানিস ? যে যতোক্ষণ বেঁচে আছে, অপরে কেবলই তার দোষটাই দেখে, খুঁতটাই দেখে। সে কী কী ত্রুটি করলো, তাই দেখে-দুচোখ মেলে। আর লোকটা যখন দুচোখ বোজে ? তখন সবাই ভাবে, ইস লোকটা কী ভালো ছিলো। ক্যানো আর একটু ভালো ব্যাভার করিনি।'

এই হাড় মুখ্যু ছেলেগুলো সময় সময়, এই রকম বড় বড় কথা কইতে ভালোবাসে। এরকম মোক্ষম সময় টময়তো বটেই। তাদেরও যে তখন ব্রহ্মজ্ঞান আসে, মানুষ কত নশ্বর। তাই বড় বড় কথার চাষ চালায়।

কিন্তু ওরা যা বলে, খুব ভুল বলে কী ? আপসোসহীন জীবন থাকে ? অতি সাবধানী, অতি মহৎ ব্যক্তি অতি কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিরও কোনো না কোনো ব্যাপারে আপসোস থেকে যায়। তা অতি সাধারণ জনেদের কথা তো ছার।

তবে আপসোসটা এমন মহা মুহূর্তে এসে যায় যে তখন আর করার কিছু থাকে না। থাকে না ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টার।

এইতো—

আজই সকালেও, একটা নাম করা কোম্পানির মোটা মাইনের অফিসার। সুটেড্ বুটেড্ ঝাঁ চকচকে চেহারার সুজয় ব্যানার্জি নামের লোকটা এখন— এই রাত্রে—শ্মশানঘাট থেকে ফিরে এসে ভিজে কাপড়েই দরজার চৌকাঠের ওপর বসে পড়ে সর্বশান্তের গলায় বলে উঠবে, 'ওঃ কাল এমন সময় এলাম না কেন আমি। এ আপসোস আমার জীবনও যাবে না বৌদি, দাদা আমায় ক্ষমা চাইবার সময়টুকুও দিলো না।'

এ কথা কী মনে এলো তার, পেলেই কী ক্ষমা চাইতে বসতো সে? ঝগড়া করতো, কটুকথা বলতো। দু'কথা শুনিয়ে দিতে পেরেছি ভেবে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতো। আজ এখন অভিযোগ করে উঠেছে। 'এ আপসোস আমার জীবনে যাবে না বৌদি, দাদা আমায় ক্ষমা চাইবার সময়টুকু মাত্র দিলো না।'

অনায়াসেই বলে, কারণ মানুষ বলে রেখে যায়নি। তাই এ প্রশ্নটুকু মনে জাগে না, আজ সকালে এতো তোড়জোড় করে, এখানে চলে এসেছিলো কী সে, তার দাদার কাছে ক্ষমা চাইতে?…সে তো এসেছিলো দশ জনের সামনে তার দাদার 'প্রকৃত রূপটি' উদঘাটন করে দিতে। যেটাকে না কি দেখাতে চাইবে সে মলিন, অসুন্দর।

হঠাৎ ঘটনা চক্রের এক প্রচণ্ড ধাক্কায় মোড় ঘুরে গেলো সেই মানসিকতার। এলোমেলো হয়ে দশ জনের সামনে উদঘাটিত হয়ে পড়লো, তার নিজের অন্তর-লোকের প্রকৃত রূপটি। উজ্জ্বল সুন্দর। যেখানে তার সেই দাদাটি জ্যোতি দিয়ে ঘেরা এক দেবমূর্তি।

কিন্তু সেই উদঘাটন কী শুধুই পাঁচজনের সামনে?…তার নিজের কাছেও নয়!…সে জানতো নিজের এই প্রকৃত রূপ?